রেজেষ্টরী নং A.46

দ্বিতীয় বর্ষ]　　১৩১৪ সাল, বৈশাখ ও ... য় সংখ্যা

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

বিষয়।

উৎসব।

ওঁ শ্রী আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২য় বর্ষ] ১৩১৪ সাল, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। [১ম ও ২য় সংখ্যা

নূতন বৎসরে।

এস এস মরিতে ত হইবেই। তবে কুকুর শৃগালের মত নিতান্ত অসহায় অবস্থায় মরিয়া আবার এই দুঃখ ভোগ করিতে আসিবে কেন—এস বীরের মত কর্ত্তব্য করিয়া মরি।

তুমি যেই হওনা কেন যুদ্ধ তোমায় করিতে হইবেই। সন্ন্যাসী হও বা তপস্বী হও তম রজ হইতে রক্ষা জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে, রাজা হও বা ধনী হও বাহিরের শত্রু বা ঘরের শত্রু হইতে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে, ব্যবসা, কৃষি, গোরক্ষা দ্বারা ধনোপার্জ্জনধর্ম্মী হও, নিষ্ঠুর লোভীর এক চেটিয়া হইতে ধনরক্ষা জন্য যুদ্ধ করিয়া জীবিকা রক্ষা করিতে হইবে, ভগবানবোধে সেবাধর্ম্মী হও সেখানেও আলস্য অনিচ্ছা হিংসা ইত্যাদি ব্যাপার হইতে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে।

যুদ্ধ করিতেই হইবে—যতদিন না গন্তব্য স্থানে পৌছিতেছ। তুমি যেই হওনা কেন, সাধুসন্ন্যাসী তপস্বীই হও অথবা রাজরাণাই হও কিম্বা ধনবানই হও অথবা সেবাধর্ম্মীই হও অথবা সতী স্ত্রীই হও যখনই আলস্য আসিল, যখনই আয়েস ইচ্ছা হইল, যখনই গল্পে রুচি হইল, তখনই জানিও অধঃপাত সুরু হইল। এক স্থানে এক অবস্থায় চুপ করিয়া থাকিবার স্থান ইহা নহে। হয় উন্নতি কর না হয় অধঃপাতে যাও এক স্থানে চুপ করিয়া থাকিতে কিছুতেই পারিবে না। উন্নতির চেষ্টা না কর অধঃপাতে যাইবেই।

তাই বলিতেছি অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ না করিলে উন্নতি নাই। তাই বলিতেছি যুদ্ধ কর। শ্রীভগবান বলিতেছেন—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।

হত হও স্বর্গ পাইবে আর জয়লাভ কর পৃথিবী পাইবে। অতএব হে কৌন্তেয় যুদ্ধই করিব নিশ্চয় করিয়া উদ্যোগী হও।

উদ্যোগহীন হইয়া শৃগাল কুকুর গৃধিনী শকুনীর মত পচা দেহের জন্য খাওয়া খায়ি করিয়া মরায় লাভ কি—আবার মরিবে, আবার জন্মিবে, আবার অধিক দুঃখ পাইবে—ইহার অন্ত কখনও হইবে না।—এস এস শাস্ত্রমত যুদ্ধ করিয়া হয় জয়লাভ করি, না হয় যুদ্ধে জীবন দিয়া অক্ষয় স্বর্গলাভ করি। ভগবান অর্জ্জুনকে যাহা বলিয়াছেন তাহা কি তপস্যাপরায়ণ, কি শাসনপরায়ণ, কি ব্যবসা কারবারপরায়ণ, কি সেবাপরায়ণ সকলের পক্ষেই খাটিতে পারে। আমরা অন্য সকলের কথা বলিব না। বলিব যাঁহারা তপস্যার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

প্রতিদিনের তপস্যায় রজস্তমকে দূর করিয়া সত্ত্বে অবস্থিত হইবে। এই যুদ্ধের জন্য নিয়ম চাই, সময়ের বিভাগ চাই। যাঁহারা শুধু তপস্যাই করিবেন তাঁহাদের জন্য আমরা সময় ও কর্ম্মের তালিকা দিয়া দিলাম।

এখানে একটি কথা বলি যাঁহারা কোন প্রকার পঠন পাঠন বা চিন্তন জানেন তাঁহাদিগের জন্য পাঠ ও মনন একটি প্রধান তপস্যা।

শ্রুতি বলেন,

উত্তমা তত্ত্বচিন্তৈব মধ্যমং শাস্ত্রচিন্তনম্

অধমা মন্ত্রচিন্তা চ তীর্থভ্রান্ত্যধমাধমা॥

তত্ত্বভাবনা উত্তম। শাস্ত্রভাবনা মধ্যম। শাস্ত্রভাবনা দ্বারা মনকে কর্ম্মে প্রবুদ্ধ করিয়া নিত্য কর্ম্ম করিলেই কর্ম্ম ঠিক ঠিক হইয়া থাকে। সন্ধ্যার ভাবনা দ্বারা মনকে সরস করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলে তবে সন্ধ্যা হইবে নতুবা সর্পমন্ত্র আবৃত্তি মাত্র। যাঁহাদের দিবারাত্রিই আয়ত্তাধীন সেইরূপ তপস্বীর জন্য আমরা সময়ও কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিলাম। যাঁহাদের এত সময় নাই তাঁহারা আপন আপনার সুবিধামত ইহা পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবেন। কেহ যদি মনে করেন এত কি করা যায়—আমরা বলি ছেলে খেলায় বা সখের সাধনায় কি ভগবান মিলে? সে কি এত সহজ?

১। রাত্রি ৪টা হইতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত সময়ের কার্য্য।

(ক) শয্যায় উপবেশন ও ভাবনা।

(খ) শয্যাত্যাগ—শৌচ, দন্তধাবনাদি।

(গ) আদ্র গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা শরীরের মলা পরিষ্কার—(ক্ষণিকের জন্য শরীরের জড়তা দূর)।

(ঘ) সুখাসনে উপবেশন করিয়া গীতা বা অন্য কোন আধ্যাত্মিক শাস্ত্র লিখিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা (শরীরের ও মনের জড়তা দূর দীর্ঘ সময়ের জন্য)।

(ঙ) ভাবনাখ্য অগ্নি হোত্র বা, অগ্নিক্রিয়া বা তপস্যা বা তাপ দেওয়া যিনি যাহা জানেন।

(চ) সন্ধ্যা আহ্নিক (ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তেই আবশ্যক) সময়ে না হয় আরও পূর্ব্বের সময় লইতে হইবে। ক্রমে অভ্যাস হইলে ঠিক সময়েই হইবে।

(ছ) বেদ বা আধ্যাত্মিক শাস্ত্র পাঠ করা, লিখিয়া লিখিয়া মনন করা এবং ভাবনা। সৃষ্টি-ভাবনা, স্থিতি-ভাবনা, এবং লয়-ভাবনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমরা অন্য স্থানে তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

বেলা ৯ হইতে বেলা ১১টার কর্ম্ম।

১। যোগ বাশিষ্ঠাদি বা অধ্যাত্ম রামায়ণাদি শাস্ত্রপাঠ।

২। মধ্যাহ্নের ক্রিয়া। লেখা ভাবনা।

৩। স্নানকালে স্নানযজ্ঞ ভাবনা—স্নান।

৪। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা।

বেলা ১২টা হইতে ৩টার কার্য্য।

১। আহার যজ্ঞ ভাবনা—আহার।

২। বিশ্রামে ভাবনা—পুরাণাদি দেখা ও ভাবনা।

৩। বিষয় কার্য্য—কাহারও সহিত দেখা বা চিঠি।

বেলা ৩ হইতে ৬ পর্য্যন্ত

সৎসঙ্গ—ভাবনা—বা শাস্ত্র চিন্তন, যাঁহার যাহা যুটে।

৬টা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত

১। ভাবনা—সন্ধ্যা।

২। অগ্নিক্রিয়া—ভাবনা।

৩। জল যোগাদি।

৪। গীতাদি শুধু পাঠ ও ভাবনা।

মধ্য রাত্রের কার্য্য—ভাবনা—স্মরণ—নিদ্রা।

যাঁহারা তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে চাহেন তাঁহাদের জন্যই ইহা আভাস দেওয়া গেল। যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন (যথার্থ)—তাঁহারা সর্ব্বদা সমাধিমুখে অবস্থিত থাকেন। কেহ আসিলে বা জিজ্ঞাসা করিলে সমাধি হইতে বিরাম লাভ করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। যাঁহার যেরূপ অবস্থা উপাসনার ৪টি সময় করিয়া লইয়া জীবনের প্রথম হইতেই কিছু কিছু অভ্যাস আবশ্যক। গৃহীমধ্যে এ সুবিধা অতি অল্প কাশীবাসীর আছে।

ভারতের অতীত গৌরব।

সকল মনুষ্যের এমন কি সকল জীবের জুড়াইবার স্থান একটি মাত্র। শান্তি নিকেতন ভিন্ন শান্তি আর কোথাও নাই। মাতৃস্তন ভিন্ন সন্তানের স্বচ্ছন্দ-বলাধানের আর কিছুই নাই। শান্তিময়ী, আনন্দময়ীর কোল ভিন্ন চির আনন্দের স্থান আর কোথায়?

গতির স্থান এক হইলেও শক্তি ত সকল মানুষের একরূপ নহে। সকলের শক্তি একরূপ নহে বলিয়াই সকলের প্রবৃত্তি একরূপ হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন নরনারীর প্রবৃত্তি ভিন্ন বলিয়া সকল মানুষের কার্য্যও একরূপ দেখা যায় না।

যাহার যে কার্য্যে প্রবল আসক্তি তাহাই তাহার স্বাভাবিক কার্য্য হইয়া গিয়াছে। সকল মানুষকে একরূপ কার্য্য করিতে বলিলে এই জন্য সকলে তাহা করিয়া উঠিতে পারে না। এমন কি এক রকম খাদ্য যদি সকল মানুষের জন্য ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে তাহা সকলের সমান রুচিকর হয় না। কাজেই প্রবৃত্তি বুঝিয়া কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যেখানে এই প্রবৃত্তি বুঝিয়া কর্ম্ম ব্যবস্থা করা হয় না সেখানে মানুষের সংগতি হয় না।

প্রাচীন ভারতের কর্ম্ম ব্যবস্থা প্রকৃতি ধরিয়া করা হইত। কেহ কেহ তপস্যা করিতে সুখ পায় কাহারও যুদ্ধাদিতে রুচি, কাহারও বা ধনোপার্জ্জনে আসক্তি, কেহ বা সেবাকেই পরম সুখকর বলিয়া মনে করে। এমন কি একটা জীবনের বাল্য যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থায় প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

যাহার যে কার্য্যে স্বচ্ছন্দ হয় তাহাকে অন্য কার্য্য করিতে বলাই পরধর্ম্ম গ্রহণ করান। ইহাতেও মানবের অধোগতি হইবেই। এই জন্য ছন্দমত কর্ম্ম

নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত গুরুতর কার্য্য। গীতা শাস্ত্র অর্জ্জুনের এই পরধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছা নিবৃত্তি করিয়া স্বধর্ম্মে আনয়ন জন্য উপদেশ দিতেছেন।

সংগ্রাম সকলকেই করিতে হইবে। যিনি তপস্যা করিবেন তাঁহাকেও যেমন রজতমরূপ শত্রুকে জয় করিতে হইবে সেইরূপ যিনি রাজ্য রক্ষা করিবেন তাঁহাকেও রাজ্য অপহরণকারীকে দূর করিতে হইবে। যিনি ধনোপার্জ্জন করিবেন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীও আছে আবার যাহার সেবা ধর্ম্ম তাহারও শত্রু আছে। যুদ্ধেই জীবন। বীরই জীবিত। অলস ব্যক্তি মৃত। প্রাচীন ভারতের প্রণালী এই ছিল যে ভগবানকে সারথী করিয়া যুদ্ধ করা ভিন্ন অন্য কিছুই কল্যাণপথ বলিয়া বিবেচিত হইত না। যেমন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভিন্ন কুম্ভকর্ণ ও রাবণের বিনাশ অন্য কেহ করিতে পারিলেন না সেইরূপ আত্মারামকে সারথী না করা পর্য্যন্ত তপস্যাকারীর তপোবিঘ্ন যে তম ও রজ অর্থাৎ লয় ও বিক্ষেপ ইহা কিছুতেই দূর হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কিছুতেই নিষ্পন্ন হইত না সেইরূপ শ্রীভগবানের দিকে লক্ষ্য না রাখিতে পারিলে মহিষাসুরমর্দ্দিনী রম্যকপর্দ্দিনী শৈলসুতাকে হৃদয়ে না বসাইয়া বাহুবল প্রকাশ করিতে গেলে সে বাহুবলে কার্য্য হইবে না। এইরূপ ধনোপার্জ্জনেও এবং সেবাধর্ম্মেও শ্রীভগবানকে সারথী করা চাই। তপস্যা কর সেখানে ভগবান চাই; যুদ্ধ কর সেখানে মহিষাসুরমর্দ্দিনী চাই; শিল্প বাণিজ্য গো সঞ্চয় কর সেখানে ভগবান চাই, সেবা কর সেখানেও ভগবান বোধে সেবা চাই। প্রাচীন ভারতের এই রীতি ছিল।

নবীন রীতি যেন বিপরীত পথে চলিতেছে। ভগবানের ব্যবস্থা না করিয়াই শুধু যেন সমবেত শক্তির বল দেখিতেছে। সমবেত শক্তি ভাল—সেই সঙ্গে ভগবানকে সারথী করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাই ভারতের অতীত গৌরবের আলোচনা করিতেছি। সিংহশিশু মেষশাবকের দলে পড়িয়া যখন সিংহত্ব বিস্মৃত হয় তখন তাহাকে সিংহের গর্জ্জন শুনাইতে হয় নতুবা তাহার অভিনয় মেষ শাবকের মত হইতে থাকে। প্রকৃত সিংহের গর্জ্জন শুনিলে আত্মবিস্মৃত মেষশাবকত্ব-গত সিংহশিশু আপনাকে আপনি দেখিতে পায় আপনার স্বরূপ দেখিয়া গর্জ্জিয়া উঠে।

ভারতের আধুনিক কার্য্য প্রণালী দেখিলে মনে হয় ভারত আপনার সিংহত্ব ভুলিয়া মেষশাবকের অভিনয় করিতেছে। অতীত গৌরব স্মরণ ব্যতীত ভারত আপনার স্বরূপ দেখিতে পাইবে না। নবীন রীতিতে চলিলে ভারত ভারত

থাকিবে না। ভারত যদি ভারত না থাকে তবে ভারতের নাম লোপ হইয়া যাউক—বরং তাহা ভাল তথাপি ভারত যেন পৃথিবীর আর কোন দেশের সমান না হইয়া যায়।

পৃথিবীর সহিত তুলনা কর, কি প্রাকৃতিক দৃশ্য কি জ্ঞান-বিকাশ সর্ব্ব বিষয়ে ভারত পৃথিবীর মস্তকস্বরূপ। হস্তীর ধান্য ক্ষেত্রে আপন দেহ লুকাইবার চেষ্টার মত ভারতের নবীন রীতি অবলম্বন, প্রকৃত দর্শকের কাছে নিতান্ত হাস্যজনক।

ভারতের প্রাচীন জাতিভেদ প্রথা যদি ভারতের অধোগতির কারণ বলিয়া মনে কর তবে বল দেখি জাতিভেদ না থাকিয়াও মুসলমানের অধোগতি কেন হইল? যদি বিধবার বিবাহ না দেওয়াই ভারতের অধঃপতনের কারণ হয় তবে যে সমস্ত জাতিতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত তাহাদের বীর্য্যহানির কারণ কি? এই সমস্তই বিশেষ চিন্তার বিষয়। আমরা কিন্তু এই সমস্ত বিষয় আলোচনার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই। পুত্র নবীন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যদি ঋষিদিগের প্রথা উল্লঙ্ঘন করিতে চায় তবে আমরা বলিব তাহার ব্যভিচার। ভারত এখন এই ব্যভিচারে ভরিয়া যাইতেছে। কে ইহাকে অতীত গৌরবের কথা শুনাইবে? কে ইহাকে সিংহের গর্জ্জন শুনাইয়া প্রবুদ্ধ করিবে? কে আজ ভারতের রাজাকে রাম যুধিষ্ঠিরের প্রজা-বাৎসল্য শিখাইবে? কে আজ ভারতের রাজাকে কার্ত্তবীর্য্য, জনকের আত্মজ্ঞান শুনাইবে? ভারতের সতীকে কে আজ সীতা, সাবিত্রী, পার্ব্বতী, দময়ন্তীর পাতিব্রত্য রক্ষার কথা শুনাইবে? কে আজ ভারতের মাতাকে কৌশল্যা, কুন্তী, কয়াধু, গান্ধারী, যশোমতি, দেবহুতি মদালসা পদ্মাবতীর দৃষ্টান্ত দেখাইবে; ভারতের পুত্রকে কে আজ রাম কৃষ্ণ ধ্রুব প্রহ্লাদ বৃষকেতু অভিমন্যুর আচরণ শিখাইবে? ভারতের বীরকে আজ কে আবার ভীষ্ম, অর্জ্জুন, রাম, কৃষ্ণ, ভীম অভিমন্যু, কর্ণ দ্রোণের বীরত্ব দেখাইবে—কত বলিব বশিষ্ঠ ব্যাস মহাদেব বৃহস্পতি আদি জ্ঞানী, নারদ, চৈতন্য, ধ্রুব, প্রহ্লাদ আদি ভক্ত, বাল্মীকি ব্যাস আদি কবি, মনু, পরাশর বিষ্ণু হারিত ইত্যাদি সমাজ-ব্যবস্থাপক পতঞ্জলি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি যোগী, মহাবীর লক্ষ্মণ আদি কর্ম্মবীর—কে আজ ভারতীয় কথা ভারতকে আবার শুনাইবে? প্রাচীন ভারতের গৌরব কিসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল?

বহু স্রোত যখন বহিতে থাকে তখন প্রধান স্রোতটি লক্ষ্য করাই নিতান্ত

প্রয়োজন। ভারতের সমাজনীতি, ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য ; ভারতের শিল্প বাণিজ্য ; ভারতের আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, ভারতের যজ্ঞ দান তপস্যা—ভারতের সমস্ত আচার ব্যবহার প্রাচীন ভারতের সমস্ত কীর্ত্তি কোন মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ? প্রাচীন ভারতের একমাত্র লক্ষ্য কি ছিল ?

এ কথা বলিবার লোকও বিরল হইয়া যাইতেছে—আমরা ভারতের বেদ তন্ত্র পুরাণ ইতিহাস মধ্যে ভারতের অতীত গৌরবের মূল ভিত্তি দেখিতে পাই।

একটি কথা লইয়া ভারত গৌরবান্বিত হইয়াছিল। সেই কথাটি সমস্ত মনুষ্যের প্রয়োজন। সেই কথাটি না হইলে মনুষ্যের সমাজ, জাতি, আচার ব্যবহার, রাজ্যশাসন, প্রজাপালন কিছুরই আবশ্যক দেখি না। সেই মূল ভিত্তিটি যদি না থাকে তবে মনুষ্য জীবনের সমুদায় কার্য্য সূত্রশূন্য পুষ্পমাল্য মাত্র।

জরামরণরূপ সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়া কোন এক নিত্যানন্দ ধামে চিরস্থিতিই মানুষের প্রধান লক্ষ্য। ইহার জন্য যদি তোমার সমস্ত আয়োজন না হয় তবে তোমার ধনসম্পত্তি রাজ্য-প্রতিষ্ঠা বিদ্যাবুদ্ধি দেশ উদ্ধার, জাতি-উদ্ধার কয় দিনের জন্য ? কেন ইহাতে কোন্ প্রয়োজন ?

ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো নষ্টাঃ সৃষ্টয়ো বহুশোগতাঃ।
শুষ্যন্তি সাগরাঃ সর্ব্বে কৈবাস্থা ক্ষণজীবিতে॥

কয় দিনের জন্য তুমি মানুষকে সুখ দিতে পার ? মৃত্যুর জন্য জন্মগ্রহণে কি ফল ? দুদিনের জন্য ভালবাসিয়া কি হইবে ? ক্ষণিকের সুখ কি আবার প্রার্থনীয় ? দুদিন পরেই মরিতে হইবে এই ভয় যদি সর্ব্বদা থাকে তবে তোমার সংসার-রক্ষার চেষ্টাটা কিরূপ ? যাহা থাকিবে না তাহাকেই স্থিতি দিবার জন্য যদি তুমি প্রাণপণ কর তবে তুমি কি তোমার ভগবদ্দত্ত বুদ্ধিকে কুপথে চালিত করিতেছ না ?

প্রাচীন ভারত এই মৃত্যু সংসারসাগর হইতে মানুষ কিসে রক্ষা পাইবে—তাহাই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ইহার জন্য বিদ্যা অভ্যাস, ইহার জন্য বিবাহ পুত্র কন্যা, ইহারই জন্য সমাজগঠন রাজ্যপালন, ইহারই জন্য শিল্প বাণিজ্য—এই শিক্ষা প্রচার জন্যই মানবের সমস্ত কার্য্যের আয়োজন। ভারতের জ্ঞান-চর্চ্চা, ভারতের মন্ত্রবিদ্যা, ভারতের আয়ুর্ব্বেদ, ভারতের ষড়দর্শন, ভারতের শিক্ষা, কল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত জ্যোতিষ, ছন্দ, ভারতের ইতিহাস, ভারতের তন্ত্র, ভারতের পুরাণ, ভারতের সমাজ, ভারতের সতী, ভারতের পুত্র কন্যা, এক কথায় ভারতের বেদ—এই এক প্রয়োজন সিদ্ধি জন্য। আমরা ভারতের

সকল বিদ্যার কথা জানি না বলিতেও পারিব না কিন্তু যে মূলভিত্তির উপরে সকল বিদ্যা, সকল কার্য্য দাঁড়াইয়া আছে, যাহার দিকে মানবের সমস্ত কর্ম্ম প্রধাবিত হওয়া উচিত তাহা যতদূর ধারণা করিতে পারিয়াছি এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচনা করিব। সুধী ব্যক্তি দেখিবেন পৃথিবীতে কোন জাতি আজ এই শিক্ষামত চলিতেছে কি না—কোন দেশ আজ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাণপণ করিতেছে কি না ?

ভারতের ঋষি সগর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন সংসার প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চ। এক ঘণ্টার অভিনয়ে যখন অভিনেতা অভিনেতৃ আপন স্বরূপ ভুলিয়া যায়, রঙ্গমঞ্চের রাজা রাণী সাজিয়া বসে তুমি কত দিন ধরিয়া এই রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতেছ—পূর্ব্বে কি ছিলে তুমি একেবারে ভুলিয়াছ। শাস্ত্র সংবাদ দিতেছেন তুমি কে ছিলে। তোমার পূর্ব্ব বিবরণ যদি না জান তুমি কখনই প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চ হইতে বাহির হইতে পারিবে না। তুমি চিরদিনই জন্মমৃত্যুর খেলা, সম্পদ বিপদের হাসি কান্না, লইয়া থাকিবে। তোমার ক্লেশের শান্তি কখন হইবে না। যে তোমায় লইয়া বহু সাজে সাজাইয়া খেলাইতেছে, তোমাকে ক্রীড়ার পুতুল বানাইয়াছে তুমি তাহার কথা যদি না শোন, তাহার আদেশমত যদি না চল, তাহার শরণাপন্ন হইয়া যদি এই অভিনয়মঞ্চ হইতে বাহির হইতে না প্রার্থনা কর তবে তুমি কখন দুঃখের হস্ত হইতে এড়াইতে পারিবে না।

কোন এক ভক্ত সাধক গাহিয়াছেন।

কি খেলা খেলাও মা তুমি জীবন্ত পুতলির সনে।
সেই জানে তোর খেলার মর্ম্ম যে থাকে সদা তোর ধ্যানে॥
রেখেছ নিখিল বিশ্ব, আনন্দের বাজার সাজায়ে
আবার আপনি খেল সে বাজারে পুরুষ প্রকৃতি হয়ে
মিছে পৃথক ভাবে তোমায় ভাবে জ্ঞানহীনে।
ওমা! সর্ব্বজীবে তুমি শিবে মাতৃরূপা হয়ে পাল
ভার্য্যারূপে ব্রহ্মময়ী তুমি প্রণয়ের খেলা খেল
তুমি শিশু-মূরতি হয়ে আলো কর সূতিকা গৃহ
আবার খেলিয়া নানা খেলা অন্তে শ্মশানে লুকাও সেই দেহ
মিছে মায়াভ্রমে জীবে ঘুরাও মা ভুবনে॥
ওমা কারে করেছ রাজ্যেশ্বর মা অতুল ধনের অধিকারী।
কারে করেছ পথের কাঙ্গাল মুষ্টিমেয় অন্নের ভিখারী

কেউ বা সুখে কাটায় নিশি পুষ্প শয্যায় শয়ন করি
কেউ বা গাছের তলায় তৃণশয্যায় দুখে কাটায় মা বিভাবরী
সকলি তোমার খেলা বুঝেও বুঝিনে॥
ওমা কেমন মহামায়া তোমায় পায়না বিধি বিষ্ণু ভেবে
শ্মশানে ভ্রমে ভব সদা সে তোরই মায়া প্রভাবে।
আপনার মায়ায় আপনি তুমি যাতায়াত কর বারম্বার
নিজে বুঝনা নিজের মায়া এমনি তোমার মায়ার বিকার
সে মহামায়া দ্বিজ গোবিন্দে বুঝিবে কেমনে॥

ভারতের অতীত গৌরবের মূল ভিত্তি এই মায়া হইতে মুক্ত হওয়া। এতৎসিদ্ধি জন্য ঋষিদিগের প্রধান অবলম্বন ছিল ভাবনা। ভাবনায় অসমর্থ যাঁহারা তাহাদের জন্য উপাসনা এবং অষ্টাঙ্গ যোগ।

আমরা সকল কথা বলিতে পারিব না। বলিব এই ভাবনার কথা। ঋষি-দিগের ভাবনা মত যাঁহারা ভাবনা চালাইতে পারিবেন—সেইরূপ ভাবনাকে স্থায়ী করিবার জন্য যাঁহারা উপাসনা ও যোগ অভ্যাস করিবেন তাঁহারাই জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া আনন্দধামে অমর হইয়া থাকিবেন।

উদ্দেশ্যে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া ঋষিগণ যে উচ্চভাবনা দিয়া গিয়াছেন সেইরূপ উচ্চ সার্থক ভাবনা আজ কি পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে? যিনি বলেন আছে তিনি যেন একবার নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন।

ঋষিগণ বলিতেছেন সৃষ্টিক্রম আলোচনা কর বুঝিবে ব্রহ্ম জগৎরূপে বিবর্ত্ত হইয়াছেন কিরূপে, তুমি জীব হইয়া গিয়াছ কিরূপে? স্থিতিক্রম আলোচনা কর, উপাসনা তত্ত্বে পৌঁছিয়া তুমি নিরন্তর এক অপূর্ব্ব ভাবনারাজ্যে নিত্যস্থিতি লাভ করিতে পারিবে। সংহারক্রম আলোচনা কর তুমি তোমার অনাদি দুঃখ জাল ছিন্ন করিয়া ভূতশুদ্ধি করিয়া উপাসনারাজ্যে নিত্য সেবা করিতে পরিবে।

ভূতশুদ্ধি, সুধাসমুদ্র মধ্যে মণিদ্বীপে নিত্যানন্দ রাজ্য এবং পরিপূর্ণ শান্ত সচ্চিদানন্দরূপে অবস্থান ইহাই ঋষিদিগের সর্ব্বোচ্চ ভাবনা। আমরা ভূতশুদ্ধি বা সংহারক্রম, উপাসনাতত্ত্ব বা স্থিতিক্রমের কথা এখানে আলোচনা করিব না। সৃষ্টিক্রমের কথঞ্চিত আভাস দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অন্যান্য প্রবন্ধে সকল বিষয়গুলিই কথঞ্চিত আলোচিত হইবে।

মহাপ্রলয়ের কথা যদি আলোচনা করা যায় ব্রাহ্মণেরা নিত্যই যে অঘমর্ষণ মন্ত্রজপ করেন যাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভগবান হলায়ুধ বলিয়াছেন,—

অস্যাঘমর্ষণস্য ব্যাখ্যানমাচরিতুম্ হৃৎকম্পো জায়তে। যতঃ সর্ব্ববেদসার-ভূতোঽত্যন্ত গুপ্তশ্চায়ং মন্ত্রঃ।—সেই ভাবনা পূর্ণভাবে কে চিন্তা করিবে? যে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রধান প্রধান শাস্ত্র সমূহের প্রথমেই পরিদৃষ্ট হয়, যে সৃষ্টিক্রম ভগবান বশিষ্ঠ কত প্রকারে যোগবাশিষ্ট মহারামায়ণে প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা ভাবিতে পারিলে মানুষ এক ক্ষণেই মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে—সেই ভাবনা আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধির মস্তকে কতটুকু প্রবেশ করিবে? তথাপি ঋষিগণের নিকটে কৃপাভিক্ষা করিয়া আমাদিগকে উহা বুঝিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে হইবে। না পারিলে ভূতশুদ্ধি করিয়া নিত্য ভাবনারাজ্যে অবস্থান করিয়া সেখানে দয়াময়ের পাণে চাহিয়া চাহিয়া তাহাই প্রার্থনা করিতে হইবে তদ্ভিন্ন নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

যখন মহাপ্রলয়ে সেই তমসস্ত পরং জ্যোতিঃ মাত্র অবশিষ্ট থাকেন, যখন জগৎস্পন্দন সেই পরম শান্ত পরম ব্রহ্মেলীন হইয়া যায় তখন সেই পরিপূর্ণ শান্ত সচ্চিদানন্দ মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। পরম শান্ত পরিপূর্ণ জ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই আছেন। তাঁহার আদি ভাবনাই মায়া। মায়াই বিচিত্র জগতের রচয়িতা।

আত্মচৈতন্য প্রথমে অজ্ঞান কল্পনা করেন। সেই স্বসঙ্কল্পিত অজ্ঞান বশে চেত্য বা জ্ঞেয়ভাব প্রাপ্তবৎ হয়েন। এইরূপে সঙ্কল্প আকার ধারণ করিয়া ক্রমে বিবিধরূপ বৈচিত্রে কালুষ্যপ্রাপ্তবৎ হয়েন। ইহাই বাসনা বা ভাবনার প্রথম অঙ্কুর।

ক্রমে কল্পনা প্রগাঢ় হইলে আত্মচৈতন্য স্বীয় পূর্ণস্বরূপ ভুলিয়া তুচ্ছ মনোরূপ প্রাপ্ত হয়েন। এই মহামনই আদি জীব—ইনিই হিরণ্যগর্ভ, ইনিই ব্রহ্মা।

অনন্ত আত্মতত্ত্ব হইতে নিরন্তর সঙ্কল্প উঠিতেছে। আমি চিৎরূপে ভাসমান আমি কিছুই জানি না, আমি কর্ত্তা ইত্যাদি ভাবনা ক্রম অনুসারে হয়, পরম শান্ত পরিপূর্ণ সৎ বস্তু আপন ভাবনাকে দেখিয়া যখন বিস্মিত হয়েন—স্বয়মন্যাঽইবোল্লসন্—তিনি স্বয়ংই আছেন কিন্তু আপনাকে অন্য মত ভাবনা করিয়া যখন উল্লাস প্রদর্শন করেন তখনই সৃষ্টির আরম্ভ।

পূর্ব্বে যে তিন প্রকার ভাবনার কথা বলা হইল (১) আমি চিৎরূপে ভাসমান (২) আমি কিছুই জানি না (৩) আমি কর্ত্তা—এই সমস্ত ভাবনা মায়াকে আশ্রয় করিবামাত্র উত্থিত হয়। ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে তড়িৎ যেমন অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহকে প্রকাশ করে, তড়িদাকারা মায়াও সেইরূপে পরমাত্মাকে প্রকাশ

করেন। যখন মায়াকে আশ্রয় না করেন তখন তিনি কি কে বলিবে—
"যন্নবেদা বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্ ন যত্র বাক্ প্রভবতি"

মায়া আশ্রয়মাত্র দ্বৈত্ব দর্শন হয়। আমি চিৎরূপে ভাসমান এই সঙ্কল্পকে যখন তিনি নিশ্চয় করেন—ইহার মধ্যে আমি ইহা বা ইহা নহি রূপ যে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক অবস্থা থাকে তাহাই মহামন বা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা।—আমি কিছুই জানি না যখন নিশ্চয় করেন তখন তিনি কারণ, দেহ বা অজ্ঞান দেহধারী আর আমি কর্ত্তা যখন নিশ্চয় করেন তখন তিনি জন্মমরণশীল জীব।

আত্মতত্ত্বই আছেন। আত্মতত্ত্ব হইতে অবিদ্যা কল্পিত হইয়া যখন তিনিই দ্বিতীয় সম্বিদরূপে স্ফুরিত হয়েন তখন ঐ দ্বিতীয় সম্বিদই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় মন বুদ্ধি অহংকার ও চিত্ত নাম গ্রহণ করেন। চিৎ ব্রহ্ম আত্মমায়া দ্বারা যখন আপনারই পৃথকরূপ বা দ্বিতীয় সম্বিদ দর্শন করেন তখন "আমি এইরূপ" বা "এইরূপ নহি" এই বিকল্পনা উঠে, এই সন্দেহদোলায় দোলায়মান যিনি তিনিই মহামন বা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা বা আদি জীব। সুষুপ্তি অবস্থায় জীব ব্রহ্মে মিলিত থাকে। সুষুপ্তি হইতে আবার যখন স্থূল দেহে জাগরণ হয় তখন-কার অবস্থা দ্বারা সৃষ্টিক্রম কতকটা ধারণা করা যায়।

আমি এইরূপ যখন নিশ্চয় হয় তখন ঐ সম্বিদ্‌কে বুদ্ধি বলে। এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বিষয়পথপ্রবাহিনী নিম্নমুখী। ইহা হইতে আরও সৃষ্টি হইতে থাকে। কিন্তু আবার সংহার-ক্রম ধরিয়া যখন আমি ইহা নহি দ্বিতীয় সম্বিদ্ ইহা নিশ্চয় করেন তখন ঐ নিশ্চয়াত্মিকা সম্বিদ্‌ই ধীশক্তি। এই ধী-শক্তি আমাদিগকে পরিপূর্ণ শান্ত স্বরূপে প্রেরণা করেন। প্রথমটি অসৎবুদ্ধি বা অবিদ্যা, দ্বিতীয়টি সৎবুদ্ধি বা বিদ্যা।

তাই বলা হইতেছে একমাত্র আত্মতত্ত্ব হইতে অবিদ্যা কল্পিত হইয়া যে দ্বিতীয় সম্বিদ্ জাত হয় তাহা বাস্তবিক নাই। যখন "আমি এইরূপ নহি" এই নিশ্চয়ে "আমি এইরূপ" এই মিথ্যা স্পন্দন লয় হইয়া যায় তখনই মুক্তি।

কিন্তু "আমি এইরূপ" এই নিশ্চয় করিয়া যখন সম্বিদ আবার স্পন্দিত হয়েন, যখন ঐ মিথ্যাস্পন্দনে আত্মাভিমান করিয়া স্বীয় সত্বা কল্পনা করেন তখন তাঁহার নাম অহংকার।

"আমি এইরূপ বা এইরূপ নহি"—এই সন্দেহদোলায় যখন থাকেন তখন তিনি মন; "আমি এইরূপ" যখন ইহা নিশ্চয় করেন তখন তিনি বুদ্ধি; "আমি এইরূপ" ইহা নিশ্চয় করিয়া যখন তাহাতে আত্মাভিমান করেন তখন

তিনি অহংকার। আবার সম্বিদ্ যখন বালকের ন্যায় অবিচারী হইয়া, পূর্ব্বাপর প্রতিসন্ধান ত্যাগ করিয়া এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তর স্মরণ করেন তখন তিনি চিত্ত।

বলা হইতেছিল ভাবনাই স্পন্দন (vibration)। আমি ইহা নহি—দেহ নহি, মন নহি, জগতে কোন কিছুই আমি নহি, তৎ ন তৎ ন এইরূপ স্পন্দন হইতেই আকাশের মত সীমাশূন্য অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ-সর্ব্বান্তর্যামী—জগতের সকল বস্তু যাঁহার উপর ভাসিতেছে—বৃক্ষলতা, আকাশ, নক্ষত্র, সূর্য্য, চন্দ্র, ঘর বাড়ী, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, বায়ু, পশুপক্ষী, নরনারী, এই সমস্তের অনুভবকর্ত্তা—তন্ন তন্ন সাধনা দ্বারাই সেই অখণ্ডজ্ঞানে সেই আত্মস্বরূপে দৃষ্টি পড়িবেই।

যে কর্ম্মবন্ধনে জীব জড়িত সেই কর্ম্ম কি বিচার করা আবশ্যক। সম্বিদ্ প্রথমে মন, পরে বুদ্ধি, পরে অহং, পরে চিত্ত, এই সমস্ত রূপ ধারণ করিয়া অহং কর্ত্তা হইয়া বসেন। এই অবস্থা পর্য্যন্ত কর্ত্তার লিঙ্গদেহ থাকে। আবার স্পন্দন চলিতে থাকে।

আবার ভাবনা দ্বারা লিঙ্গদেহের স্পন্দন হয়। সেই স্পন্দনের ফলে লিঙ্গ-দেহ স্থূল দেহ হয়েন। স্থূলের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনরূপ যে ব্যাপার তাহাই কর্ম্ম।

বুঝিতেছ সৃষ্টিতত্ত্ব কোথায় আমাদিগের চিত্তকে লইয়া যায়? বুঝিতেছ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার মোহ কিরূপে হয়? পরমাত্মা যে ক্রম ধরিয়া জীবরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন সেই ক্রম ধরিয়াই জীবাত্মা পরমাত্মাতে এক হইতে পারেন।

এখন আমরা উপসংহার করিতেছি :—

কল্পনা অর্থে শক্তি। কৢপ সামর্থ্যে। বৃক্ষের কল্পনা শক্তি নিত্য। প্রথমে ব্রহ্ম অজ্ঞানের কল্পনা করেন। ক্রমে সেই কল্পনা বিবিধরূপ বিচিত্রতা লাভ করে। এই কল্পনাই আত্মাকে কলুষিত করে। তখন আত্মা যেন স্বীয় স্বরূপ ভুলিয়া সঙ্কল্প বিকল্পরূপ মন সাজিয়া জন্ম মরণাদি মোহ প্রাপ্ত হয়েন। কল্পনার ফাঁসি গলায় পরিয়া—চিত্তস্পন্দন কল্পনারূপ স্ত্রীপুত্র পরিবার গলায় বাঁধিয়া যিনি আপন স্বরূপ ভুলিয়া আছেন (কল্পনার ফাঁসি কাটিয়া ফেলা ত অতি সহজ—মাকড়সার জাল ছিন্ন করা অতি সহজ সকলেই বলেন) তথাপি যিনি জানেন তিনিই জানেন কল্পনা দূর করিয়া মাকড়শার জাল ছিঁড়িয়া স্বরূপে গমন করা কত ক্লেশকর।

আত্ম-চৈতন্য তুচ্ছ বাসনা দোষে মনোভাবাপন্ন হইয়া বৃথা জন্ম মরণরূপ সংসার দুঃখ বিস্তার করিয়াছেন।

বাসনাই অভ্যাসবশে দারুণ দুঃখকর হয়। অভ্যাসগুলিও বাসনা। অভ্যাস-গুলি উণ্টাইবার জন্য সৃষ্টিক্রম, স্থিতিক্রম, সংহারক্রম রূপ বিপরীত ভাবনার অভ্যাস আবশ্যক। সৃষ্টিতত্ত্ব, স্থিতিতত্ত্ব এবং সংহারতত্ত্ব ভাবনা যিনি নিরন্তর করিতে পারেন তিনিই সংসারভাবনারূপ মায়ার বেড়ী কাটিয়া পরমপদে নিত্য স্থিতি লাভ করিতে পারেন। স্থিতিতত্ত্বে উপাসনার এক অংশ এবং সংসার-তত্ত্বে ভূতশুদ্ধি আমরা স্থানান্তরে আলোচনা করিয়াছি।

ঋষিদিগের উচ্চ ভাবনার লক্ষ্য সংসার হইতে সদ্যমুক্তি বা ক্রম মুক্তি। অন্য কোন জাতি যদি এই লক্ষ্য ও এই উপায় দিয়া থাকেন তাহা ভাল। যদি না দিয়া থাকেন তবে কিসের জন্য ভারতকে নবীন রীতিতে চালাইতে গিয়া বৃথা পরিশ্রম করা হয়? ঋষিদিগের প্রাচীন রীতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেই রীতিতে ভারত উদ্ধারই ভারত উদ্ধার। তদ্ভিন্ন অন্য সমস্তই মারামারি কাটা-কাটি বা "কাক কোলাহল"

শ্রীশ্রী ১০৮ মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীর ইহলোক পরিত্যাগে

শোকসূচক প্রার্থনা।

কাঁদাইয়া বঙ্গভূমি কোথা মা যাইলে তুমি
মাতৃহারা হয়ে এবে কাঁদিছে সন্তান। ১।

সে দেশ কিরূপ হয় সকলি আনন্দময়?
ভেদাভেদ কিছু নাই সকলি সমান? ২।

শুধু এই বঙ্গ কেন চারিদিকে ওই শুন
তোমারি তরেতে মাগো করিছে ক্রন্দন। ৩।

তুমি যে অখণ্ড ব্যাপ্ত পরিপূর্ণ 'প্রকাশাত্ম'
সে-রূপ বোঝেনা মা যে বোঝেনা এ-মন। ৪।

সে দেশে কি শোক নাই কেবলই শান্তির ঠাঁই
সকলি আনন্দে আছে মগ্ন অনুক্ষণ ? ৫।

সে দেশে যাইতে প্রাণ চায় যে মা কর ত্রাণ
দুর্গম সংসার এই অতি যে ভীষণ ।৬।

ফিরিয়া আসিবে ভেবে কত আশাপূর্ণ মনে
কাটায়েছি কাল মাগো চাহিয়া এ পথ পানে
জনমেরি তরে ত্যজি যাবে যদি জানিতাম
তা'হলে ও পাদপদ্ম আগে কি মা ত্যজিতাম ।৭।

সংসার স্বপ্নের মত এ সকলি কিছু নয়
কিছুই ত এ সংসারে চিরস্থায়ী নাহি হয়
ভুলিব না আর আমি বুঝেছি বুঝেছি এবে
আপনা বলিয়া কেহ নাহি মাগো এই ভবে ।৮।

অজ্ঞান তিমিরে প'ড়ে বদ্ধ ষড় রিপুপাশে
কেবলই ঘুরে মরি মিছামিছি কত আশে
আমার আমার সব কেবলই মনে হয়
সকলি নৈরাশ্য-পূর্ণ সকলি ত স্বপ্নময় ।৯।

উপায় না দেখি এবে সংসার তাড়নে যবে
কাঁদিবে এ প্রাণ মাগো হইয়া আকুল
ভীষণ সমুদ্রে কি মা পাইব না কূল ? ১০।

অবোধ সন্তানে ফেলি তুমি মা যাইলে চলি
জননীর প্রাণ কি মা এমনি কঠিন ?
কি জানি মায়ের লীলা বুঝা সুকঠিন ।১১।

পুনঃ কি ও শ্রীচরণ হেরিতে মা একক্ষণ
পাইব না আর কি মা কভু এ জনমে ? ১২।

কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখন নয়
তবে কেন গেলে ত্যজি কোন কু-করমে ? ১৩।

সে স্নেহ মা সে মমতা সকলি ভুলিলে মাতা ?
ত্যজিয়া যাইলে মোদের কিসের লাগি ? ১৪।

সকলি ডুবিল হেথা হইবে স্বপ্নের কথা
শুধু অতীত স্মৃতিটুকু থাকিবে জাগি। ১৫।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র শর্ম্মা (ঘোষাল)।
গৌরীশঙ্কর ঘোষালের লেন।
নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।

শ্রীশ্রী ১০৮ মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীর ইহলোক পরিত্যাগে

শোকসূচক-প্রার্থনা (২)

হইলাম আজি মোরা সবে মাতৃহীন
কি দোষে গেলে মা ত্যজি এ দীন অধীন ? ১।

আর কে শিখাবে এবে সুললিত ভাষে
তুষিবে কি আর কেহ মধুর সম্ভাষে।২।

আর কি আছে মা এবে সে সুখের দিন
শোকে তাপে তোমা তরে হয়েছি মলিন। ৩।

একবার আসি দেখ তব ছাত্রিগণে
তোমারি তরেতে অশ্রু বহিছে নয়নে।৪।

ভুলিতে কি পারি কভু ও রাঙা চরণ
আর কি পাব না মাতা তব দরশন ? ৫।

কি হেতু মা গেলে তুমি এবে স্বর্গপুরে
কেমনে আছ মা তথা ত্যজিয়া সবারে ? ৬।

ছাত্রিবৃন্দ মেলি সবে করি প্রণিপাত
পুরাবেন মন আশা করি আশীর্ব্বাদ।৭।

শ্রীমতী শৈলবালা দেবী।
৩য় শ্রেণী, মহাকালী পাঠশালা, কলিকাতা।

আমি এসেছি দেখনা চাহিয়া।

প্রভাতের মেঘ বিচিত্র বরণ
হেতা হোতা গায়ে মাখিয়া।
বিচিত্র আকাশে বিচিত্র প্রকাশে
খণ্ডে খণ্ড যাই ভাসিয়া॥
পলকে ছাড়িনু অরুণ বসন
পুনঃ জ্যোতি গায়ে মাখিয়া।
সুন্দর হইয়া আসিনু সাজিয়া
তোমার দেখাব বলিয়া॥
পাখীর কূজনে ধীর পবনে
সুন্দর প্রভাতি গাইয়া।
তুমি দেখিবে বলিয়া এসেচি সাজিয়া
উঠিয়া দেখনা চাহিয়া॥
ফুলে ফুলে খেলি মাখিয়া সৌরভ
বারে বারে আসি ছুঁইয়া।
তুমি বুঝিয়াও কেন পারনা বুঝিতে
কেন যাও সব ভুলিয়া॥
চিরদিন তরে নিস্তার পেয়েছি
মরণ গিয়াছে ছুটিয়া।
স্থূল দেহে ইহা ছিল অসম্ভব
এবে তাতে থাকি মিশিয়া॥
এক দেহে ছিনু হয়েছি অনেক
আসিয়া দেখনা চাহিয়া।
সেই আমি আছি হয়েছি সুন্দর
মলিনতা সব ছাড়িয়া॥
কেন বৃথা শোক? তোমারই রয়েছি
সুন্দর সুন্দরে মিশিয়া।
যেখানে যা কিছু আছে মনোহর
(তুমি) আমারে হৃদয়ে ভরিয়া॥

দেখিও চাহিয়া, দেখিবে আমারে,
যাই নাই কোল ছাড়িয়া।
তোমার আমার মোহের বাঁধন
এসেছি কেবল ছিঁড়িয়া॥
অনন্ত জীবনে অনন্ত বাঁধনে
উভয়ে থাকিব মিলিয়া।
তোমার বৈরাগ আমার উচিত
তাই আসিয়াছি সাধিয়া॥
(তুমি) সাধন জানিয়া আমারে স্মরিয়া
আসিতে পারিবে চলিয়া।
আর যেন তুমি শোক নাহি ছাড়
(আমি) আশায় রহিনু চাহিয়া॥
(তুমি) দেবতার স্থানে সদাই যাইও
পুষ্প পত্র জল লইয়া।
দেখিও তথায় দেখিবে আমায়
পূজিব তোমার হইয়া॥
বল কি রহিল শোকের কারণ
শোকে গেল সুখ মিলিয়া।
আমি সুখে আছি তুমি তাই ভেবে
এস ত্বরা করে চলিয়া॥
সাধন ভজন সুবিধা এখন
দেখ ভাল ক'রে বুঝিয়া।
এরি তরে আমি, ছাড়িয়া এসেছি
তুমি এস পূজা সারিয়া॥

মীরাবাই ও তুলসীদাস।

"মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা" আমরা বালককালে ইহা শুনিয়াছিলাম। মীরা রাজরাণী ছিলেন ইহা অনেকেই জানেন। আর গোস্বামী তুলসী দাসের নাম এ অঞ্চলে কাহারও অবিদিত নাই। বাঙ্গলা দেশেও বহু ব্যক্তি তুলসীকৃত রামায়ণের নাম শুনিয়াছেন। গোস্বামী তুলসীদাসের রামায়ণ হিন্দুস্থানে রামভক্তি যেরূপ সজীব রাখিয়াছে—একখানি পুস্তকে ধর্ম্মভাব এরূপ জীবিত রাখা আজকালকার দিনে নিতান্ত বিরল। খৃষ্টানদিগের বাইবেল, মুসলমানদিগের কোরাণ যে শ্রেণীর গ্রন্থ তুলসীদাসের রামায়ণ সেইরূপ গ্রন্থ। বঙ্গবাসীতে তুলসীদাসের রামায়ণের যে বঙ্গানুবাদ হইয়াছে তাহাতে তুলসীদাসের মহিমা সেরূপ কিছুই প্রকাশ হয় নাই।

অসী সঙ্গমের অতি নিকটে তুলসীদাসের প্রতিষ্ঠিত মহাবীর মূর্ত্তি এবং সীতারামের বিগ্রহ এখনও আছে। যে নৌকা করিয়া তুলসীদাস গোস্বামী গঙ্গাপার হইয়া রামনগরে যাইতেন তাহার একখণ্ড এখনও তাঁহার আশ্রমে রহিয়াছে। ভারতবর্ষে হিন্দুরাজগণের ধর্ম্মভাব যদি পূর্ব্বেকার মত থাকিত তবে বোধ হয় তুলসীদাসের আশ্রম একটি পীঠস্থান হইত। যে অশ্বত্থবৃক্ষতলে অসীসঙ্গমের নিকটে এই মহাবীরের মন্দির—তাহার অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখ হয়। মনে হয় আমাদের জাতির ধর্ম্মভাবটা মুখেই বুঝি রহিয়াছে। স্থানটি এত সুন্দর যে বাস্তবিক দেখিবার উপযোগী। আমি এসম্বন্ধে অধিক লেখা অনাবশ্যক মনে করি। আমি মীরাবাই ও তুলসীদাসের একটি কথা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

মীরা কৃষ্ণানুরাগিনী। রাজরাণী হইলেও তাঁহার সাধনভজনে নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটে। রাজা মীরার ধর্ম্মভাবের জন্য মীরাকে নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিতেন। মীরা তাঁহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া গোস্বামীকে পত্র দ্বারা নিজের অবস্থা জ্ঞাত করেন এবং তুলসীদাস প্রভুর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। বহুবার পত্র লেখালেখি হয় শেষে তুলসীদাস প্রভু মীরাকে একটি সঙ্গীত রচনা করিয়া পাঠাইয়া দেন। আমরা সেই সঙ্গীতটি এইখানে তুলিয়া দিতেছি। ঐ সঙ্গীত দ্বারাই মীরার কর্ত্তব্য নিশ্চয় হয়। মীরা পতিগৃহ ত্যাগ

করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বহু ক্লেশে আগমন করেন এবং কিছু পরেই আনন্দে কৃষ্ণ ভজন করিতে সমর্থ হয়েন। ভগবানে প্রকৃত অনুরাগ থাকিলেও কলিযুগে ভক্তকেও বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয়। ভগবানের জন্য কোন প্রকার পুরুষকার প্রয়োগ করিলে ভগবান ভক্তের অভাব দূর করিয়া দিয়া থাকেন। যদিও কখন কখন কিছু বিলম্বে ভগবানের অনুগ্রহ জানিতে পারা যায় কিন্তু ভক্ত কখন কোন বিষয়ে বিফলমনোরথ হন না। সঙ্গীতটি এই :—

জিন্‌কে প্রিয় না রাম বৈদেহী॥
ত্যজিয়ে তাহে কোট বৈরীসম যদ্যপি পরম সনেহি॥
ত্যজো পিতা প্রহ্লাদ, বিভীষণ বন্ধু, ভরত মাহতারী॥
বলি গুরু ত্যজে, কান্ত ব্রজবনিতা ভয়ে জগমঙ্গলকারী॥
না তো নেহ রাম সোঁ কিজে সীল সনেহ যাঁহালো
অঞ্জন কহা আঁখি যো ফুটে বহুতক কহালোঁ॥
সোইহি তোমারো প্রাণপূজতো প্যারো॥
জা সংগ বঢ়ত সনেহ রামপদ তুলসী মতো হামারো॥

গীতের অর্থ আমরা সংক্ষেপত বলিতেছি :—

রামবৈদেহী যাহার প্রিয় নহে—যদ্যপি সে পরম স্নেহের বস্তুও হয় তবে তাহাকে কোটি শত্রুর সমান ভাবিয়া ত্যাগ করিবে। প্রহ্লাদ পিতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, বিভীষণ ভাই বন্ধু ত্যাগ করিয়াছিলেন, ভরত মাতা ত্যাগ করিয়াছিলেন। বলি গুরু ত্যাগ করিয়াছিলেন, ব্রজবনিতা পতি ত্যাগ করিয়াছিলেন—ইহারা এইরূপ ত্যাগ করিয়া জগতের মঙ্গলই করিয়া গিয়াছেন। রামের সহিত যে প্রেম করিলনা তাঁহার সহিত আবার ব্যবহার কি স্নেহই বা কি? অঞ্জন দিলে যদি চক্ষুর যাতনাই হইল—চক্ষু যদি কাণা হইল তবে অঞ্জনে কি কাজ। আর কত বলিব বল। সেই তোমার প্রাণ-পূজ্য প্রিয়, যাঁহার সঙ্গে তোমার রামপদে ভক্তি দৃঢ় হইবে—তুলসী বলিতেছেন ইহাই আমার মত।

মীরার সন্দেহ ইহাতে দূর হইল। মীরা স্বামী ত্যাগ করিয়া রাজরাণী হইয়াও কৃষ্ণকাঙ্গালিনী হইয়া বৃন্দাবনে আসিলেন। সমস্ত কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া কৃষ্ণ-সেবা করিয়া ধন্য হইলেন। মীরা ইহা করিয়াছিলেন বলিয়া আজ মীরা প্রাতঃস্মরণীয়া।

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

নমি আমি সদাশিব দক্ষিণা মূরতি।
গুণের অতীত যিনি মায়াজালশূন্য তিনি
প্রমাণে না ধরা যায় জ্ঞানের মূরতি।
যাঁহা হতে দূরে রয় বাক্যমনোগতি॥

একদা নারদ যোগী জীবে দয়া লাগি
ভ্রমি সর্ব্বলোক, আসি, হন উপনীত
ব্রহ্মলোকে, যথা বেদচয় মূর্ত্তি ধরি
সেবে সদা চতুর্ম্মুখ জগতের নাথে।
দেহ ছটা যাঁর তরুণ অরুণ সম
উজলিছে সভাস্থলী। মার্কণ্ডেয় আদি
কত মুনি মুহুর্মুহু স্তব স্তুতি করে।
ভূত ভবিষ্যৎ যাঁর নহে অগোচর
ভক্তের কামনা সদা পূর্ণ যাঁর কাছে
বামে যাঁর সদা বিরাজিছে সরস্বতী।
ভক্তিভরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া
স্তবে তুষ্টি করিলেন দেবর্ষি নারদ।

প্রসন্ন স্বয়ম্ভু তবে বৈষ্ণব উত্তমে,
জিজ্ঞাসেন "কহ মুনি কি বাসনা তব"।
"শুনিয়াছি তব মুখে" কহিলা নারদ
"বিধি বা নিষেধ কথা বহুবার ধরি।
অধুনা হে সুরশ্রেষ্ঠ যদি কৃপালাভ
হয়ে থাকে ভাগ্যে মম, কহ কৃপা করি
যদিও রহস্য তবু—জিজ্ঞাস্য আমার—

সমালোচনা।

১। কর্ম্ম কল্পতরু ও সন্ধ্যাদীপিকা শ্রীতমোনাশ গঙ্গোপাধ্যায় কৃত। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা ইত্যাদি এবং দশ সংস্কারাদি বিষয় এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। সমাজে আজকাল এইরূপ অনেকগুলি পুস্তক প্রচলিত হইয়াছে। হিন্দুদিগকে যে সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে হয় তাহা জানা নিতান্ত আবশ্যক। আবশ্যক বলিয়াই শ্রীমন্মথনাথ স্মৃতিরত্নের পুস্তক, শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্নের পুস্তক পুরোহিতদর্পণ, হিন্দুসর্ব্বস্ব ইত্যাদি পুস্তক বহু হিন্দুতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত পুস্তকেও নবীন ভারতের অভাব পূর্ণ হইতেছে না। সন্ধ্যা না করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে—শাস্ত্রের এই বচন তুলিয়া দিলে কি হইবে? অথবা মোটামুটি সন্ধ্যার অর্থ করিলেই বা হইবে কি? হলায়ুধ যে পরিশ্রম করিয়া ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন সেরূপ পরিশ্রম গ্রন্থকার মহাশয়গণ করিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়া মনে হয়। সন্ধ্যায় সাপের মন্ত্র আওড়াইয়া কি হইবে ইহাই নবীন ভারতের নাস্তিকতা। শাস্ত্রে অবিশ্বাস পূর্ণ মাত্রায় দৃষ্ট হইতেছে। নানা কারণে ইহা সমাজে আসিয়াছে। পাদরী মহাশয়েরা কৃপা করিয়া বেদ কৃষকের গান বলিতেছেন। বালকেরা ইংরেজী স্কুলে যে ভারতের ইতিহাস পাঠ করে তাহাতে রামায়ণ ও মহাভারত যে অতি যৎসামান্য গল্প ইহা উল্লেখ করা হইতেছে, রাম লক্ষ্মণকে ধাঙ্গড়ের আকারে চিত্রিত করিয়া ধনুর্ব্বাণ শিক্ষার ছবি দিয়া বালকদিগের মনে অভক্তির বীজ রোপণ করা হইতেছে। হনুমান একটা বাঁদর মাত্র। হিন্দুরা ইহারও উপাসনা করেন। হিন্দুদিগের রামায়ণ মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব কিছুই নাই, ইহা কোমলমতি বালকদিগের মস্তকে প্রবেশ করান হইতেছে। এ সমস্ত কারণে ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা পূর্ণ মাত্রায় রাজত্ব করিতেছে। আরও এক কারণে শাস্ত্রে অবিশ্বাস আসিয়াছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা টোলের ছাত্র যাঁহারা সন্ধ্যাহ্নিকাদি করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যেও প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব দেখা যায় না। চরিত্রহীন হইয়া শাস্ত্র মানিতে বলিলে কে শাস্ত্র মানিবে? অথচ বালকদিগের মধ্যে যে ধর্ম্মভাব নাই তাহা বলা যায় না। যদি শাস্ত্রের কর্ম্মকাণ্ডের যথার্থ ভাব প্রকাশ পায় তবে বালকেরা সাদরে শাস্ত্র মত কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত ইহা আমরা বিলক্ষণ জানি।

বিষ্ণুস্মরণে তিন গণ্ডুষ জল পান করা হয় কেন, মার্জ্জনাদি মন্ত্রে যে জলকে উপাসনা করা হয় তাহার প্রকৃত কারণ কি? জলের অন্নদানের শক্তি এবং রমণীয় দর্শনের সহিত মিলিত করিয়া দিবার শক্তি আছে কি না, অঘমর্ষণ মন্ত্রের প্রকৃত শক্তি কি, গায়ত্রী কিরূপে আমাদিগকে উদ্ধার করেন—যদি শ্লোক-সংগ্রহকারী এবং শ্লোকের মোটামুটী অর্থপ্রদানকারী গ্রন্থকার মহোদয় ঐটুকু করিয়াই নিশ্চিন্ত না হয়েন, যদি শাস্ত্রীয় মন্ত্রের বিজ্ঞান প্রদর্শন করেন তবেই এই কলিযুগে যথার্থ উপকার হয়। প্রাতে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী, সায়াহ্নে স্বরস্বতী কোথাও বা হৃদয়ে শিবানী এবং ভ্রূমধ্যে বৈষ্ণবীর ধ্যান ইত্যাদি যে সমস্ত বিরোধ দৃষ্ট হয় গ্রন্থকার মহাশয়গণ ইহা যতদিন না মীমাংসা করিবেন ততদিন সমাজের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে না। হিন্দু বালককে নাস্তিকতা হইতে রক্ষা করিতে হইলে যাহাতে তাহারা যথার্থভাবে শাস্ত্রের ভাব গ্রহণ করিতে পারে তাহাই করিতে হইবে। নতুবা লোকে বলিবে অর্থলোভে শাস্ত্রের বচন সংগ্রহ করা হইতেছে। আশা করি গ্রন্থকার মহাশয়গণ আপনার শাস্ত্রোক্ত বিধি দ্বারা তৃপ্ত হইয়া অন্যকে তৃপ্তি দিবার জন্য শাস্ত্রমত কার্য্য করাইবার ব্যবস্থা করিবেন। এতদ্ভিন্ন হিন্দুসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না।

২। "পুতুল বিয়ে" শ্রীজয়চন্দ্রপুর কায়স্থ কৃত উপন্যাস। এই পুস্তক সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে ইহার মধ্যে যে "পরকীয়া ভাবের" শিক্ষা আছে এতৎসম্বন্ধে আমরা এই শ্রেণীর গ্রন্থকার মহাশয়দিগকে দুই একটি প্রশ্ন করিব। পরকীয়া ভাব এক্ষণে Free-love হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা ব্যভিচারের অন্য মূর্ত্তি। ভাগবতে রাজা পরীক্ষিত শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরনারী লইয়া যে খেলা করিলেন তাহাতে তাঁহার ভগবানত্বের মধ্যে কিছু দোষ কি আসিল না। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করিবেন নিকৃষ্ট লোকে তাহাই গ্রহণ করিবে। সাধারণ লোকেও অন্যের স্ত্রীতে আসক্ত হওয়াকে কি দোষের কার্য্য মনে করিবে না? শুকদেব ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ভগবানের কোন দোষ আসিতে পারে না। মানুষ ভগবানের লীলামানসে চিন্তা করিয়া গোপিনীগণ কৃষ্ণের জন্য যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন সেই ব্যাকুলতাটুকুমাত্র গ্রহণ করিবেন সেইরূপ ভাবেই উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্তে নিরন্তর ভগবানের প্রতীক্ষা করিয়া সংসার-ননদিনীর উৎপাৎ নিঃশব্দে সহ্য করিয়া যাইবেন ইহাই ধর্ম্মভাব। কিন্তু ইহা

গ্রহণ না করিয়া যদি স্থূলে কৃষ্ণ সাজিয়া বসা হয় এবং স্থূলে রাসলীলা অভিনয় করা হয় তবে কি তাহা ধর্ম্ম হয়? অন্যাসক্ত হইয়া স্বামীকে অবজ্ঞা যদি করা হয় তবে কি তাহা ব্যাভিচার নয়? ইহা কি সর্ব্বদা হেয় নহে? এই শ্রেণীর উপন্যাস লেখক মহোদয়গণ যদি ধর্ম্মের দিকে, পবিত্রতার দিকে, সতীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন তবেই না যথার্থ উপকার হয়? নতুবা চোর কৌশল করিয়া চুরি করিতেছে ইহা আঁকিলে কি অন্য চোরের চুরি প্রবৃত্তি নিবারিত হইবে? কামক্রোধাদির স্বাভাবিক কর্ম্মেই মৃত্যু। এই স্বাভাবিক কর্ম্ম যদি চিত্রিত করা যায় তবে কি মৃত্যুমুখে প্রবেশের পথ উদঘাটন হয় না? শাস্ত্রে সতীর তেজ দেখাইবার জন্য রাবণ বা কীচক বা জয়দ্রথ ইত্যাদির ঘটনা দেখান হইয়াছে। ইহাতে সতীত্বের তেজ স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সতীত্ব উদ্দীপিত করিবার শক্তি প্রদান করে। নতুবা বিলাতী উপন্যাসের মত উপন্যাস লিখিয়া সমাজকে ব্যাভিচারপথে অগ্রসর করায় লাভ কি? বিলাতে যাহা ধর্ম্ম ভারতে তাহাই যে ধর্ম্ম হইবে ইহা কি ঠিক? ক্ষণিক তৃপ্তির জন্য কোন কিছু করা নিতান্ত অযৌক্তিক। অন্ততঃ যে ভারতের ধর্ম্ম-নীতি সমাজ সমস্তই মৃত্যু সংসার সাগর হইতে রক্ষা লাভ জন্য, সেই ভারতে Free-love আঁকিয়া, Free-loveএর জন্য এম এ পাস করা পুত্র বৃদ্ধ পিতা মাতাকে অবজ্ঞা করিয়া যুবতী স্ত্রী বিবাহ করিতে চলিল, পিতামাতার জন্যও অন্ধহৃদয়কে জ্ঞানশাসনে শাসিত করিয়া নিজের স্বার্থ, বলি দিতে পারিল না—এইরূপ বিচারহীনতার পরিচয় প্রদান করা সংযমী—প্রত্যক্ষদেবতা স্বরূপ পিতৃমাতৃভক্ত হিন্দুর কর্ত্তব্য নহে। পিতামাতা যাহাই হউন না কেন তুমি শিক্ষিত হইয়াও আপনার ধর্ম্ম আচরণ মাত্র করিয়া যদি সকল দুষ্কৃতের জন্য কেবল ভগবান মাত্র আশ্রয় করিতে না শিখিলে বা শিখাইলে তবে তুমি হিন্দুজাতি-ভুক্ত বলিও না। অন্য জাতির স্বধর্ম্ম ইহা হইতে পারে। কিন্তু ভারতে হিন্দুর ধর্ম্ম ইহা নহে। ব্যভিচার বুঝিয়া ব্যভিচার দূর করাই গ্রন্থকারের কর্ত্তব্য।

৩। নিকাস আখেরী বা পরিণাম। রায় রামাক্ষয় বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। গ্রন্থকার শ্রীমৎ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবনী প্রকাশ করিয়া আপনিও ধন্য হইয়াছেন এবং হিন্দু সমাজেরও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। শ্রীমৎ রামাক্ষয় বাবু এই পুস্তকে হিন্দুধর্ম্ম-অবিশ্বাসীর নানাবিধ জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তর্কবাগীশ মহাশয় দ্বারা তাহার মীমাংসা করিয়া

লইয়াছেন। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইলে মনে স্বভাবতঃ যে সমস্ত ভাবনা উঠে যিনি তাহা হইতে মনকে রক্ষা করিবার কৌশল দেখাইয়া দিয়া থাকেন তিনি শাস্ত্রকারদিগের মত গুরুস্থানীয়। এই পুস্তক পাঠ করিতে করিতে যথার্থ মুমুক্ষুর যে সমস্ত বিচার আসা উচিত—আমি কি? কোথা হইতে আসিলাম? কোথায় যাইব? কি করিয়া গেলাম? আমার গতি কি হইবে? আত্মজ্ঞান প্রার্থীর এই সমস্ত প্রশ্ন, এই সমস্ত বিচার এবং তাহার সদুত্তর এই পুস্তকে সুন্দর কথাচ্ছলে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যাঁহারা চিন্তাশীল, যাঁহারা মৃত্যুর কঠোর যাতনা হইতে রক্ষা লাভ করিতে চাহেন এই পুস্তক ঐরূপ পাঠকের নিকট সর্ব্বদা আদৃত হইবে। যাঁহারা খাওয়া দাওয়া বেশ থাকাকেই জীবনের কার্য্য বিবেচনা করেন সেইরূপ বিকারগ্রস্ত সুস্থ ভাণকারী পাঠকের রুচি এরূপ পুস্তকে লাগিবে না। গ্রন্থকারও ইহা ইচ্ছা করেন না সমালোচকেও ইহা ইচ্ছা করেন না। সরল ভাষায় নিজের দোষ উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতীকার জন্য চেষ্টা আজকালকার সমাজে দেখিতে পাই না। গ্রন্থকার প্রাচীন হইয়াছেন—এইরূপ প্রকৃতির মনুষ্য হিন্দুধর্ম্মের সজাগ অবস্থায় ছিল এখন বিরল হইতেছে। আমরাও বিশ্বনিয়ন্ত্রী শ্রীমতী অর্পনা দেবী ও বাবা বিশ্বনাথের দরবারে মস্তকে অঞ্জলী ধরিয়া জানাইতেছি যেন গ্রন্থকারের কাতরোক্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহারা এবং তাঁহাদের সেবানিরত গ্রন্থকারের অগ্রজ শ্রীমৎ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের আত্মা গ্রন্থকারকে শান্তিময় সুখময় পরমানন্দে ইহ ও পরজীবনে স্থিতি প্রদান করেন।

রেজেষ্টরী নং A 362.

দ্বিতীয় বর্ষ] ১৩১৪ সাল, আষাঢ়। [৩য় সংখ্যা

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

বিষয়।

// উৎসব।

ওঁ শ্রী আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২য় বর্ষ] ১৩১৪ সাল, আষাঢ়। [৩য় সংখ্যা।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

আনন্দ-লহরী

(নাচ মা আনন্দময়ি !)

(১)

নাচে রবি নাচে শশী নাচে যত তারাগণ
গাহে সুমধুর গীত, হয়ে হরষিত মন।

(২)

ভ্রমে গ্রহ উপগ্রহ ভ্রমে বিশ্বধরণী
মহাকাল চক্রপরে ঘোরে দিবা রজনী।

(৩)

হৃদি মাঝে চন্দ্রকরে ধরি নাচে রত্নাকর,
পবনহিল্লোলে খেলে স্বচ্ছতোয়ঃ সরোবর।

(৪)

মনোসাধে দ্রুতপদে ছুটিতেছে তটিনী,
প্রাণেতে পুলকভরা মুখে মধুরাগিণী।

(৫)

গহন বিপিন মাঝে একি রঙ্গ চমৎকার!
হেলে তরু দোলে লতা খেলে দোঁহে অনিবার।

(৬)

সুশীতল স্নিগ্ধকর সুধাধর-মণ্ডলে
কতরঙ্গে নাচে গায় সুরবালা সকলে।

(৭)

তুমি (ই) মা আনন্দময়ি! জড় সেজে নাচ গাও
বিস্তারিয়ে মায়া তব জীবেরে ভুলায়ে দেও।

(৮)

তুমি না নাচালে জড়ে জড়ে ত মা নাচে না
তুমি না ফুটালে কথা কা'রও কথা ফুটে না।

(৯)

হৃদয় কমলে মম তালে তালে ফেলে পা
ঢালিয়ে সুধার ধারা নাচ ওগো শ্যামা মা।

শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ, মেদিনীপুর।

স্মরণ অভ্যাস।

আপনাকে আপনি সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—ত্রিতাপ-তাপিত পথিক! তুমি কি চাও? তুমি বড় দুঃখী, ইহাত আমি দেখিতেছি। তুমি পুরুষ হও বা স্ত্রী হও, যখন তুমি অজ্ঞান হইয়া যাও—যখন তুমি ভুলিয়া থাক, তখন হাহা হিহির ব্যাপারে মগ্ন হইয়া যাও, তখন অজ্ঞানেই বল বেশ আছি। সে কিন্তু ক্ষণিক। তুমি কিছুতেই জুড়াইতে পার না। যখন বালক ছিলে তখন কখন হাসিয়াছ, কখন কাঁদিয়াছ—হাসি কান্না অজ্ঞানমাত্র। সেই হাসি কান্না বরাবর চলিয়া আসিতেছে। কখন সুখী মনে করিতেছ, কখন দুঃখী মনে করিতেছ—ইহার মধ্যেই তুমি রহিয়াছ, ইহার হাত হইতে এড়াইতে পারিতেছ না। এক-ভাবে তুমি থাকিতে পারিতেছ না। তুমি যে ত্রিতাপ-তাপিত তাহা ভুলিয়া যখন কোন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া তাহাতে লাগিয়া পড়, তুমি ভাব "বেশ আছি।" যখন বালক ছিলে তখন একরূপ হাসি কান্না ভুগিয়াছ, আর যৌবনে অন্য প্রকার নেশায় মত্ত হইতেছ। আবার জরা আসিবে, আবার অন্যরূপ বিপদ আসিবে, অন্যরূপ ভয় হইবে, কৈ তুমি নির্ভয় হইলে?

শাস্ত্রও এই কথা বলিতেছেন, তুমি মিলাইয়া লইও।

বাল্যে গতে কল্পিতকেলিলোলে
মনোমৃগে দারদরীষু জীর্ণে॥
শরীরকে জর্জ্জরতা প্রয়াতে
বিদূয়তে কেবলমেব লোকঃ॥
জরাতুষারাভিহতাং শরীর-
সরোজিনীং দূরতরে বিমুচ্য॥
ক্ষণাদ্গতে জীবিতচঞ্চরীকে
জনস্য সংসারসরোঽবশুষ্কম্॥

পথিক! এখন তোমার কথঞ্চিৎ জ্ঞান আসিয়াছে। একটু গত আগত বিচার করিয়া দেখ, দেখিবে এই সংসারে লোকে কেবলই কষ্ট ভোগ করে। যেমন বাল্যকাল গত হইল অমনি মনোমৃগ কল্পনাপ্রসূত অন্যপ্রকার ক্রীড়ার জন্য লোলুপ হইল। সম্মুখে স্ত্রী। স্ত্রীরূপ গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে পত্নীক্রীড়ায় শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িল।

এই সংসারে কত প্রকারের শরীর দেখ। যেমন সরোবরে কত কত সরোজিনী ফুটিয়া রহিয়াছে। আর জীবন-মধুকর পদ্মে পদ্মে উড়িয়া ২ মধুপান করিতেছে। দেখিতে দেখিতে জরাহিমানী-পাত হইল। শরীর-সরোজিনী শুখাইল, জীবন-ভ্রমর উড়িয়া গেল। সংসার সরোবর শুষ্ক হইয়া পড়িয়া রহিল।

বড় বড় "ভারত ভারত" চীৎকারকারীরও মৃত্যুকালে নিদারুণ যাতনা হইয়াছে—কিন্তু যাঁহারা আত্মোদ্ধারের সহিত জগতের জন্য খাটিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা ভিতরে শান্ত হইয়া করুণা দৃষ্টে জগতকে দেখিয়া গিয়াছেন, কেবল মাত্র সেই মহাপুরুষেরাই আপনার কল্যাণ সাধিত করিয়া জগতকে কল্যাণ-পথে চালাইবার উপায় বলিয়া গিয়াছেন। আপনি আচরণ করিয়া অন্যকে আচরণ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

ভাই পথিক! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কি হইলে তুমি শান্ত হও? তুমি এই সংসার-মরুভূমে ত্রিতাপ-তাপিত। ইহার জন্যই তুমি একভাবে থাকিতে পারিতেছ না। যখন হাহা হিহিতে থাক তখনও মনে করিও এখনি হুহু করিতে হইবে। আগে ঠিক করিয়া লও কি চাও? ভাল করিয়া নিজে যাহা পাইলে জুড়াইতে পার তাহা ঠিক করিয়া লও। পরে তাহাই সম্পন্ন করিবার জন্য কার্য্য করিও।

আমি তোমায় বলিতেছি তুমি পুরুষ হও বা স্ত্রী হও, পথিক! একটি বস্তু

তুমি চাও! সকল মানুষই একটি বস্তু চায়। সেই বস্তুটি এই—'তুমি কে?' তোমার শক্তি কে? তুমি তোমার নিজ শক্তিকে দেখিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে চাও।

যেমন মহেশ্বর নিজশক্তি উমাকে দেখিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তুমিও তাহাই চাও। "নিজশক্তিমুমাংপশ্য মহেশইব নৃত্যসি"।

আর যদি প্রকৃতি অভিমান করিয়া থাক তখনও বুঝিবে যে যখন তুমি তোমার ক্রীড়া দ্বারা তোমার নৃত্য ব্যাপারে তুমি তাহার পূজা পাইয়াছ তখনই তুমি জুড়াইবে। সেইজন্য যে শক্তির পূজা সকলে করে—সেই শক্তি যাহা করেন সকলে তাহাই করিতে চায়। কি করেন তিনি?

"শিবস্য নর্ত্তকী নিত্যা পরব্রহ্মপ্রপূজিতা" সেই মহাশক্তি মঙ্গলময় পরমবিভুর সম্মুখে নিত্যই নৃত্য করেন, আর তিনি পরমব্রহ্ম কর্ত্তৃক প্রপূজিতা। তুমিও তাহাই চাও। সকলেই এই চায়।

মীরাবাই তাই বলিয়াছিলেন "হে গিরিধারীলাল, হে শ্যামবরণ আমাকে চাকরাণী রাখ, আমরা তোমার সম্মুখে নৃত্য করিয়া তোমার আনন্দ উৎপাদনে ধন্য হইব।"

ভক্তের সাধ দেখ:—

মোকো চাকর রাখোজী শ্যামবরিয়া গিরিধারী লাল।
চাকর রহতী, বাগ লগাতী, নিত্য উঠি দরশন পাতী॥ ১

চাকরী ম্যায় দরশন পাবৌ সুমিরণ পাবৌ খরচী।
ভাবভক্তি জাগীরী পাবৌ তিন লোককী খরচী॥২

মোদী পুচ্ছে মদন মোহন সো কহা মহিনা পায়ো।
তিন লোক জাগীরী পায়ো নিরভয় পটো লিখায়ো॥ ৩

যোগী আয়:যোগ করণকো তপ করণে সংন্যাসী।
রামভজনকো সাধু আয়ে বৃন্দাবনকে বাসী॥৪
উচো উচো মহল বনায়ো বিচ বিচ রাখী বারী।
সাবলিয়াকে আগে নাঁচু ঔড়ি পীতাম্বর সারী॥৫
মোর মুকুট পীতাম্বর সো হ্যায় গলে বৈজন্তী মালা॥
বৃন্দাবনমে ধেনু চরাবৈ মোহনমুরলিবারা॥৬
চৌকা দেউঙ্গি ঝারু দেউঙ্গী গোবর উঠাঁউ বাসী।
সাঁঝ সবেরে জলভরী লাউঁ সব সন্তন কো দাসী॥৭
মীরা কহে প্রভু:গিরিধরলাল গোয়ালনিকো দরশন দীনো
যমুনাজীকে তীর॥৮

এই যে "সাবলিয়াকে আগে নাঁচু ঔড়ি পীতাম্বর সারী"—এই যে পীতাম্বরী সাড়ী পরিয়া শ্যামবরণের আগে আগে নৃত্য করা বুঝি এই সেই "শিবস্য নর্ত্তকী নিত্যা পরব্রহ্মপ্রপূজিতা" করিয়া গিয়াছেন বা এখনও করিতেছেন। পুরুষের আপন শক্তির নৃত্য দর্শন ইহা অপেক্ষা আর প্রার্থনার বিষয় কিছুই নাই, আর প্রকৃতির তাহাই জানিয়া "সাবরিয়া আগে নাঁচু ঔড়ি পীতাম্বর সারী" ইহা অপেক্ষা সুখ আর কিছুই নাই। আর সারা জগতে এই এক নৃত্যই পরম সুখকর। রাত্রিকালে চারিদিক যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন—আকাশ যখন মেঘাবৃত—মধ্যে মধ্যে মেঘের গর্জ্জন—সেই সময়ে যখন চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া নবীন জলধর গাত্রে বিদ্যুল্লতা নৃত্য করে তখন সে দৃশ্যে কে না রস পায়? এই না সেই আদি দৃশ্য? রামরূপী জলধরকে জানকী কানকী লতাই প্রকাশ করেন—শ্যামরূপী কালাম্ভোধরকে সুকেশী, নীলবস্ত্রা, অঞ্জনাক্ষী, কৃষ্ণরামা শ্রী রাধিকা প্রকাশ করেন, আর শক্তিই শিবের প্রকাশিকা। স্বপ্রকাশের প্রকাশ এইরূপ। মানুষ ইহাই দেখিতে চায়—ইহাই হইতে চায়।

আপনার শক্তি সন্দর্শন—আপনার সম্মুখে আপন শক্তির নৃত্য ইহা অপেক্ষা পথিক! আর সুন্দর তুমি কি চাও? যতদিন না আপন শক্তিকে আপন বিশাল হৃদয়ে নৃত্য করিতে দেখ, যতদিন না আপনি আপনাকে সীমাশূন্য অনন্ত আকাশের মত বক্ষ জুড়িয়া থাকিতে দেখ—জগতের সমস্ত শক্তিই সেই সীমাশূন্য শিবহৃদয়ে নাচিতেছে না দেখ, ততদিন তুমি জুড়াইতে পারিবে না। যতদিন তোমার আত্মদর্শন না হয়, যতদিন তুমি আত্মার উপরে আত্মশক্তির ছন্দে ছন্দে নৃত্য না দেখ ততদিন তোমার স্বচ্ছন্দতা নাই।

যশোদা কৃষ্ণকে আঙ্গিনায় নাচাইতেন, কালী শিববক্ষে নৃত্য করেন—কেন এই ভগবানের নৃত্য? কেন সাধকে এই নৃত্য এত ভালবাসেন? শক্তির চৈতন্য সহিত নৃত্য, ইহাই না আদি স্পন্দন? পরিপূর্ণ শান্ত পরমাত্মার চলনই এই স্পন্দন, এই নৃত্য। তাই গায়ত্রী "ছন্দসাংমাতঃ"। এই স্পন্দন হইতেই সৃষ্টি। এই ছন্দই আবার বেদ। এই ছন্দই আবার গায়ত্রী, উষ্ণিক্ অনুষ্টুপ্, বৃহতী পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী এই সপ্তভাগে বিভক্ত। আরও আছে ব্যক্তি, কান্তি, সত্যা, বিরাট, বিভ্রাট, বিস্তারপঙ্‌ক্তি, কাত্যায়নী, মহাজগতী, মহিম্নতী, নৃমতী, ভূচ্ছন্দ, ভুবচ্ছন্দ—কত অনন্ত ছন্দে এই আদিশক্তি নিরন্তর নৃত্য করেন। গায়ত্রী ছন্দে ব্রাহ্মণ, অন্যান্য ছন্দে অন্য সমস্তের উৎপত্তি। তাই ছন্দে থাকিলে তাহাকে বলে স্বচ্ছন্দ। ছন্দভঙ্গেই ব্যভিচার।

তালে তালে ছন্দ যদি না হয়, তালে তালে নৃত্য যদি না হয়, এক সুরে সব যদি না বাজে তবে ত সঙ্গীত ভাল লাগেনা। জগতে যেখানে সঙ্গীত নাই, সেখানে রস নাই, সেখানে আনন্দ নাই। সেখানে ভগবান আচ্ছাদিত—সেখানে ভগবানের প্রকাশ নাই।

শক্তিই ছন্দ, শক্তি স্পন্দন। এক মহাস্পন্দনে জগত নাচিতেছে। তাই বলিতেছিলাম আপনার শক্তিকে দর্শন কর। কথন শক্তি সঙ্গে এক হইয়া পরম-পুরুষের কাছে নৃত্য কর, কথন পুরুষ হইয়া শক্তির নৃত্য দর্শন কর। এই শক্তির নৃত্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নৃত্য হইতেছে বুঝিবে।

পথিক! যাতে তাতে নাচিলে হইবে না, ছন্দে ছন্দে নাচিতে হইবে। যখন ছন্দে ছন্দে সকল কার্য্য করিতে পারিবে তখনই তোমার সব জ্বালা জুড়াইবে।

তাই আগে এক ছন্দে এক স্পন্দনে মনকে স্পন্দিত করিতে অভ্যাস কর। ইহার জন্য নিষিদ্ধ কর্ম্ম বা অচ্ছন্দে স্পন্দন ত্যাগ করিতে হইবে আর মনকে ছন্দে স্পন্দন বা উপাসনা করাইতে হইবে।

ঋষিগণ এই উপাসনা বুঝিতেন, এই উপাসনা করিতেন—অপরে উপাসনা বুঝিয়া করে না—প্রার্থনা করে মাত্র।

প্রার্থনা এক বস্তু, উপাসনা আর এক বস্তু। না বুঝিলে উপাসনা হয় না—প্রার্থনায় একটা বিশ্বাস মাত্র থাকে।

এস এস একবার উপাসনা কর। নিত্যই ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া মনকে ব্রহ্মভাবে স্পন্দিত করিবার অভ্যাস করা উচিত। সূর্য্যাদি শূরগণ স্থির দৃষ্টিতে কোন্ সীমাশূন্য পরম পদের পানে চাহিয়া আছে দেখিতেছ? উহাকেই লক্ষ্য করিয়া এস এস উপাসনা কর।

ভারতের মঙ্গল চিন্তা।

ভগবান আছেন, জগতের মঙ্গল তিনি করেন, ভারতেরও মঙ্গল তিনি করিবেন। যদি সমস্ত ভারতবাসী কোটি কণ্ঠে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করে তবে কি ভারতের মঙ্গল সাধিত হয় না? মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্য ভারতের সমস্ত সম্প্রদায় একত্রিত হইয়া যেরূপ ভগবানকে জানাইয়াছিল, সেইরূপ, এই দুর্দ্দিনে, সমস্ত সম্প্রদায় একত্রিত হইয়া ভারতের মঙ্গলের জন্য কেননা প্রার্থনা করে। হরি নামে যদি প্লেগ শান্ত হয় তবে কি কোটি কণ্ঠে হরিনাম হইলে ভারতের সমস্ত উপদ্রব শান্ত হয় না? ভগবানের নামের কি জোর নাই?

সকলেই ত ভারতের মঙ্গল চাহেন। রাজাও ভারতের মঙ্গল চাহেন, পাদরীগণও চাহেন, মুসলমান ভারতের মঙ্গল চাহেন, শিক, পারশী, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, আর্য্য সমাজী, কে না ভারতের মঙ্গল কামনা করিতেছেন ?

এক বনে সিংহ ব্যাঘ্রও থাকে আবার হরিণ শশকও থাকে। আপন আপন প্রাণরক্ষা করিয়াও ইহারা থাকিতে পারে। কখন কখন হিংসাও করে। মানুষ ত হিংস্র জন্তু নহে। ইহারা যদি মনুষত্ব পাইয়া থাকে তবে ঐ হিংসাটুকু বাদ দিয়া কেননা এক সঙ্গে থাকিতে পারিবে ?

ভগবানের নাম ও রূপ বহু হইতে পারে কিন্তু ভগবান এক। সকল লোকের ভগবান এক। আপন আপন স্বভাব মত এক ভগবানকে নানাভাবে লোকে দেখে ইহাই স্বাভাবিক। সকলের চক্ষু একরূপ নহে, সকলের মন একরূপ নহে, সকলের ভাব একরূপ নহে। এক ভগবানকে পৃথক পৃথক লোকে পৃথক পৃথক ভাবে ডাকিলে ক্ষতি কি ?

জগতের প্রকৃত অমঙ্গল কোথায়, ভারতের যথার্থ অমঙ্গল কি ইহাও ত সকলে ঠিক করিয়া ধারণা করিতে পারে না। তবে নিজের বুদ্ধিতে দুঃখ প্রতিকার করিতে উন্মত্ত চেষ্টা না করিয়া যদি সকলে মিলিয়া ভগবানকে ডাকে তবে কি কোন ফল হয় না ?

অন্য অন্য জাতি একথা শুনিবেন কি না জানিনা। হিন্দুত শুনিতে পারেন।

ভারতে ৫২ লক্ষ সাধু আছেন শুনিতে পাওয়া যায়। ভারতে হিন্দুর তীর্থ অসংখ্য। কত কোটি কোটি লোক প্রত্যহ তীর্থ দর্শন করে। এই ৫২ লক্ষ সাধুর অনেকের মিলন হয় কুম্ভমেলায়। প্রতি সাধু ভারতের মঙ্গল কামনা করিয়া যদি একবার মালা ফিরান তবে ৫২ লক্ষ কণ্ঠে ভগবানকে জানান হয়, প্রতি তীর্থের পাণ্ডাগণ, প্রতি তীর্থের মহন্তগণ, প্রতি আখড়ার সন্ন্যাসীগণ যদি নিয়ম করিয়া দেন প্রথমেই ভারতের কল্যাণ জন্য সমবেত কণ্ঠে ভগবানকে জানাইতে হইবে তবে কি এ কার্য্য অসম্ভব হয় ?

কত মহাপুরুষের নিকটে প্রত্যহ বহুলোক সমবেত হয়েন। যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন যদি মহাপুরুষ প্রথমেই সকলকে ভারতের উপদ্রব, অশান্তি নিবারণ জন্য, দুই চারি কথায় লোককে বুঝাইয়া দিয়া সমবেত লোকমণ্ডলীকে নাম করান—যদি স্থানে স্থানে "জয় জয় মহিষাসুর-মর্দ্দিনি রম্য কপর্দ্দিনি শৈলসুতে" "হর হর মহাদেব শম্ভু" "জয় জয় মহাবীর" "জয় জয় রাম জয় সীতারাম" "গৌরীশঙ্কর সীতা রাম" "হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" এই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে ২ সমবেত কণ্ঠে সকলকে যদি নাম করান, তবে কি ধর্ম্ম হয় না ? তবে কি ভারতের প্রকৃত কল্যাণ হয় না ? ভারতের মঙ্গল কামনা করিলেও আপনা হইতে নিজের মঙ্গল হইবেই।

তপস্যাই হিন্দুর বিশেষত্ব। হিন্দুর শাস্ত্র সর্ব্বত্র ইহা বলেন। ভারতের প্রতি সাধু, ভারতের প্রতি মনুষ্য, যদি ত্রিসন্ধ্যায় ভারতের মঙ্গল জন্য একবার করিয়া মালা ফিরান, তবে সত্বরে কি ভারতের দুঃখ উপশম হয় না ?

নিজের মঙ্গলের জন্য তপস্যা চাই, ভারতের মঙ্গলের জন্য তপস্যা চাই! নিজের জন্য তপস্যা একা করিতে হইবে, সমস্ত ভারতের জন্য তপস্যা করিতে হইবে একা এবং সমবেত শক্তি লইয়া। ইহা কি কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় না?

গৃহে গৃহে দিনান্তে সন্ধ্যাকালে পরিবারের সকলে একত্রিত হইয়া ভারতের কল্যাণ জন্য একবার করিয়া কি প্রত্যহ "রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং, কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং" অথবা শক্তি মন্ত্র, অথবা শিব মন্ত্র অথবা যে গৃহস্থের যে উপাস্য দেবতা সেই মন্ত্র—আবার বলি দিনান্তে সন্ধ্যাকালে একবার করিয়া প্রত্যহ ভারতের কল্যাণ জন্য ভগবানকে ডাকা কি অসম্ভব?

প্রতি হরিসভায়, প্রতি আখড়ায়, প্রতি মহাপুরুষের নিকটে, প্রতি তীর্থে, প্রতি মেলায়, প্রতি মহোৎসবে, প্রতি জন্মোৎসবে—ইহা কি করা যায় না? যাঁহারা ধর্ম্মভাবে দেশের কল্যাণ চাহেন তাঁহাদের জনে জনে পৃথক চেষ্টায়, সকলের সমবেত চেষ্টায় ইহা কি কার্য্যে পরিণত করা যায় না?

কত সাধু, কত সম্প্রদায় ভারতে আছে। নাগা দলের জুনা, নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী, অটল, আলেখিয়া, অবধূত; সন্ন্যাসীগণের মধ্যে দণ্ডীস্বামী, পরমহংস গণ; বৈরাগী সম্প্রদায়ের রামানুজ স্বামীর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীগণ, বল্লভাচার্য্য স্বামীর দ্বৈতবাদীগণ, রামানন্দী, বিশ্বনাথী, মাধবাচার্য্য বৈরাগী, চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৈরাগী; উদাসী সম্প্রদায়ের নানকপন্থী, দাদুজীর দাদুপন্থী, কবির জীর কবিরপন্থী, গোরক্ষনাথের নাথ সম্প্রদায়, অঘোর সম্প্রদায়, গরীব দাসী সম্প্রদায়, রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়, ভারত ধর্ম্মমণ্ডল সম্প্রদায়—সকল সম্প্রদায় কি ভারতের মঙ্গল জন্য প্রতিদিন ভগবানের নাম প্রতিদিন একবার করিয়াও করিতে পারেন না? যোগীমঠ সারদামঠ শৃঙ্গেরীমঠ এবং গোবর্দ্ধন মঠের শঙ্করাচার্য্য জগৎগুরুগণ কি ভগবানকে প্রত্যহ ভারতের কল্যাণ জন্য একবার সমবেত শক্তিতে ডাকিতে ও ডাকাইতে পারেন না? ইহাতে কি ভারতের কল্যাণ হয় না? ইহাতে কি ব্যক্তিগত ধর্ম্ম ও জাতিগত ধর্ম্ম আচরণ হয় না?

স্বদেশহিতৈষীগণ যদি প্রাণপণে ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন তবে বুঝি আবার ভারতের ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে। যদি মুসলমান মোল্লাগণ ও মৌলবীগণ, যদি খৃষ্টান পাদরিগণ ভারতের কল্যাণ জন্য মস্‌জিদে গীর্জ্জায় প্রতিদিন ক্ষণকালের জন্য ভগবানকে ভারতের দুঃখ প্রতিকার জন্য জানান তবে ভারতের ধর্ম্মশক্তি নিশ্চয়ই আবার জাগরিত হয়। যে ধর্ম্মশক্তি এইরূপে ভারতে জাগিবে—পৃথিবীতে তাহা অন্য জাতিতে নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবে। এইরূপ করিলে জগতের দুঃখ বুঝি দূর হইতে পারে।

অন্য দিক দিয়া ত দেখা হইল একবার ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখায় দোষ কি?

রেজেষ্টরী নং A362.

দ্বিতীয় বর্ষ] ১৩১৪ সাল, শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা]

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

বিষয়।

উৎসব।

ওঁ শ্রী আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২য় বর্ষ] ১৩১৪ সাল, শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা

উপাসনা অভ্যাস।

বর্ষ বর্ষ ধরিয়া স্মরণ অভ্যাস, উপাসনা অভ্যাস করিতে করিতে ভাবনা যখন আয়ত্ত হইয়া যায়, যখন সর্ব্বদাই এক ভাবনা লইয়া থাকা যায়, তখন ব্যবহারিক কার্য্যও প্রবাহ-পতিত মত হইয়া যায়, আর ধারণাভ্যাসী ও হওয়া যায়। ধারণাভ্যাসীর ঊর্দ্ধ গতি সুনিশ্চিত। পাঠ বা ভাবনা, ক্রিয়া, উপাসনা, বিচার বহু বর্ষ ধরিয়া এক নিয়মে করা উচিত। তাই উপাসনা আলোচিত হইতেছে।

হে রমণীয়দর্শন! তোমার সহিত মিলিত হইতে না পারিলে আমাদের সকলই বৃথা। বৃথা আমার চেষ্টা, বৃথা আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, বৃথা আমার জীবন, বৃথা আমার জগতে আগমন।

কে আমায় তোমার সহিত মিলন করাইয়া দিবে? যাঁহারা তোমার নিকটে সর্ব্বদা থাকেন তাঁহারাই পারেন! রাজদর্শন কিরূপে হইবে, রাজার সহিত পরিচয় কিরূপে হইবে, যদি রাজার সহচর কেহ রাজার নিকটে লইয়া না যান?—যদি কোন রাজসহচর রাজার সহিত পরিচয় করিয়া না দেন?

আমি আপনি সেখানে যাইতে পারি না। তাঁহার প্রতীকে যাঁহারা থাকেন তাঁহারাও সেই রমণীয়দর্শনের মত। সেই শক্তি, সেই আনন্দ, সেই জ্ঞান, তাঁহাদেরও আছে। তাঁহার সহিত সমান হইয়াও তাঁহারা তাঁহার সেবা করিতে ভাল বাসেন। এক হইয়াও তাঁহার সহিত পৃথকত্ব রাখিয়া তাঁহাকে ভালবাসেন। একায় ভালবাসা নাই, একায় প্রেম নাই। আপনাতে আপনি থাকা, আর আপনাকে আপনি আস্বাদন করা—দুইই উত্তম—শেষটিতে থাকাও আছে, আস্বাদনও আছে, তাই ইহা আরও উত্তম। তাই এক হইয়াও বহু হওয়া।

কে তবে সেই রমণীয়দর্শনের সহিত মিলাইয়া দিবে? কে তবে আমায় রক্ষা করিবে? আমি কোন্ প্রতীকের উপাসনা করিব?

যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম তখন কে রক্ষা করিয়াছিল? স্তন্যরস। এই স্তন্যরসের অধিষ্ঠাত্রী মা আমায় রক্ষা করিয়াছিলেন। এই পরিদৃশ্যমান বৃক্ষলতা, আকাশ নক্ষত্র, জল বায়ু, কি এক রসে যেন সরস হইয়া আছে—কোন এক রস যেন জগতকে রক্ষা করিতেছে—কোন এক সরসবতী, কোন এক সরস্বতী, যেন জগতকে রসযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। যে মনুষ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কত সুন্দর মনে হয় সেই অঙ্গে রস আছে বলিয়াই সুন্দর। আঙ্গীর-সই অঙ্গের প্রাণ। যে অঙ্গে রস থাকে না তাহাই প্রাণ-হীন।

অন্ন না থাকিলে দেহের রসও হয় না। যিনি অন্ন দিয়া জীবন রাখিতে-ছেন, তিনিই রমণীয় দর্শনের সহিত মিলন করিয়া রক্ষা করিবেন—তাই সেই রসস্বরূপিণীর উপাসনা আমরা করি। বাহিরে এই জল তাঁহার মূর্ত্তি। অন্তরে এই প্রাণ তাঁহার মূর্ত্তি।

কে বলিল জলের সামর্থ্য নাই? কে বলে জল জড়? মাতার স্তন্য যখন মাতার অঙ্গে থাকে—তখন স্তন্য রস কোন্ শক্তি ধারণ না করে? যে জল, রস রূপে জগত রক্ষা করিতেছে, তুমি যদি দেখ উহা রসাধার স্তনের ন্যায় মাতার অঙ্গ, তবে কেন বলিবে না, মা স্তন না দিলে শিশুর রক্ষা হয় না—শিশু যখন বড় হয় তখন মাতার ক্রোড়ে উঠিয়া স্তন ধরিয়াই পান করে, স্তন যেমন মাতার অঙ্গ জল সেইরূপ মাতার অঙ্গ—শ্রীমাতেশ্বরই জলের মধ্যে রস রূপে থাকিয়া জগতকে সরস করিতেছেন। তাই জলের সামর্থ্য আছে—ইহা শুধু জল নহে—ইহা মাতাই—তাই মাকে বলি মা অন্ন দিয়া ইহলোকে রাখিলে, রমণীয় দর্শনের সহিত মিলন করাইয়া অনন্ত জীবন দিয়া দাও মা।

বড় ত্রিতাপতাপিত হইয়াছি। সংসার-মরুভূমে নীচে তপ্ত বালুকা, উপরে প্রখর সূর্য্য, শূন্যে তপ্ত বায়ু—ভূ ভুব স্ব হইতে আমার কর্ম্ম দোষে ত্রিতাপ আসিয়া আমায় দগ্ধ করিতেছে—শরীর ঘর্ম্মদিগ্ধ, মললিপ্ত। ছায়াময়ি—ছায়া দান করিয়া ঘর্ম্ম শুষ্ক করিয়া দাও—জলময়ি! সুশীতল জল দিয়া আমার শরীরের মলা অপসারিত কর। আর মনের মলা? মা মনের মলা ধুইয়া দিয়া আমায় রমণীয় দর্শনের সহিত মিলাইয়া দাও।

কিরূপে মনের মলা যাইবে—কিরূপে মিলন হইবে? ভাবনা—বিষয়-ভাবনাই মনের মলা। মা—সেই রমণীয় দর্শনের ভাবনা দ্বারা আমার বিষয়-ভাবনা ভুলাইয়া দাও। ইহাই মিলনের এক মাত্র পন্থা।

আহা কি মধুর ভাবনা! ঋতঞ্চ সত্যং পরব্রহ্ম মাত্র মাসীৎ। মহাপ্রলয় সময়ে সমস্ত জগৎ যখন শব্দমাত্রে লয় হয়, আবার সমস্ত শব্দরাশি এক মহাশক্তিতে লয় হইবার জন্য প্রধাবিত হয়—যখন লয় হইতেছে, তখন যে স্পন্দনে জগত ভাসিয়াছিল, সেই স্পন্দন জগতকে আপন সত্তায় লীন করিয়া—ধীরে ধীরে সেই রমণীয় দর্শনের বক্ষে লয় হইয়া যায়। যেমন শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি প্রথমে ভারি শব্দ তুলিয়া কোন সীমাশূন্য অবকাশে লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ।

প্রকৃষ্ট রূপে লীন হওয়াই প্রলয়। স্থূল স্থূল বস্তু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবস্থায় লীন হইতে হইতে শেষে সমস্ত দৃশ্য জগত আর থাকে না—থাকে এক মহাস্পন্দন। স্থূল পৃথ্বী জল হইয়া যায়, জল অগ্নি হইয়া যায়, অগ্নি বায়ু হইয়া যায়, বায়ু আকাশ হইয়া যায়, আকাশ শব্দরাশি মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, শব্দরাশি লয় হইয়া এক মহাস্পন্দন মাত্র থাকে। সেই স্পন্দন ক্রমে ধীরে ধীরে সীমাশূন্য অনন্ত ব্রহ্মে লয় হইয়া যায়। থাকে সেই সচ্চিদানন্দ, পরম শান্ত, পরম রমণীয় দর্শন। তিনিই ঋতং তিনিই সত্যং। ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি। পরমাত্মভাবই ঋত। ভাবের স্পন্দনই সত্য। ভাবনাই আদিস্পন্দন—আদি-স্পন্দনই আদিভাষণ। পরমাত্মভাবই ব্রহ্ম—পরমাত্মশক্তিই যখন স্ফুরিত হয়েন, তখনই শব্দব্রহ্ম। ইহাই প্রণব ও ব্যাহৃতি। ইহার পরে ইহার আচ্ছাদন এক মহাঅন্ধকার। সৃষ্টি এই মহান্ধকার। মহান্ধকারের ভিতরে এক মহাপ্রকাশ। "প্রণবেণ ব্যাহৃতিভিঃ প্রবর্ত্ততে তমসস্ত পরং জ্যোতিঃ।" এই তমসস্ত পরং জ্যোতিই মহাপুরুষ স্বয়ম্ভূ বিষ্ণু। মহাপুরুষে মহাপ্রকৃতি যখন প্রকৃষ্টরূপে লীন থাকেন তখনই মহাপ্রলয়।

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। কে ইঁহাকে জানিবে কে ইঁহাকে বলিবে? "যন্নবেদা বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্"। আবার মহাপ্রলয়াবসানে সৃষ্টি আরম্ভ। মহাপুরুষ আপন প্রকৃতিকে ঈক্ষণ করেন, এই ঈক্ষণই ভাবনায় ঈক্ষণ। ঈক্ষণে "আমি ইহা" বা "ইহা নহি" সন্দেহ। "আমি ইহা" যখন নিশ্চয় হয়, তখন প্রকৃতির সান্নিধ্য হয়। যাহা মিশিয়া ছিল তাহার পৃথকত্ব হয়, তাই সান্নিধ্য। সগুণব্রহ্ম আপন শক্তি লীন অনন্ত জীবপুঞ্জ দর্শনে কৃপাপরবশ হইয়া যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি আরম্ভ করিবার ইচ্ছা করেন।

সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা। ব্রহ্ম তপস্যা দ্বারা উজ্জ্বলিত হইলে যখন পরম ভর্গকে অবলোকন করেন তখন রাত্রি সৃষ্ট হয়। পরম জ্যোতি দর্শন করিয়া মহা অন্ধকারের অনুভব হয়। কেন জগৎ সৃষ্ট হয়?

জীব স্বপ্নশূন্য নিদ্রা অবস্থায় যখন আচ্ছন্ন তখন মহাপ্রলয়। জীবমধ্যে অনন্ত অনন্ত জীবপুঞ্জ আপন আপন কর্ম্মবশে জড়প্রায় ছিল। ক্রমে কর্ম্ম সমূহ যখন ফলদানোন্মুখ হয় তখন ফলদানোন্মুখ কর্ম্মবশে জীবের জাগ্রত অবস্থা আইসে। এই জাগ্রতাভিমানী পুরুষই সপ্তাঙ্গ, একোনবিংশতি মুখ, বহিঃ প্রজ্ঞ, স্থূলভুক্। ক্রমে সৃষ্টি।

ক্রমে রাত্রি, সমুদ্র, অর্ণব, সংবৎসর, দিন রাত্রি, সূর্য্য চন্দ্র, মহজনাদি লোক, অন্তরীক্ষ-লোক, স্বর্গ-লোক—এই সমস্তের প্রকাশ।

এই মহাপ্রলয় ও সৃষ্টি-ভাবনা ভিন্ন সংসার-ভাবনা দূর হয় না। পরে স্থিতি ভাবনা দ্বারা উপাসনা। সপ্রণব ব্যাহৃতিযুক্ত এই বিশ্বরূপের উপাসনা ভিন্ন—এই মহাশক্তির নিকট প্রার্থনা ভিন্ন, ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন জীবশক্তি সেই অপরিচ্ছিন্ন রমণীয় দর্শনের সহিত মিলিত হইবে কিরূপে? যে সূর্য্য জগদেকচক্ষু, যিনি সেই রমনীয় দর্শনকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি প্রভু! তুমি তোমার প্রবল জ্যোতিঃ একবার সরাইয়া লও, লইয়া আমাকে আমার রমণীয় দর্শনের সহিত মিলাইয়া দাও। আমি পারি না, তুমি করিয়া দাও। হে প্রভু! তুমি আমাদিগকে প্রাপ্ত হও, আমরা তোমায় প্রাপ্ত হইতে পারি না।

এই ভাবনা গুলি হৃদয়ে ধারণা করিয়া প্রাণকে বড় করিতে হইবে। প্রাণকে বড় করাই প্রাণায়াম। গ্রহণ করা ও পরিত্যাগ করা পুনঃ পুনঃ ভাল লাগেনা; তাই গ্রহণ ও ত্যাগ না করিয়া, একভাবে থাকিতে চাই—তাই কুম্ভকে স্থিতি ভিন্ন সেই রমণীয় দর্শনের সহিত মিলন হয় না। প্রাণকে স্থির করিলেও যাহা

হয়, মনকে উপাসনা দিয়া শান্ত করিলেও তাই হয়; আবার বুদ্ধিকে বিচার দ্বারা ব্রহ্ম মুখে লইলেও তাই হয়। প্রাণ, মন ও বুদ্ধি—এই ত্রিবিধ শক্তির সাহায্যেও মিলন হয়। যোগ, উপাসনা, আত্মবিচার, এইজন্য রমণীয় দর্শনের প্রাপ্তি ক্রম। যাহার যাহা রুচি। একটি ছাড়িয়া একটিতে আটকাইয়া থাকিলে হয় না।

জীবনে ইহা সম্পাদন করাই মহোৎসব। উৎসব কি এই ব্যাপারে অগ্রসর করিতে পারিবে? যাঁহারা উৎসবে আছেন, তাঁহাদের কৃপায় সমস্তই সিদ্ধ হইবে।

হৃদয়কে বাড়াইতে অভ্যাস করা চাই। আমরা সকলেই ভালবাসি আপনাকে। স্বামীর জন্য স্বামীকে ভালবাসা হয় না। পত্নী নিজের সুখের জন্য স্বামীকে ভালবাসে। "নবা অরে পত্যুঃ কামায় পতি প্রিয়োভবতি। আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।" সেইরূপ; নবা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। আত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ব্রহ্মের সুখের জন্য ব্রহ্মকে ভালবাসি না। আপনার সুখের জন্য ব্রহ্মকে ভাল বাসি। শ্রুতি ইহা বলেন, এই যে "আপনা" বলিয়া বস্তুটি ইহাই আত্মা। এই আত্মাই সকলের মধ্যে। তুমি ইহাকে খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন মনে করিয়া কষ্ট পাও। কিন্তু যদি হৃদয় বাড়াও, তবে নিজের দুঃখ দূর করিবার জন্য যাহা কর, অন্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহাই করিতে হয়। ক্রম এই রূপ। কন্যার বিবাহ দিতে না পারিয়া এক জন ক্লেশে আছে। তুমি চিন্তা কর, যদি তোমার এইরূপ হইত, তবে কত ক্লেশ পাইতে; যদি তোমার এক জন বন্ধুকে এক খানি চিঠি লিখিলে উহার সাহায্য হয়, তাহা তোমার দ্বারা অনায়াসে হইতে পারে। রাস্তায় কোন বালক ক্ষুধায় কাঁদিতেছে। তুমি যখন ঐ স্থান দিয়া যাইতেছ তখন একবার দাঁড়াও। দাঁড়াইয়া চিন্তা কর, যদি তুমি ক্ষুধায় পীড়িত হও, তবে তোমার কত ক্লেশ হয়। ইহা চিন্তা করিলেই তুমি দান করিতে পারিবে। এইরূপে তোমার হৃদয় বাড়িবে। ইহাই করুণা অভ্যাস। এইরূপে মৈত্রী, মুদিতা ও উপেক্ষা, অভ্যাস কর—হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূর হইবে। তোমার আত্মাকেই সর্ব্বত্র দেখিবে; সর্ব্ব জীবে দয়া আসিবে। তুমি তখন সাধনা দ্বারা আত্মতৃপ্তির সহিত আত্মজ্ঞান-লাভ-পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। বৎসর ধরিয়া ইহা নূতন করিয়া আরম্ভ কর ভগবান মিলিবে।

নাম সাধনা।

কথা কওয়া, শোনা ও দেখা নাম সাধনার এই তিন অঙ্গ। নাম ও রূপের মধ্যে নাম বড়; কারণ নামের মধ্যে রূপ আছে—সাধু মুখে ইহা শ্রবণ করা যায়। গোস্বামী তুলসী দাসের রামায়ণেও ইহা দেখা যায়।

দেখিয় রূপ, নাম অধীনা।
রূপ জ্ঞান নহিঁ নাম বিহীনা॥

বিচার করিয়া দেখ, রূপ নামের অধীন। কারণ নাম ভিন্ন রূপের জ্ঞান হয় না।

সুমিরিয় নামরূপ বিনু দেখে।
আবত হৃদয় সনেহ বিশেখে॥

রূপ না দেখিয়াও নাম স্মরণ করিলে ঐরূপই হৃদয়ে ভাসে। তাহাতে প্রীতিও অধিক হয়।

নাম ও রূপের কথা অকথনীয়। নাম ও রূপের মধ্যে সেই বড়, যাহার গুণ বেশী। নাম শব্দ মাত্র। শব্দই বড়। শব্দই প্রণব। শব্দই আদি স্পন্দন। এই জগৎ প্রণব হইতেই জন্মিয়াছে। বেদে ইহা শুনা যায়।

নাম সাধনাই দুর্ব্বল সাধকের একমাত্র অবলম্বন।

নামকে হৃদয়ে বা ভ্রূমধ্যে রাখিয়া নামকে জীবন্ত মনে ভাবিয়া লইয়া, প্রতি দুঃখ কালে নামকে ডাকিয়া কথা কও—শান্তি অনুভব করিবে। যে হতভাগা একবারে ইহা পারে না, সে বহুবার ইহা করিতে থাকুক, এক দিন না এক দিন, দুঃখশান্তি অনুভবে আসিবেই। এক দিন আসিলেই শ্রদ্ধা বাড়িবে। শাস্ত্রে ভক্তি বিশ্বাস বাড়িয়া যাইবে। তখন দুঃখের কথা মানুষকে জানাইতে ইচ্ছা হইবে না। নামরূপী প্রাণেশ্বরকে পুনঃ পুনঃ বলিতে ছুটিবে—ইহাই কথা কওয়া। করিয়া দেখ হইবে। ইহাই মানুষকে আশ্রয় না করিয়া ভগবানে নির্ভর করা।

দ্বিতীয় কথা শোনা। মন্ত্র যেরূপ ভাবেই উচ্চারণ কর না—নিজের উচ্চারিত মন্ত্র নিজের কর্ণে শুনিয়া শুনিয়া নাম জপ করা চাই। ইহা ইন্দ্রিয়-জয়ের প্রথম সোপান। সর্ব্বদা যিনি নাম জপ করিতে পারেন—সর্ব্বদা যিনি আপন উচ্চারিত নাম শুনিতে শুনিতে জপ করিতে পারেন, তিনি আর অন্য কথা শুনিতে পান না। বাহিরের কথা না শুনিয়া নিজের জপ নিজে শুনিতে অভ্যাস যিনি করিয়াছেন তিনি জানেন ইহাতে কত শীঘ্র মন একাগ্র হয়।

বাহিরের কথা শ্রবণ বন্ধ হইলেও ভিতরের চিন্তা থাকে। প্রতি চিন্তাও শব্দ সাহায্যে হয়। ভাবনা ও যাহা, চিন্তাও তাহা। যেখানে ভাবনা, সেইখানে চলন। যেখানে চলন, সেইখানে শব্দ। ভাষা বা শব্দ না হইলে চিন্তা হইতেই পারে না।

নাম জপে আপনার উচ্চারিত শব্দ আপনি যখন শ্রবণ করা যায়, তখন বাহিরের শব্দ ও যেমন বন্ধ হয়, সেইরূপ অন্তরের চিন্তাও বন্ধ হয়। করিয়া দেখিলেই জানা যায়। ভ্রূমধ্যস্থিত জ্যোতি দিয়া নাম লেখ, তাহাই দেখিতে দেখিতে আপন কর্ণে শুনিয়া শুনিয়া জপ কর, অন্তর জয় হইবে।

বহু দিন জপ অভ্যাস করিতে করিতে রূপ আসিবেই। যাঁহারা তত বিলম্ব সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহারা কল্পনায় ভ্রূমধ্যে জ্যোতির বিন্দু কল্পনা করিয়া করিয়া তন্মধ্যে মণি দ্বীপ—তন্মধ্যে কল্প-বৃক্ষ তলে মণ্ডপ কল্পনা করুন। মণ্ডপ মধ্যে জ্যোতির ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি মনে মনে গঠন করুন, চাঁদের কিরণে বিজুরী মাখাইয়া মৃণাল সুভুজ গঠন করুন, পদ্ম চক্ষু ধারণা করুন, চরণারবিন্দ কল্পনা করুন, হইবে।

"ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে" চিন্তা করুন—হইবে।

জ্যোতির দেবতাকে জ্যোতির মধ্যে স্থাপন করিয়া বলুন।

হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো।
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো॥
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম।
হাহা কদানুভবিতাসি পদং দৃশোর্ম্মে॥

এই ভাবে কথা কহুন—পরে কল্পনায় দেখিতে চেষ্টা করুন।

অংশালম্বিত বামকুণ্ডলভরং মন্দোন্নতং ভ্রূলতং।
কিঞ্চিৎকুঞ্চিতকোমলাধরপুটং সাচিপ্রসারেক্ষণম্॥
আলোলাঙ্গুলি পল্লবৈর্মুরলিকা মাপূরন্তরং মুদা।
মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গললিতং জানে জগন্মোহনং॥

আবার কথা কহুন।

হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে।
হে কংশান্তক হে গজেন্দ্র করুণাপারীণ হে মাধব॥
হে রামানুজ হে জগত্রয় গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং।
হে গোপীজননাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা॥

আবার রূপ! কি সুন্দর—

কস্তুরি তিলকং ললাট ফলকে বক্ষঃস্থলে কৌস্তভং।
নাসাগ্রে নব মৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণম্॥
সর্ব্বাঙ্গে হরি চন্দনঞ্চ কলয়ন্ কণ্ঠেচ মুক্তাবলিঃ।
গোপস্ত্রী পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল চূড়ামণিঃ॥

এই ভাবে যে যাহা ইষ্টদেবতা, কুলক্রমে পাইয়াছেন, তাঁহারই সহিত মানসে কথা কহুন, তাঁহার নাম আঁকিয়া তাঁহাকেই জীবন্ত ভাবিয়া, দুঃখ জানাইতে থাকুন—এক কথায়—কথা কহুন, নাম জপ শ্রবণ করুন, এবং রূপ অন্ততঃ কল্পনায় দেখিতে থাকুন—এই ভাবে কথা কওয়া, শোনা, দেখায়, শান্ত হওয়া যায় ইহা অনুভব করিতে পারিবেন। এই কলিযুগের ত্রিতাপ তাপিত দুর্ব্বল অধিকারীর জন্য এতদপেক্ষা সহজ সাধনা যদি কেহ জানেন জানাইবেন। অধিক কি নাম জপ ও "মাং নমস্কুরু" অভ্যাসে সমস্তই হয়।

গীত।

খতেন্ করার মন জগতের কারখানা।
পেয়ে পরতত্ত্ব, সবাই মত্ত, আপনাকে কেউ দেখেনা॥
পরচর্চ্চা হয় দিনে রেতে
নিন্দা বন্দ্যা কত প্রকার যার রুচি যাতে
লয়ে পরের কলুষ আপনার হৃদে
হয়ে রয় কর্ম্মকাণা।
শাস্ত্র দেখে পণ্ডিতেরিগণ
দেখে মাত্র করে নাক শুদ্ধ আচরণ
ইথে হয় কেবল গাধার ভার বহন।
যেমন মশালচি পথ দেখায় অন্যে, চোক থাকতে আপনি কানা।
আপনার ছিদ্র আগে না দেখে
পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়ায় মনের কৌতুকে
ভেবে দেখেনা আমার আমি কে
দীন গোবিন্দ বলে উচিত বল্লে লবেনা কেউ ছোঁবেনা।

রেজেষ্টরী নং A 362.

[দ্বিতীয় বর্ষ] ১৩১৪ সাল, ভাদ্র ও আশ্বিন। [৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।
সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

বিষয়।

বিজ্ঞাপন।

উৎসব।

ওঁ শ্রী আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২য় বর্ষ] ১৩১৪ সাল, ভাদ্র। [৫ম সংখ্যা

হংস গীতি।

(ওমন) কুঁদের মুখে ব্যাঁক থাকে না।
যথাবিধি ছাড়লে বায়ু ফেলবে ফেড়ে সুষুমনা॥ ১॥
জোরে ক'রে তালব্য ক্রিয়ায়
জিহ্বার শিরটা বাড়িয়ে নেনা :—
টুঁটির গিট টা কণ্ঠায় এনে
গর্ত্তের ভিতর তোল্ রসনা॥ ২॥
নাকের ফুটোর উপর তলায়
থাক্‌বে ডগা রইলো জানা
(এখন) তেম্নি টেনে ফেল্‌লে বাতাস
বিঁদবে কুণ্ডলিনীর ফণা॥ ৩॥
(আছে) ত্রিতালু দ্বিদলের উপর
গোলকেতে কেষ্টাধানা
(সেথা) টানে টানে উঠলে জিহ্বা—
ক্ষরবে সুধা আর রবেনা॥ ৪॥
নেশায় বিভোর হয়ে রবি
চর্ম্ম চক্ষু আর রবেনা :—
(তখন) আধার, নাভি, হৃদয় গ্রন্থি
ছিঁড়ে যাবার ঠোর পাবেনা॥ ৫॥

গুরুর পায়ে নোয়া মাথা
গলাবাজী আর কোরোনা ঃ—
তিনি এমি স্থানে পাঠিয়ে দেবেন
ফুরিয়ে যাবে আনা গোনা ॥ ৬॥

জীবনের পরীক্ষা-আলোচনা ও প্রার্থনা।

১

আলোচনা।

অনেক বার এ পরীক্ষা দিতেছ কোনবারে কি উত্তীর্ণ হইলে? হও নাই। বালক কাল হইতে গণিয়া আইস—আজ পর্য্যন্ত যতগুলি পরীক্ষা দিয়াছ কোনটিতে সফলমনোরথ কি হইয়াছ? হও নাই।

যদি বালক কালের পরীক্ষার বিষয়গুলি ভাল করিয়া জানিতে, আর জানিয়া তাহার মত কার্য্য করিতে, তবে যৌবনে উত্তীর্ণ হইতে পারিতে, তবে যৌবন সুখের হইত; তবে যৌবন বহু দিন থাকিত, তবে কোন ব্যভিচার হইত না। তাহা হয় নাই—মনের মতন যৌবন যায় নাই। বিবাহে সুখ পাও নাই। সংযম অভ্যাস ছিলনা তাই আপনি শরীর নষ্ট করিয়াছ, স্ত্রীর শরীর নষ্ট করিয়াছ, সন্তান সন্ততিকে ঠিক ভাবে সংসারে আনিতে পার নাই।

এখনও যাহার যৌবনের পরীক্ষা চলিতেছে সে যদি ঘোর বিষয়াসক্ত না হয়, সে যদি যৌবন-মদে একবারে অন্ধ হইয়া না থাকে, যদি তোমার পুত্র, কন্যা ও যৌবনে অন্ধ হইতেছে দেখিতে পাও, তবে একটু সংযম-শিক্ষা দাও। যে কর্ম্মই করিতে নিযুক্ত করনা কেন যেন তাহাদিগকে তুমি কর্ম্মের কৌশলটুকু অভ্যাস করাইয়া দিও, নতুবা পুত্র কন্যার দুঃখ-জীবন জন্য পাপভাগী তুমিই হইবে। কর্ম্মের কৌশল কি পরে আলোচনা করিতেছি।

যৌবন-পরীক্ষায় যিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছেন তাঁহার সংসার সুখের হয় নাই। স্ত্রী পুত্র কন্যা বাধ্য হয় নাই। এই যে সংসারের ঝলথলি—ইহাতে তোমাদের কাহারও দেহ পর্য্যন্ত ঠিক থাকিতে পারে না। একে সংযম অভ্যাস নাই, তাহার উপর সংসারে কাহারও উপর দৃষ্টি ছিল না—কেহই কোন নিয়মে চলে নাই; আপন শরীর ও মন যেমন উদ্দাম ভাবে নাচিয়াছে, স্ত্রী পুত্র কন্যার দেহ ও মন সেইরূপ ব্যভিচারে নৃত্য করিতেছে, সুখ পাইবে কিরূপে? একটু বৃদ্ধ হইলেই পুত্র ও পুত্রবধূর নিতান্ত অশিষ্ঠ ব্যবহারে—ধন থাকিয়াও দরিদ্রের মত, রাজা হইয়াও চোরের মত আপন সংসারে আপনি থাকিবে। একে অসংযত শরীর বলিয়া রোগের জ্বালা, তাহার উপর যাহা ইচ্ছা তাহাই ব্যভিচার করিয়াছ—কখন খাদ্যাখাদ্য বিচার কর নাই—আপনি অখাদ্য খাইয়াছ—পরিবারস্থ সকলকে খাওয়াইয়াছ—খাওয়াইয়া সকলের দেহকে রোগের বিলাস-

ভূমি করিয়াছ বল, এ প্রৌঢ়াবস্থায় সংসারের জন্য, স্ত্রী পুত্রের জন্য তুমি ভুগিবেনা ত কে ভুগিবে ?

"আহার" জীবন-পরীক্ষার উপকরণের মধ্যে একটি প্রধান উপকরণ। ইচ্ছামত, যথেচ্ছা, শাস্ত্রনিষিদ্ধ আহার, যিনি করেন তিনি ইংরাজী শিক্ষায় বিদ্বান হইলেও কুশিক্ষা পাইয়াছেন। যদি ঈশ্বর-ভাবনা, মৃত্যু সংসার-সাগর পার হইবার প্রধান উপায় বলিয়া স্বীকার কর তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিও— কদর্য্য আহার বা শাস্ত্রনিষিদ্ধ আহার করিলে ঈশ্বর ভাবনায় কত অনিষ্ট হয়। শুধু শরীর রক্ষা জন্য আহার পশুতেই করে। যিনি মনুষ্য তিনি শরীর রক্ষাকে গৌণ রাখিয়া ঈশ্বর চিন্তাকে মুখ্য করিবার জন্য আহার করিয়া থাকেন। শাস্ত্র আহারের সম্বন্ধে বড় সতর্ক হইতে বলিয়াছেন। বেদে বলিতেছেন "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" ইতি শ্রুতিঃ। রাজসিক তামসিক আহার ত্যাগ করিয়া, সাত্ত্বিক আহার কর, তবে তুমি রজও তমোভাব বা লয়বিক্ষেপ দূর করিয়া সত্ত্বগুণে থাকিতে পারিবে। মন যখন নিরন্তর সত্ত্বভাবে থাকিবে তখন জ্ঞানচর্য্যায় জ্ঞান স্থায়ীভাবে তোমার হৃদয় অধিকার করিবে। শাস্ত্র ইহাও বলিয়াছেন ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা যদি তোমার আহার্য্য সংগ্রহ না হয়, তবে তুমি কখন সাত্ত্বিক থাকিতে পারিবে না।

যদি তোমার শিক্ষা তোমাকে মূঢ় অহংকারী না করিয়া থাকে, তবে কারণ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিবে যাহার অন্ন গ্রহণ করা যায় তাহার প্রবৃত্তিমত তোমার নিজের প্রবৃত্তি হইয়া যায়। এই জন্য প্রকৃত সাধক, যাহার তাহার দান গ্রহণ করেন না, যাহার তাহার অন্নও আহার করেন না। অর্থ যদি তোমার নিতান্ত আসক্তির বস্তু হয়, তবে তুমি যাহার জন্য বাধ্য হইয়া অর্থ ব্যয় কর তাহার অনিষ্টই হইবে। যাহার বাড়ীতে আহার করা যায়, সেই গৃহস্বামী বা গৃহস্বামিনী যদি মনে ভাবেন, এ আপদ আর কতদিন আমার বাড়ীতে আহার করিবে—তবে অতিথি যদি ধার্ম্মিক হয়েন তিনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে ভোজন দ্রব্য গ্রহণে তাঁহার মন স্বচ্ছন্দ থাকিতেছে না— যাহা আহার করিতেছেন তাহা যেন পাপ অন্ন ভোজন করা হইতেছে। কথাটি যদিও সূক্ষ্ম তথাপি ইহা অনুভূত সত্য। একজনের প্রবল আসক্তির বস্তুর ব্যবহারে অন্যের মনে সূক্ষ্ম ভাবে কষ্ট অনুভূত হইবেই।

শাস্ত্র এই জন্য যাহার তাহার অন্ন গ্রহণ করিতে নিষেধ করিতেছেন। শাস্ত্র-নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ ত দূরের কথা, মহাভারত বলেন "রাজার অন্ন গ্রহণে তেজের হ্রাস হয়, শূদ্রের অন্নে ব্রহ্মতেজের হানি হয়, স্বর্ণকার ও অবীরা স্ত্রীর অন্নে আয়ুর হানি হয়। বুদ্ধিজীবির অন্ন বিষ্ঠার সমান, বেশ্যা ও পরপুরুষাভিলাষিণীর অন্ন শুক্র সমান। অনিবেদিত কোন কিছুই অভক্ষ্য। শান্তি পর্ব্ব ৩৬ অধ্যায়।

সাধুগণ আরও বলেন "পাপীর অন্ন ও পাপীর দান গ্রহণ করিলে উপাসনার বিঘ্ন হয়"।

শ্রুতি যে বলিতেছেন "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ" ইহা অনুভব করিবার কথা। সত্ত্বশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন আত্মজ্ঞান কিছুতেই জন্মিবে না। আত্মজ্ঞান যদি না হইল তবে জন্মই বৃথা হইল। চিত্ত হইতে রজ ও তম দূরীভূত হইলেই চিত্ত শুদ্ধ হইল। মন-সংযম করিতে গেলেই—মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা করিতে গেলেই যে মনে নানা চিন্তা উঠে ইহা পাপের ফল। অনাদিকাল-সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কারে চিত্ত দুষ্ট হইয়া আছে—সর্ব্বদা লয় ও বিক্ষেপে ইহা ব্যাকুল। সাত্ত্বিক আহার ও শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম দ্বারা ইহাকে শুদ্ধ করিয়া পরে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ইহাই জীবনের কার্য্য। এই জন্যই আহার সম্বন্ধে সতর্ক হইতে হইবে; পুত্র কন্যাকেও সতর্ক করিতে হইবে।

সতর্ক করিবার উপায় শাস্ত্র যাহা বলেন—কর্ম্মের কৌশল যাহা তাহা আলোচনা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

জীবনের বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার নাই। তথাপি শেষ পরীক্ষার জন্য প্রাণ পণ করিলে শুভফল প্রাপ্ত হইবে।

চিত্তশুদ্ধি ত নাই। মৌখিক জ্ঞানের আলোচনায় তোমার কোন গতি লাগিবে না। গীতা সেই জন্য অশুদ্ধচিত্ত মনুষ্যকে কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন। কর্ম্ম অর্থে শাস্ত্রবিহিত লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম। এখন কর্ম্ম বিপর্য্যয়ের দিন। তথাপি চেষ্টা করিলে আমরা শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র হইতে পারি। চেষ্টা করিলে তিনি সুবিধা করিয়া দিয়া থাকেন।

মনে করা হউক তোমার কর্ম্ম

(১) জপ পূজা সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম

(২) অধ্যয়নাদি

(৩) অধ্যাপনাদি

(৪) আহার, ভ্রমণ শয়নাদি

এই যে চারি প্রকারের কর্ম্ম ইহার মধ্যে চতুর্থটি লৌকিক, অন্য গুলিকে বৈদিক কর্ম্ম যে দান যজ্ঞ তপস্যা ইহার মধ্যে ফেলা যায়।

যে কর্ম্মই কেন করনা কৌশল করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। কৌশল দুইটি।

(১) কর্ম্মের কর্ত্তা আমি নহি।

(২) আমার কর্ম্ম ও আমার শক্তিতে হয় না। তোমার শক্তি ভিন্ন আমি কর্ম্মও করিতে পারি না। প্রথম কৌশলটি জ্ঞানমার্গে, দ্বিতীয়টি ভক্তি-মার্গে। জ্ঞানমার্গের কথা ছাড়িয়া দিয়া ভক্তিমার্গে কর্ম্মকৌশল আলোচনা করাই কর্ত্তব্য, কারণ চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানালোচনা বৃথা। আর চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে এরূপ সাধকও বিরল।

বিশেষতঃ সন্ধ্যাবন্দনা জপ পূজা করিতেছি কিন্তু আমি কর্ত্তা নহি—"তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি" এ কথা অনুভব করিয়া বুঝিবার লোক বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

প্রার্থনা।

হে প্রভু! হে অগতির গতি! আমি এত দিন কর্ম্ম করিলাম, কিন্তু সর্ব্ব কর্ম্মে তোমায় মনে রাখা অভ্যাস করিতে পারিলাম না। "তুমিই যে আমার হৃদয়ের রাজা" "তুমিই যে আমার কর্ত্তা," "আমি যে কর্ত্তা নই" এ কথা এখনও অভ্যস্ত হইল না, হে অগতির গতি! আমার গতি বিধান কর। তুমি কর্ম্মের কৌশল বলিয়া দিতেছ, আমি আমার অনাদি-সঞ্চিত পাপ-সংস্কার বশে, তোমায় ডাকিতে বসিয়া, তোমায় ভুলিয়া তোমার পূজা করি; তোমার নাম জপ করি। তোমার নিকটে কর্ম্ম-নিষ্পত্তি জন্য শক্তি প্রার্থনা না করিয়া, আমিই আমার শক্তিতে কর্ম্ম করিতেছি বোধ করিয়া ফেলি—হে দয়াময়! কবে আমার নিরন্তর মনে থাকিবে আমি কিছুই নই—আমি কর্ত্তা নই, আমি তোমার দ্বারে কাঙ্গাল, আমি তোমার দ্বারে অতিথি, আমি তোমার দাসের—দাসের ও অযোগ্য? তোমায় ছাড়িয়া আমার চক্ষু কর্ণাদি কত বাহিরের বস্তু দেখে—দেখিবার কালে একবারও মনে করে না। হায়! তুমিই আমার ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া দাও! তুমিই আমায় শক্তি প্রদান কর। আহার্য্য বস্তু নিবেদন করিয়াও আমি তোমায় ভুলিয়া আহার করি। প্রভু! আমি বড়ই পাপী! পাপী বলিয়াই এত যাতনা পাই, পাপী বলিয়াই দুঃখ পাই। সকল প্রকার দুঃখ, সকল প্রকার মনোকষ্টই পাপের ফল—ইহা তোমারই কথা। হায়! কত যাতনা পাই কিন্তু যাতনাও সব সময়ে স্মরণ রাখিতে পারি না—এত দুঃখেও হাহা হিহি করিয়া ফেলি—আহা প্রভু সেই জন্য আপনাকে আপনি তিরস্কার করি—আবার সেই অপ-রাধ করি।

হে ভগবান! কত দিনে আমার এই হাহাকার ঘুচিবে?

পুনঃ পুনঃ অপরাধ করিতেছি, পুনঃ পুনঃ যাতনা পাইতেছি তবু ও স্মরণ অভ্যাস হইতেছে না। প্রভু! কত দিনে তোমায় প্রতিশ্বাসে স্মরণ করিতে পারিব?

হে ভগবান্! কাতর না হইলে তোমায় ডাকা হয় না, তোমার সন্ধ্যা পূজা হয় না। এতবার কাতর করিয়া দিতেছ—সব কাড়িয়া লইতেছ তথাপি যেই—সেই আছি—তথাপি কাতরতা স্থায়ী হইতেছে না। বুঝিতেছি তোমায় ডাকিবে মন। মনই যদি কাতর না হইল, মনই যদি আপন সংস্কার-জনিত চিন্তায় ডগমগ রহিল, মনই যদি অসংলগ্ন চিন্তা-তরঙ্গে বিলাসী লোকের মত হাহা হিহিতে রহিল, তবে জপ পূজা কে করিল? জপ পূজা মালা ফিরান মুখের কথাতেই রহিল—সত্য যাহা চলিল তাহা মনের সংসার চিন্তা। বল প্রভু! আমার কি হইতেছে। আমি মনকে বশ করিতে পারিতেছি না। প্রভু! আমি চেষ্টার ত্রুটি করিব না। হে কর্ম্মফল দাতা! তুমি আমার শাস্ত্রীয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া দাও তদ্ভিন্ন আর আমার কেহ নাই।

শাস্ত্রমত শরীর ও বাক্যকে স্পন্দন করিতে বলিতেছ। শাস্ত্রকর্ম্মই তোমার আজ্ঞা। তোমার আজ্ঞা পালন করিতে আমার সামর্থ্য নাই। শুধু ইচ্ছায় কি হইবে প্রভু! শক্তি যে নাই—তুমি শক্তি না দিলে আর ত কেহ দিতে পারে না। শক্তিরূপে তুমিই কর্ম্ম করিয়া দাও আর যেন আমি কখন আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া না ভাবি। প্রতিশ্বাসে যেন জপরূপী তোমাকে স্মরণ করিতে পারি, যেন বুঝিতে পারি তুমিই করিতেছ, যেন বুঝিতে পারি যাহা করিতেছি সমস্তই তোমার শক্তি দ্বারা হইতেছে, আমি কিছুই নই।

তোমার শক্তিতে কর্ম্ম করি, তুমি কর্ত্তা আমি তোমার দাস প্রতি শ্বাসে, প্রতি জপে যেন আমার ইহা মনে থাকে। আমার চেষ্টা তোমার নিষ্পত্তি—এই হউক।

জ্ঞান ও ভক্তির যোগ।

আমি যখন মনকে অঙ্গীকার না করি তখন আমার অবস্থা কি? ব্রহ্ম যখন মায়াকে অঙ্গীকার না করেন তখনকার অবস্থার সহিত কি ইহার তুলনা করা যাইতে পারে?

মন যে নিরন্তর সঙ্কল্প বিকল্প তুলিতেছে ইহা কি আমার অনুমতি লইয়া তুলিতেছে অথবা আমার নিকটে থাকায় ইহার মধ্যে সঙ্কল্প বিকল্প উঠিতেছে? চুম্বক কোন ইচ্ছা প্রকাশ না করিলেও লৌহ ইহার নিকটে আসিলেই ইহা কার্য্য করে। স্ফটিকের কোন ইচ্ছা না থাকিলেও জবা নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র স্ফটিক লোহিতবর্ণ হইতেছে। চুম্বক ও লৌহ উভয়েই জড়। স্ফটিক ও জবা উভয়েই জড়। কিন্তু আমি চেতন আমার মন জড়। ব্রহ্ম চেতন ব্রহ্মের মায়া জড়। মনটা ভাবনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, মায়াও ব্রহ্মের ভাবনা। আমাতেই ভাবনা উঠিতেছে সত্য কিন্তু আমিই যে ভাবনা তাহা নহে। ভাবনা হইতে আমি পৃথক। তবে ভাবনা এত শক্তি ধরে যে আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করিয়া ইহা সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া কার্য্য করিতে পারে।

কিন্তু আমার অস্তিত্ব একবারে লোপ হইবার নহে। ইহা কখন যায়না যাইবেও না। বরং ভাবনা—যাহার প্রতাপ এত অধিক তাহা নষ্ট হয়—অন্ততঃ কতক কতক সময়ের জন্য ইহা নষ্ট হয় কিন্তু আমি কখন নষ্ট হই না।

ভাবনা জড় হইয়াও—আমার তুলনায় নশ্বর হইয়াও ইহা যে আমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে ইহা কিরূপ? ইহাত প্রত্যক্ষ করি ভাবনা খরতর বেগে চলিতেছে—মস্তকে যাতনা হইতেছে, শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইতেছে—আমি যেন নাই। আমরা আত্মবিস্মৃত হইয়া চিৎকার করিতেছি, অশান্ত হইতেছি, নিদারুণ যাতনা অনুভব করিতেছি। কতক্ষণ এই তুফান তুলিয়া ভাবনা আপনিই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কখন কখন আমি দেখি বহু ভাবনা উঠিতেছে সত্য, আবার যখন ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করি তখনও

পারি না কখনও বা পারি। যখন পারি না তখন ভাবনার উৎপাৎ দেখিয়া চুপ করিয়া যাতনা সহ্য করি। সহ্য করিতে করিতে কতক্ষণ পরে ভাবনা শান্ত হইয়া যায়। কখন আমি বল পূর্ব্বক ভাবনা হটাইয়া দিতে পারি। দিবার পরে একটা আনন্দ হয়। এ আনন্দেও যেন আমি আত্মহারা হই। বলি আজ বেশ আছি। কিন্তু এই বেশ থাকার যে আনন্দ ইহাও আত্ম-বিস্মৃতি। কারণ আমি আমার প্রিয়তম পরমাত্মার সহিত নিত্য মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত জানি কিছুতেই আমার হইল না। যে আনন্দে বেশ আছি বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম তাহাও মনের প্রতারণা মাত্র। প্রতারিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। আমি সর্ব্বদা গম্ভীর। যত প্রকার সুখ আছে বা দুঃখ আছে—এমন কি সৎসঙ্গজনিত সুখও আমায় ভুলাইতে পারে না, সমাধিসুখও আমায় ভুলাইতে পারে না; কারণ যাহা অবিচ্ছিন্ন নহে তাহা আমি চাই না। যাহা খণ্ডিত তাহা আমি চাই না। যাহার পরিচ্ছেদ আছে তাহা আমার প্রিয় নহে, সমাধি হইতে যখন বুত্থান আছে তখন সমাধিও আমার প্রিয় নহে। তবে সমাধি যদি আমার আয়ত্তাধীন হয়—যখন ইচ্ছা করিব যে মুহূর্ত্তে ইচ্ছা করিব সেই মুহূর্ত্তেই সমস্ত ভাবনা দূর করিয়া আমার প্রিয়তমের সহিত মিলিতে পারিব—আবার ইচ্ছা হইলে যাহার তাহার সহিত রঙ্গ করিব আমার এ অবস্থা বাঞ্ছনীয় বটে। আমি স্বাধীন যদি হইতে পারি তবেই আমার চির-আনন্দ থাকে। যখন ইচ্ছা করিলাম সমস্ত সঙ্কল্প দূর করিয়া দিয়া, সমস্ত সংসারের খেলা ধূলা সাঙ্গ করিয়া, আমার প্রিয়তমের সহিত মিলিলাম, ইহা যখন আমার ইচ্ছাধীন হয়, এ বিষয়ে বাধা যদি কেহ না দিতে পারে, তবেই আমি আমার প্রকৃত অবস্থায় থাকি। এই অবস্থাই আমি চাই। সংসার থাক, ভাবনা থাক, দেহ থাক, সবই থাক্, আমার কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি স্বাধীন থাকিব। যখন ইচ্ছা এই দেহ পর্য্যন্ত দূর করিয়া ফেলিয়া দিতে পারিব—যখন ইচ্ছা সর্ব্ব লোকে যাইব, কারণ আমার গতি সর্ব্ব স্থানে অক্ষুণ্ণ। এই স্বাধীনতা আমার প্রার্থনীয়।

এই স্বাধীনতা কি লাভ হয়? কিরূপে লাভ হয়? শাস্ত্র মত কার্য্য করিলে কি ইহা পাওয়া যায়? ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া সন্ধ্যা পূজা করিলে হয়? মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যাকালে, সন্ধ্যা অভ্যাস করিলে হয়? কিন্তু সন্ধ্যার কোন ভাবনা যদি আমার মন, আমাকে করিতে না দেয়, অথচ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া খুব জোর করিয়া আবৃত্তি মাত্র করিয়া যাই তাহাতে বিশেষ কিছুই হয় না তাহাত

এত কাল দেখিতেছি। যোগাদি দ্বারা মনের উপর একটা জোর হয় তাহাও দেখিতেছি কিন্তু ইহাও চির দিনের জন্য হয় না। আর ভাবনার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া থাকিতে থাকিতে, যোগাদি না করিয়াও, একটা স্বাধীনতার অবস্থা আনিয়া দেয়, যখন আমি পরমাত্মার কথা যতক্ষণ ইচ্ছা ভাবিতে পারি সন্ধ্যার ভাবনা ভাবিতে পারি তখন যেন কতকটা স্বাধীনতা পাই। কোন্‌টি ভাল—খুব জোর করিয়া যোগ করিয়া কখন সক্ষম কখন অক্ষম চেষ্টা ভাল, না যখন দেখিলাম ভাবনাকে আয়ত্ব করিতে পারিতেছি না তখন সন্ধ্যা পূজা যোগাদি না করিয়া ভাবনার উৎপীড়ন লক্ষ্য করিতে করিতে সমস্ত সহ্য করিয়া ভাবনাকে ক্লান্ত করিয়া পরে আপনার কার্য্য করা ভাল?

যদি দেহ ছাড়িতে হয় কোনটাতে উপকার বেশী হইবে? রোগের যাতনা যখন নিতান্ত প্রবল হইবে তখন সন্ধ্যা করিবে কে? যোগ করিবে কে? কিন্তু সহ্য করাটা যদি অভ্যস্থ হইয়া যায়—ভাবনা যাহা করে করুক আমি স্বাধীন হইতে পারিতেছি না বটে, উহাকে দূর করিতে পারি না বটে—কিন্তু পরাধীন হইয়াও উহার সমস্ত উৎপীড়ন সহ্য করিতেছি—আর নিঃশব্দে সমস্ত দেখিতেছি—মৃত্যুকালে কি ইহা কোন উপকার দিতে পারিবে?

কি উপকার দিবে—যাতনা দিতে দিতে শেষে আমাকে মারিয়া ফেলিবে—আমি যতই কেন করি না আমাকে আত্মবিস্মৃত করিয়া মোহগ্রস্ত করিবেই। মৃত্যুটা মহাবিস্মৃতি—ভারি আত্মবিস্মরণ। বিস্মৃতিই যদি হইল তবে সহ্য করিবে কে?

এক উপায় আছে—ভাবনার যখন উৎপীড়ন হয় তখন সহ্য করিতে করিতে আমার প্রিয়তমকে ফাঁক বুঝিয়া জানান এই অভ্যাসই নিতান্ত আবশ্যক। সমস্ত যাতনা কালে যদি স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বলা যায় 'আমি পারিতেছি না,' তবে জীব সেই সময়ে পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। জ্ঞানের সাধনার সহিত ভক্তির যোগ এই রূপ।

কথাটি পাইলাম দুঃখের দ্রষ্টা থাকিয়া প্রিয়তমকে ডাকা। সন্ধ্যা ক্রিয়া ইত্যাদি শুধু আবৃত্তিতে বিশেষ কিছুই হইবে না। কিন্তু সন্ধ্যার ভাবনা করা আবশ্যক বা সৃষ্টিক্রম স্থিতিক্রম ও সংহারক্রম ভাবনা করা আবশ্যক। এই ভাবনা যখন মনের উৎপীড়নে সম্পন্ন হয় তখন আবৃত্তি বন্ধ করিয়া উৎপীড়ন সহ্য করিতে করিতে প্রিয়তমকে ডাকা কর্ত্তব্য। জ্ঞান ও ভক্তির যোগ এইরূপ।

উৎসব।

ওঁ শ্রী আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২য় বর্ষ] ১৩১৪ সাল, আশ্বিন। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বর্ষায় পথিক।

গগনে ঘন ঘটা নিঝুম রাত ;
চকিত দামিনী ক্ষণ ভায়।
বিজন বন ভুমি অজানা পথ—
পবন স্বনিছে বেদনায়।
নিবিড় তরু শির আঁধারি ঘোর
বরষা নেমে এলো সরোষে।
রজনী সখী তারে ভেটিল যতনে,
কাঁপিল তনু হিম পরশে।
সুধাব কারে আজি গৃহেরি পথ ?
ধূসরে আবৃত বন কায়।
গভীর গরজন গহন সুদূরে
আছাড়ি পড়িছে যাতনায়।
এ ঘোর দুর্দিনে কে আছে বল মোর ?
পথিকে লইবে পরিচয়।

বিহগকুল আজি কুলায়ে লুকায়িত,
প্রকৃতি ভীষণ অভিনয়।
কেহ কি নাহি তবে বিপদ বন্ধু,
প্রবাসী হেন পথিকের ?
মুছাতে অশ্রু, ঘুচাতে যাতনা—
জীবন আশ্রয় অতিথের।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভারতে দুর্গাপূজা

১

বিদ্মহে, ধীমহি, প্রচোদয়াৎ।

পূজার সমস্ত আয়োজন ত ভারত যুড়িয়াই হয়। শুধু মানুষে নয় ভারতের প্রকৃতিতেও। প্রকৃতির পূজা পরে বলা যাইবে অগ্রে মানুষের কথা বলা যাউক।

পূজা এখনও হয়—কোথাও ঘটে পটে, কোথাও মূর্ত্তি গড়িয়া, কোথাও মানসে। হিন্দুর পূজা যথাসাধ্য বিধিমতই হয়, তথাপি হিন্দু বাহিরে, তথাপি হিন্দু আজ ভিতরে ঢুকিতে পারে না। কেন পারে না ? কেন হিন্দু আজ ঠিক ঠিক বিশ্বাস করিতে পারে না দেবতা জীবন্ত, পূজা স্বাভাবিক ?

কেন পারে না ইহাই ত জিজ্ঞাস্য। জগৎ জননীর পূজায় কেন হিন্দু ছুটিয়া আসে না, কেন হিন্দু প্রাণভরা আগ্রহে, জ্বলন্ত উৎসাহে মার জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারে না, কেন হিন্দু বাজে নাচতামসায় খরচ করে বেশী, আর পূজার বেলায় করে বিত্তশাঠ্য ?

পিতা পিতামহের খাতিরে বা তাঁহাদের নাম রক্ষার জন্য বা নিজের নাম ঢোল মারিয়া জাহির করিবার জন্য বা লোক নিন্দা ভয়ে প্রতিমা গড়িয়া পূজা করে—কিম্বা নিতান্ত সাংসারিক বুদ্ধিতে পূজা করে—না করিলে পাছে অমঙ্গল হইয়া যায়—কেন এই জাতি ভয়ে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয় ? দেবতা জীবন্ত ইহাতে সন্দেহ করে কেন ?

দেবতা দেখা দিয়া থাকেন, দেবতা উদ্ধার করেন এই বিশ্বাস গেল কেন ? সুরত রাজা পূজা করিয়া অল্প দিনেই শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, নিজ

রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর মৃত্যুর পরে সূর্য্যদেব হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া সাবর্ণিক মনু হইয়াছিলেন—তুমি আমি পূজা করিয়া কিছুই লাভ করিতে পারি না কেন?

সমাধি বৈশ্যকে দেবী বর দিয়াছিলেন—

বৈশ্যবর্য্যত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ।
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তবজ্ঞানং ভবিষ্যতি॥

বৈশ্য দিব্যজ্ঞান চাহিয়াছিল বৈশ্য তাহাই পাইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে দুর্গার ধ্যান করিতে বলিয়াছিলেন, অর্জ্জুন দুর্গার রূপ ও গুণ কীর্ত্তন করিয়া মনকে দুর্গাজ্ঞানে প্রবুদ্ধ করিয়া ধ্যান করিলেন অর্জ্জুন দুর্গার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলেন। দেবগণ অসুর হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া বহুবার শ্রীমাতেশ্বরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহারা অসুরদিগকেপরাস্ত হইতে দেখেন—ইতিহাসে এই সমস্ত আছে কিন্তু তোমার আমার ভাগ্যে ত দর্শন লাভ হয় না? কেন হয় না ইহাই জিজ্ঞাস্য।

যাহারা হিন্দুর শত্রু তাহারা বলিবেন শাস্ত্র মিথ্যা. শাস্ত্র কল্পনা—মিথ্যা গল্পে পূর্ণ, আর যাহারা শাস্ত্রে শ্রদ্ধা করেন তাহারা বলিবেন শাস্ত্র মিথ্যা নহে শাস্ত্রের ইতিহাস কল্পনা বাক্য নহে, দর্শন জন্য শাস্ত্র যাহা বলিতেছেন তুমি তাহাই কর জগৎ-জননীর সাহায্য তুমি পাইবে।

যাঁহারা অবিশ্বাসী তাঁহাদিগকে বলিবার কিছুই নাই। যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহাদিগকে বলি প্রথমেই বিদ্মহে। প্রথমেই জান জানিলেই ধ্যান হইবে। ধ্যান হইলেই দর্শন হইবে। তুমি স্থূল হইয়া থাকিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তিময়ীর দর্শন করিবে কিরূপে? প্রতি জড়বস্তু হইতে ও যে উর্দ্ধাধঃ-সঞ্চারী শক্তিপুঞ্জ নিরন্তর বাহির হইতেছে ইহা দেখিতে গেলেও তোমাকে কত পরীক্ষা করিতে হয় আর শক্তিময়ীকে দেখিতে যে পরীক্ষা আবশ্যক তাহার কিছুই না করিয়া বলিবে দেবতা নাই—ইহা কি প্রতারকের হাতে পড়া বলিব না?

শাস্ত্র বলেন যাহার পূজা করিবে তাহাকে অগ্রে জান। এই জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান। শাস্ত্রেই ইহা আছে—তুমি তাহাই বিচার করিয়া হৃদয়ে আলোচনা কর।

দুর্গা নামের ভিতরে যে ভাব—দুর্গা নাম যে জন্য তাহাতে পাই—ইনি

দুর্গাসুরকে নাশ করেন—ইনি দুর্গ অর্থাৎ শঙ্কট হইতে ত্রাণ করেন, ইনি মহাবিঘ্ন, মহাভয় ভববন্ধন, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জনন মরণ এই সমস্ত হনন করেন তাই ইঁহার নাম দুর্গা।

দৈত্যনাশার্থ বচনো দকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
উকারে বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মতঃ॥
রেফো রোগঘ্ন বচনে গশ্চ পাপঘ্ন বাচকঃ।
ভয় শত্রুঘ্ন বচনশ্চাকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
স্মৃত্যুক্তি শ্রবণাৎ যস্যা এতে নশ্যন্তিনিশ্চিতং।
ততো দুর্গা হরেঃ শক্তির্হরিনা পরিকীর্ত্তিতা॥

পাওয়া গেল দুর্গা ভগবানের শক্তি। জগত শক্তি হইতেই জন্মিতেছে। শক্তি মধ্যে যে শক্তিতে বিঘ্ন নাশ হয় তাহাই দুর্গা। সকল বিঘ্ন, সকল বিপত্তি নাশ করেন তাই দুর্গা। সকল বিঘ্ন নাশের জন্য দুর্গা পূজা। শ্রীভগবান রামচন্দ্র অকালে এই পূজা করেন—রাবণ বধ জন্য। অন্য দেবতা তখন সমাধি-নিদ্রায় থাকেন তাই অকালে বোধন আবশ্যক হইয়াছিল।

শাস্ত্র বাক্য মিথ্যা নহে, তোমার আমার পূজা হয় না। পূজার পূর্ব্বের কার্য্য ধ্যান—ধ্যানের পূর্ব্ব কার্য্য জ্ঞান, জ্ঞানের পরের কার্য্য প্রার্থনা, আহ্বান, পরে সমাদর পূজা। কোনটি হয়?

পূজা হয় না সত্য নতুবা জাতির দুর্গতি খণ্ডে না কেন? লোকে বলে অন্য জাতি ত পূজা করে না তাহারা ত বেশ আছে। তাহারা বেশ থাকিবে না কেন? যে জাতির যাহাতে অধিকার সে সেই কর্ম্ম করুক বেশ থাকিবে। কুকুরে বা বান্দরে পূজা করে না তা বলিয়া কি তাহারা দুর্ব্বল হইয়া যাইবে—তাহাদের অধিকারের কার্য্য তাহারা করে—করিয়া ভাল থাকে—তোমার অধিকারের কার্য্য তুমি কর, ভাল থাকিবে। না কর কষ্টে পড়িবে।

পূজাতে তোমার অধিকার আছে। করিতে হইবে—তাই আলোচনা কিসে পূজা হয়? কোথায় সেই মেধা ঋষি যিনি এই জাতিকে আবার পূজা করাইবেন?

যাঁহারা ক্ষমতাবান তাঁহারা ঋষির সন্ধানে প্রাণপণ চেষ্টা করুন। আমাদের তত বল নাই তবে যাহা পারি তাহাই করিব। আমরা মায়ের নাম লইয়া—তাঁহার মূর্ত্তি হৃদয়ে যতদূর পারি আনিয়া ঐ মন্ত্ররূপিণী মূর্ত্তিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—মা দুঃখহারিণি! দুরিতনাশিনি। মা সংসারার্ণবতারিণি! বড়

শঙ্কটে পড়িয়াছি মা। তুমি বলিয়া দাও কেন তোমার পূজা হয় না? কি করিলে মা তোমার পূজা হইবে?

এত বড় এই পূজার ব্যাপার এই ব্যাপারেও হিন্দু প্রাণে প্রাণে মাতে—না—ইহাই ত দুঃখ। ইহা এই জন্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর আলোচ্য। পণ্ডিতেরা আলোচনা করেন না কিরূপে জীবন্ত পূজা হইবে? সেই জন্য মূর্খ লেখকে যাহা জানে তাহাই লিখিয়া বসে। আমরা তাঁহার নাম লইয়া যাহা পারি শাস্ত্রালোচনাই করি। আশা রাখি যাঁহারা যথার্থ কথার "চাপরাশ" পাইয়াছেন তাঁহারা যেন দুর্ব্বলকে বল প্রদান করেন।

আর এক কথা বলিতে ইচ্ছা হয়—দুর্গা পূজা ত হয় না সত্য, কিন্তু কোন্ পূজা হয়? প্রণব বড় গুপ্তমন্ত্র। ইহাও ত চিঠির মাথায়, রাস্তার ধারে, মানুষের হাতে বুকে উঠিয়াছে। যেমন "পতিই পরম দেবতা" স্ত্রীলোকের হৃদয় ছাড়িয়া মাথার খোঁপায় উঠিয়াছে প্রণবও সেইরূপ উঠিয়াছেন। কিন্তু এই প্রণব এই গায়ত্রীই ব্রাহ্মণের পরীক্ষা। কে কতদূর ব্রাহ্মণ আছেন তাহার পরীক্ষা যে যতদূর প্রণব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন যে যতদূর সন্ধ্যার ক্রিয়াগুলির সহিত গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা করিয়া তন্ময় হইতে পারেন।

তাই বলিতেছি শুধু সূত্র নিলে কি হইবে? সন্ধ্যাপূজা হওয়া চাই।

পূজার প্রধান সামগ্রী জ্ঞানও ধ্যান। যাঁহাকে জানি তাঁহার ধ্যান হয়। যাঁহার ধ্যান হয় তিনি আমাদিগকে তাঁহার স্থানে আকর্ষণ করেন।

বিদ্মহে ধীমহী প্রচোদয়াৎ—বড় প্রয়োজনীয় এই তিনটি।

দুর্গা কে জান, দুর্গার ধ্যান হইবে। ধ্যান হউক হইলেই মা আমার আকর্ষণ করিবেনই। দেখা দিবেনই—দিয়া আপনার ধামে লইয়া যাইবেন।

মানস ব্যাপারে আর এক বিপত্তি হয়। প্রার্থনা করিয়া, আহ্বান করিয়া আনিয়া পূজা না করিলে কোন্ লোক দুঃখিত না হয়? ৫।৭ ঘণ্টা মানস ব্যাপার দ্বারা যাঁহাকে ডাকিলে; এত যত্ন করিয়া যাঁহাকে আনিলে তাঁহার সমাদর করিলে না তিনি থাকিবেন কেন?

তুমি আমি জানিতে চাই হাত ধরিয়া কি কৈলাসে লইয়া যাইবেন? এত বড় কথা তাঁহার একান্ত ভক্ত বলিতে পারেন। আমরা লোকের বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করিয়া বিশ্বাস করিলেও এতদূর বলিতে পারি না। যাহা অনুভব সীমায় আনিতে পারি তাহাই বলিতে চাই, অন্য কথা বিশ্বাসে রাখি।

তিনি আমাদের বুদ্ধিকে মোক্ষমার্গে লইয়া যান। গীতায় শ্রীভগবানও

ইহা বলিয়াছেন "দদামি বুদ্ধিযোগং তাং যেন মামুপযান্তি তে"। আমি বুদ্ধিকেই আকর্ষণ করি বুদ্ধিকেই প্রেরণ করি। বুদ্ধি যার মোক্ষমার্গে গেল তাহার যাইতে আর রহিল কি?

জিজ্ঞাসা ছিল কিরূপে তাঁহার কাছে যাওয়া যায়? উত্তর ধ্যান করিলে। ধ্যান কিসে হয়? তাঁহাকে জানিলে। তবে প্রথমে জানা চাই—জানিয়া ধ্যান চাই, তবেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে।

আমাদের হৃদয় সন্দেহে ভরা। আমরা জিজ্ঞাসা করি তাঁহার কাছে গেলে কি আমার সকল সুখ ভোগ হইবে? আমার কি সব আকাঙ্ক্ষা মিটিবে?

এ সব কথার উত্তর দেওয়া যায় না। আমরা জানি সংসার বড় ক্লেশের স্থান, মৃত্যু বড় যাতনাময়। জানি সংসারে কোথাও জুড়াইবার স্থান নাই। যাহা সুখ দেয় মনে করি তাহা দুদিনেই ফুরাইয়া যায়। দুদিনের জন্য কোন বস্তু চাই না। এরূপ ভোগ করিতে প্রাণ চায় না। যদি বিশেষরূপে জানিতে পারি এই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, টাকা, বাড়ী, গাড়ী, বাগান—এই অর্থোপার্জ্জন—এক কথায় এই কামিনী কাঞ্চন দুদিনের জন্য—যদি কেহ প্রাণে প্রাণে ইহা বুঝিতে পারেন, এত পরিশ্রম যাহার জন্য করি সে দুদিন পরেই অন্যের হইবে, আমার কাছে থাকিবে না—যিনি ইহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন—এই স্ত্রী মরিয়া অন্যের হইবে, এই পুত্র মরিয়া অপরের হইবে, এই ধন আবার অন্যে ভোগ করিবে—তবে তিনি কখনই এই নশ্বর বস্তু লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না।

কিন্তু লোকে এত অন্ধ যে ইহা মনে আনিতে চায় না। ভগবান তথাপি লোককে বুঝাইয়া দিতেছেন। ধনী দরিদ্র হইতেছে- তাঁহার কত সখের কত সাধের গাড়ী, ঘোড়া, রাজ্য রাজতক্তা অন্যের হইতেছে—ইহা দেখিলে প্রাণ কেমন অস্থির হয়—তাহা যাহার হইতেছে সেই বুঝিতেছে, অন্যে দেখিয়া শিখিতে পারে না।

এই পৃথিবীতেই ত দেখা যায় যাহা এক দিন আমার ছিল তাহা আজ অন্যের হইয়াছে। আমরা একটু দেখিলেই বুঝিতে পারি যে এই স্ত্রী, এই ধন অন্যের হইয়া যাইবে—কিন্তু অত্যাসক্তি বশতঃ মনকে পাকে প্রকারে বুঝাইয়া দি যে স্ত্রী মরিলেও আমার থাকিবে। মিথ্যা কথা। এক মাত্র সতী স্ত্রী বলিতে পারেন তাঁহার স্বামী চির দিন তাঁহার থাকিবে। নতুবা বিধবার যে কালে বিবাহ হয় সে কালেত এই জন্মেই এক জনের বড় আদরের স্ত্রী

আবার অন্যকে আদর করে, অন্যের আদর নেয়। তবে মরিলেও যে কামিনী কাঞ্চন নিজের থাকিবে ইহা যে বিশ্বাস করিতে চায় সে বড়ই মোহগ্রস্ত। কিন্তু যিনি জানিতেছেন এসব কিছুই থাকিবে না—ইহারা আমার সঙ্গে যাইবে না যিনি প্রাণের অন্তস্তলে ইহা আনিতে পারিয়াছেন তিনি ব্যবহারিক কার্য্য ঠিক করিয়াও ভিতরে এই প্রশ্ন করিবেন তবে আমার কে আছে? কে আমার আপনার? কে আমার সঙ্গে যাইবে?

যে আমার জননে মরণে সখা, যে আমায় শ্মশানে রাজদ্বারে দেখা দেয়, যে আমার বিপদে সম্পদে হাত ধরে, যে আমার কষ্ট দেখিলে সহিতে পারে না, যে আমায় সুখী দেখিলে আনন্দ করে, যে আমার সর্ব্বদা ভাল, সেই আমার আপনার—সেই আমার পিতা, মাতা, ভাই, সখা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা একাধারে সব। সেই আমার আছে—তারে ছাড়িয়া আর যাহাকে আমার আমার বলি তাহারা আমার নয়। আমিও তাহাদের নয়। তবুও যে বলি সে কেবল ভুলে। ইহারা বেশধারী অথচ এমনই মোহ যে ভাল করিয়া বুঝি না ইহারা বেশধারী কিরূপে?

যে দুর্গাকে পূজা করিতে চাই সেই দুর্গা আমার আপনার। একি কল্পনার কথা বলিলাম? দুর্গাকে যিনি জানিয়াছেন তিনিই বলেন এই দুর্গাই ব্রহ্ম, এই দুর্গাই প্রণব, এই দুর্গাই মহাশক্তি, ইহা কল্পনা নহে, ইহা সত্য। এই দুর্গাই বরণীয় ভর্গ। এই দুর্গাই সাকার নিরাকার। এই দুর্গাই সতী, সীতা, রাধা লক্ষ্মী সরস্বতা মহাকালী, মহাকাল, রাম, কৃষ্ণ, শিব ব্রহ্মা—যেখানে যত শক্তি আছে সমস্তই ইনি।

বহ্নৌ সা দাহিকা শক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে।
শোভা শক্তিঃ পূর্ণ চন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা॥
শস্যপ্রসূতি শক্তিশ্চ ধারণা চ ধরাসু সা।
ব্রাহ্মণ্যশক্তি বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ সুরেষু সা॥
তপস্বিনাং তপস্যা সা গৃহিণাং গৃহদেবতা।
মুক্তিশক্তিশ্চ মুক্তানাং মায়া সাংসারিকস্য সা॥
মদ্ভক্তানাং ভক্তিশক্তির্ময়ি ভক্তিপ্রদা সদা।
নৃপাণাং রাজ্যলক্ষ্মীশ্চ বণিজাং লভ্যরূপিণী॥

ইত্যাদি। শক্তিই পূজার বস্তু নহে। এই শক্তি যে শক্তিমানের, যে শক্তিমান ও শক্তি জড়িত হইয়া জগতে খেলা করিতেছেন তাঁহার পূজাই করি।

এস এস যদি দুঃখ দূর করিতে চাও, যদি ভারতে আবার অসুরনাশিনীর হাসি ভরা মুখ দেখিতে চাও, যদি সত্য সত্যই মাকে আবার ভারতে আনিতে চাও, তবে আর একবার 'বিদ্মহে ধীমহি প্রচোদয়াৎ' অভ্যাস কর। নিশ্চয়ই মা আসিবেন।

যাঁহাকে প্রতীকে উপাসনা করিয়া সুখ পাও, যে স্বদেশ ও পরদেশকে দুর্গা না বলিলে উপাসনা করিতে পার না—যে স্বদেশের ও পরদেশের উপর দুর্গার ভাব আরোপ করিয়া বল

ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরং

যে স্বদেশকে ও পরদেশকে দুর্গার ভাবে ভাবিত করিয়া বল :—

অনন্ত কোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে

যে দুর্গা সত্য সত্যই স্বদেশ ও পরদেশ, যিনি সত্য সত্যই সহস্রশীর্ষা, সহস্রহস্তা, যে স্বদেশকে ও পরদেশকে দুর্গা ভাবে জীবন্ত করিয়া বলিতে হয় মা তুমিই আমার ঈশ্বরী

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িণী
নমামি ত্বাং—নমামি মাতরং

বলিতেছিলাম যাঁহার প্রতীকোপাসনায় এত সুখ—এস এস একবার তাঁহাকে সাক্ষাতে উপাসনা কর। ঋষিগণ এই উপাসনা শিখাইয়াছেন, রাজগণ এই উপাসনা করিতেন—তুমি আমি করি এস—আমাদের সকল ভয় দূর হইবে—সকল বিপদের শান্তি হইবে।

বলিতেছি যদি জীবন্ত দেবতার পূজা চাও তবে প্রথমে দেবতাকে জান। দেবতাকে জানিয়া নিত্য একান্তে বসিয়া সাধনা দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে সজাগ রাখিতে অভ্যাস কর। (এই সাধনা জন্যই শ্রুতি জানাইতেছেন তিনি কে? বলিতেছেন :—

সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ। কাঽসি ত্বং মহাদেবী? সাঽব্রবীদহং ব্রহ্মস্বরূপিণী। মত্তঃ প্রকৃতি পুরুষাঽঽত্মকং জগচ্ছূন্যং চাঽ শূন্যং চ। অহমানন্দানাঽঽনন্দাঃ। বিজ্ঞানাঽ বিজ্ঞানেঽহম্। ব্রহ্মাঽব্রহ্মণী বেদিতব্যে ইত্যাহাঽথর্ব্বণী শ্রুতিঃ॥

ভাবার্থ এই—দেবতাগণ দেবীর নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মহাদেবি! আপনি কে? দেবী বলিলেন আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী, আমা হইতেই প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ, শূন্য অশূন্য উঠিয়াছে। আমি আনন্দস্বরূপিণী—অনানন্দস্বরূপিনী। আমি বিজ্ঞান—অবিজ্ঞান, আমিই ব্রহ্ম অমিই অব্রহ্ম। অথর্ব্ব শ্রুতি ইহাই বলেন।)

যাঁহার ধ্যান করিতে হইবে তাঁহার স্বরূপ জানা আবশ্যক। জানা না হইলে ধ্যান হয় না। ধ্যান না হইলে দেবীর নিকটে যাওয়া হইবে না। দেবীর আগমন হইবে না।

বশিষ্টদেব বলেন

পূজনং ধ্যানমেবান্তনান্য দস্তস্য পূজনং।
তস্মাৎ ত্রিভুবনাধারং নিত্য ধ্যানেন পূজয়েৎ" ॥

অন্তরে ধ্যান করাই এই দেবের (আত্ম দেবের) পূজা। ইহা ব্যতীত ইঁহার পূজার অন্য ক্রম নাই। আর ত্রিভুবনের আধার এই দেবীকে সর্ব্বদা ধ্যান দ্বারা পূজা করিবে।

বাহ্য পূজার পূর্ব্বে মানস পূজা আবশ্যক। বিনা মানসপূজায় কোন পূজা সিদ্ধ হয় না। ধ্যানের জন্যই জ্ঞান আবশ্যক। সেই জন্য শ্রুতি মহাদেবীকে দেখাইতেছেন। এস এস একবার চিন্তা কর নিরাকার সাকার যাহা কিছু সমস্তই এই মহাদেবী। অহং পঞ্চ ভূতান্যপঞ্চভূতানি। অহং অখিলং জগৎ। বেদ অবেদ বিদ্যা অবিদ্যা—অজা অনজা—অধ উর্দ্ধ তীর্য্যক্ রুদ্র বসু আদিত্য বিশ্বদেব মিত্রাবরুণ ইন্দ্র অগ্নি অশ্বিনীকুমারদ্বয় যাহা কিছু জগতে মঙ্গল আছে এক আমিই তাহা ধরিয়া ধরিয়া রহিয়াছি।

(যে অনন্ত শক্তির উপরে এই জগৎ দণ্ডায়মান্, যে চিৎ শক্তি—যে অনুভব শক্তি—সকল বস্তুর অস্তিত্ব, যিনি না থাকিলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না, তিনিই এই মহাদেবী। যিনি মূর্ত্তি ধারণ করেন, যিনি অমূর্ত্ত—এই দেহ যিনি; মন যিনি, মনের সঙ্কল্প বিকল্প যিনি, লয় বিক্ষেপ যিনি, যিনি সকলে আছেন—যাঁহাকে লইয়াই সকল তিনিই এই মহাদেবী। শ্রীমাতেশ্বরীকে জানিয়া তখন দেবতাগণ বলিলেন।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাস্মতাম্ ॥

দেবগণ পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন—

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণ মহং প্রপদ্যে সুতরাং নাশয়তে তমঃ ॥

কে এই মহাদেবী?—এই বিশ্বরূপ যাঁহার—যিনি বৈষ্ণবী, যিনি স্কন্দমাতা, যিনি সরস্বতী, যিনি অদিতি, যিনি দক্ষদুহিতা, যিনি শিবা, যিনি মহালক্ষ্মী যিনি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা—এস এস তাঁহাকে জান, তাঁহাকে প্রণাম কর। এস এস এই বিশ্ব মাতাই স্বর্গে মর্ত্তে। এই বিশ্বমাতাই আত্ম শক্তি। এষাহত্মশক্তিঃ।)

এষা বিশ্বমোহিনী পাশাঙ্কুশ ধনুর্ব্বাণ ধরা। এষা শ্রীমহাবিদ্যা। যিনি ইঁহাকে জানেন তিনিই শোক হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

য এবং বেদ স শোকং তরতি। এস এস ইঁহাকে নমস্কার কর— বল—নমস্তে অস্তু ভগবতি মাতর স্মামপাতু সর্ব্বতঃ। বল মা তোমাকে নমস্কার করিতেছি মা আমাকে সর্ব্বত পালন কর। অষ্টবসু একাদশ রুদ্র দ্বাদশ আদিত্য তুমিই। অসুর হইতে, পিশাচ হইতে আমাদের রক্ষা কর। তুমিই সত্ত্বরজস্তম। তুমিই প্রজাপতি, ইন্দ্র মনু; তুমিই গ্রহ নক্ষত্র জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, তুমিই কলাকাষ্ঠাদি কালরূপিণী তোমাকে আমি নিত্য প্রণাম করি। তামহং প্রণৌমি নিত্যম্।

তাপাপহারিণীং দেবীং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনীম্
অনন্তাং বিজয়াং শুদ্ধাং শরণ্যাং শিবদাং শিবাম্।

এস এস এই আকাশরূপিণী বীতিহোত্রসমন্বিতা অর্দ্ধেন্দুলসিতা দেবীকে সর্ব্বার্থসিদ্ধি জন্য বীজ মন্ত্র দিয়া উপাসনা কর। এস এস ইহাঁকে জানিয়া ধ্যান কর। এস এস আনন্দময়ী, জ্ঞানময়ী, বাঙ্ময়ী, সূর্য্যচন্দ্রস্বরূপিণী আদিত্য পথ-গামিনীকে হৃদ পুণ্ডরীকে ধ্যান কর।

হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থাং প্রাতসূর্য্যসমপ্রভাম্
পাশাঙ্কুশধরাং সৌম্যাং বরদভয়হস্তকাম্।
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং ভক্ত কাম দুঘাং ভজে।
নমামি ত্বামহং দেবীং মহাভয়বিনাশিনীম্।

বড় ভয় উপস্থিত হইয়াছে—এস এস এই মহাভয়বিনাশিনীকে হৃদয়ে ধারণ কর—ধারণ করিয়া নির্ভয় হইয়া যাও। শ্মশানে মশানে তোমার কোথাও ভয় থাকিবে না। মায়ের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। ব্রহ্মাঽঽদয়ো ন জানন্তি— ব্রহ্মাদি ইঁহার স্বরূপ জানেন না। ইঁহার অন্ত নাই তাই অনন্ত—ইঁহাকে গ্রহণ করা যায় না তাই অলক্ষ্যা—ইঁহার জন্ম উপলব্ধি করা যায় না তাই অজা, তিনি একাই সর্ব্বত্র আছেন তাই তিনি একা—

অতএবোচ্যতেঽজ্ঞেয়াঽনন্তাঽলক্ষ্যাঽজৈকানেকেতি॥

মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী তুমি, শব্দের জ্ঞানরূপিণী তুমি। তুমি চিন্ময়ী, চিণ্ময়াতীতা— শূন্যের ও শূন্যসাক্ষিণী তোমা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। তুমি দুর্গা তুমি দুর্গমা, তুমি দুরাচার বিঘাতিনী মা! আমরা ভবভীত হইয়াছি—সংসারার্ণব তারিণী আমরা তোমায় নমস্কার করিতেছি।

নমামি ভবভীতোঽহং সংসারার্ণবতারিণীম্ বেদ এই ভাবে "বিদ্মহে" অর্থ জানাইতেছেন। পূজার প্রথমেই অগ্রে তাঁহার নিরাকার সাকার রূপ চিন্তা কর, নিত্য কর, করিয়া ধ্যান কর—নিশ্চয়ই তিনি আসিবেন নিশ্চয়ই হৃদয়ে উদয় হইবেন।

শ্রুতি, পুরাণ, তন্ত্র যাহা শিক্ষা দিলেন তাহাই সত্য। শাস্ত্র সত্য বলিয়াছেন। তুমি করিয়া দেখ, সত্য কথা বুঝিতে ক্লেশ নাই।

তবে এস ভারত—একবার দুর্গা পূজা বুঝিয়া দুর্গা পূজা কর।

শ্রুতি বলেন "উভে প্রাজাপত্যা" দেবতা ও যাঁর সন্তান অসুরও তাঁরই সন্তান। এই দুর্গা আপন সন্তানঃকে যে আপনি বিনাশ করিতেছেন সন্তান দুষ্ট হইলে বিনাশ ও করিতে হইবে। তুমি যে পারনা—তুমি জাননা তাই।

আরও একটু উপরে উঠিলে দেখিবে আপনি আপনাকে লইয়া খেলা ভিন্ন জগতে কিছুই হইতেছে না।

যে দুর্গাকে জগৎ বলিতেছ, জগৎ প্রসবিত্রী বলিতেছ, জগদাতীত বলিতেছ—যিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই, তিনিই মূর্ত্তি ধরিয়া আপনার এক অংশকে, আপনার আর এক অংশ দিয়া দলিত করিতেছেন। দেবতার জন্য অসুর বিনাশ করিতেছেন। আর দেবতাদিগের বিলাসিতা, দেবতাদিগের আলস্য হইলে অসুরকে বর দিয়া বাড়াইয়া দিতেছেন এইত বরাবর চলিতেছে, তত্ত্ব দৃষ্টিতে বলিবার ভাবিবার অনেক থাকে। সব কথা বলা যায় না। বলিতে পারা ও যায় না।

কথা ছাড়িয়া কাজে আসাই উচিত। পূজা সম্মুখে। অবসরও আসিবে। একটু ভাল করিয়া মাকে জানিয়া মাকে ডাকিতে অভ্যাস করিয়া রাখিলে কি মন্দ হইবে? করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

যখন ঐ প্রাণভরা মূর্ত্তি—ঐ দশ হস্তে দশপ্রহরণধারিণী, চণ্ডমুণ্ড মর্দ্দিনী, রক্তবীজাশনি, মহিষাসুরমর্দ্দিনী রম্য কপর্দ্দিনী—যখন ঐ মাঠিতে গড়া মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে—যখন মার সেই মূর্ত্তির পানে চাহিয়া চাহিয়া পূজক দেবমন্ত্রে মাকে ডাকিবে—যখন বেদমন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে—যখন চারি দিকে সমস্তই শুদ্ধ, সমস্তই নির্ম্মল, সমস্তই পবিত্র বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সাধক কাতর প্রাণে মাকে আসিতে বলিবে—তখন—তোমার প্রাণে যদি মা আসিতে পারেন তবে ঐ ধূপ ধূনা গুগুল গন্ধে সুগন্ধীকৃত মণ্ডপস্থিত পবিত্র মূর্ত্তিতে মা না আসিবেন কেন?

জগৎ যদি একটা ভুল শিক্ষা দিয়া থাকে তবে কি আপনার বস্তু না দেখিয়া—লোকের বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া বাহিরের জাঁক জমক দেখিয়া, বাহিরের স্বাধীনতা দেখিয়া, বাহিরের সুখ দেখিয়া তাহাদের অনুকরণে ছুটিয়া যাইতে হইবে? আর বলিতে হইবে—বেদে যে কালী দুর্গার নাম আছে তাহা প্রক্ষিপ্ত। গীতা প্রক্ষিপ্ত, বেদ প্রক্ষিপ্ত, যোগবাশিষ্ট প্রক্ষিপ্ত, অধ্যাত্ম রামায়ণ প্রক্ষিপ্ত, ভাগবত প্রক্ষিপ্ত, পুরাণ প্রক্ষিপ্ত, তন্ত্র প্রক্ষিপ্ত—কেই বা এত প্রক্ষেপ করিল আর যাহা প্রক্ষেপ করিল তাহাই বা এত সুন্দর কিরূপে হইল? গীতা কি মহাভারত হইতে নিকৃষ্ট? না অধ্যাত্মরামায়ণ লিখিবার শক্তি অন্য কোন ব্যক্তির আছে? অথবা যোগবাশিষ্ঠ লেখার কথা দূরে থাক্—আজ কাল কার কোন পণ্ডিতের যোগবাশিষ্ট বুঝিবার শক্তি আছে—যোগ বাশিষ্ঠের সত্য উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য আছে—না যোগবাশিষ্ঠ যে সাধনা করিতে বলিতেছেন তাহাতে পৌঁছিবার সামর্থ্য আছে? তবে তুমি যেই হওয়া কেন তুমি প্রক্ষিপ্ত বলিলে লোকে শুনিবে কেন? তুমি কয় দিন সত্য কথা ঢাকিয়া রাখিবে বল? তোমরাই ত সাহেবদের সব সত্য বলিয়া

আপনাদের শাস্ত্র আপনাদের ধর্ম্ম আপনাদের আচার ব্যবহারকে পদ দলিত করিতে ছুটিয়া ছিলে? এখনও দুই চারি স্থানে একটু আধটু অনুকরণ চলিতেছে—অনুকরণ কয় দিন থাকিবে? দেবতাকে আসুর ভাব কত দিন মোহিত করিয়া রাখিতে পারে?

তাই বলি সময় আসিয়াছে একবার দেখা উচিত—একবার করা উচিত।

এস এস কি করিতে হইবে একবার আলোচনা কর—করিয়া কাজ কর। অভ্যাস কর। পূজার সময় সত্য সত্যই অপূর্ব্ব দেখা যাইবে। মূর্ত্তি বড় সুন্দর লাগিবে। ঐ মূর্ত্তিই যে সান্ত অনন্ত এক সঙ্গে, বুঝা যাইবে।

এই দেখ শরত কাল আবার আসিল। দিক নির্ম্মল হইল, নদী তড়াগের জল প্রসন্ন হইল। শেফালিকা ফুটিল—পদ্ম ভাসিল বড় সুন্দর হইল। প্রকৃতিও পূজা করিতে ছুটিল। পূজা স্বাভাবিক দেখ। বলিতেছি শরৎ কাল "আবার" আসিল। এই "আবার" কথার মধ্যে কতকি যেন রহিয়া গেল। কত স্মৃতি যেন এই কাল বহন করিয়া আনিল। 'আরত আমায় আবদার করিয়া কেহ কিছু চাহিবে না' "এইত সবাই চায়" "এইত সবাই তেমনি সাজে সাজিয়া বাহির হইল"—মা আগমন কালে মা কাহারও প্রাণে আবেগ ঢালিয়া দিলেন—কেহবা সুখের কল্পনা করিল। থাক্ এ কথা আর বলা গেল না।

যে কাঁদে কাঁদুক, যে হাসে হাসুক শরৎ কাল তেমনি সাজিয়াই আসিল।

আকাশ সর্ব্বাগ্রে শোভা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল। দিনের বেলা ঘন নীল আকাশ—তার তলে অতি শুভ্র তুলার পর্ব্বত। কিছু দিন পূর্ব্বে বর্ষায় ধূসর বর্ণের জল ভরা মেঘ আকাশে আকাশে শব্দ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইত। আরও পূর্ব্বে গ্রীষ্মকালে শুধুই নীল আকাশ ছিল। মেঘের ক্বচিৎ আবির্ভাব তিরোভাব হইত।

সমস্ত গ্রীষ্ম বর্ষা ধরিয়া প্রকৃতি কি করিয়াছিল? একথা আজ আমরা জোর করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি। এ শুধু কবির কল্পনা নহে। এত দিন আমরা যাহাকে জীবন্ত বলিয়া উপাসনা করি—যে জলের কাছে আমরা প্রার্থনা করি, যে আদিত্য পুরুষকে আমরা ত্রিসন্ধ্যায় অর্ঘ্য দিয়া থাকি, যে আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী কুমারী যুবতা বৃদ্ধা মূর্ত্তিকে আমরা ধ্যান ধারণায় আনিতে চেষ্টা করি, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আমরা মৃত্যু সংসার-সাগর পার হইতে চাই—এত দিন শত চীৎকার করিয়াও ঋষিদিগের সত্য কথা ঋষি বংশধরেরা গ্রহণ করে নাই। আজ এতকাল পরে স্থূলদর্শী জগতের চক্ষু খুলিতেছে। জগৎ আর কিছুই জড় বলিতে প্রস্তুত নহে। আমাদের শ্রী জগদীশ বসু দীর্ঘায়ু হউন। তাঁহার পরীক্ষালব্ধ সত্য কথায় জড় বিজ্ঞান চেতন বিজ্ঞানে আসিতে পারিলেও পারিতে পারিবে। ইয়ুরোপ কি হইবে বলা যায় না; আমাদের ঘরের বালক বালিকা ঋষিদিগের বাক্যে অশ্রদ্ধা করিবে না। নাস্তিকদিগের সাজান কথায় প্রত্যয় করিবে না। জল বায়ু আকাশ পৃথিবী অগ্নি—সবাই চেতন। সকলের মধ্যে প্রাণ আছে। আরও

একটু স্বীকার করিলে দেখিবে সকলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছেন। এক মহাশক্তিমান পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্য প্রপ্রঞ্চে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে ধরিয়া রহিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধরিয়াছেন। প্রকৃতিতেও পূজা হয়। আপনাকে আপনি পূজা। স্বয়মন্য-"মিবোহল্লসন্"। মোটামুটি জানা হইল। প্রত্যহ ইহার চিন্তা চাই। চিন্তা করাই সাধনা। তবে শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া চিন্তা করায় কোন লাভ নাই। তাই সাধনার সঙ্গে "ভাবনা" আবশ্যক। যেরূপ অভ্যাস চলিবে তজ্জন্য যাহা আবশ্যক তাহাও আলোচনা করা যাউক।

শেষ রাত্রিতে উঠিতে অভ্যাস করা চাই। পূজার স্থান পৃথক থাকা চাই। বিছানায় বসিয়া হয় না। বাহিরে ভিতরে শুচি চাই। শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান চাই। হস্ত মুখ ধৌত করা চাই। নতুবা আলস্য জড়াইয়া থাকিবে। সব করা যায় আর জগত জননীকে ডাকিবার জন্য একটু পবিত্র স্থান কি রাখা যায় না? যায়—করিয়া লইলেই হয়। যাহাদের এতটুকুও হয় না— তাহাদের চেষ্টা নাই। বাড়ীর সকলের যদি এক ইচ্ছা হয় তবে সহজেই হয়। যেখানে হয় না সে সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। যাহাদের সঙ্গে হয় সেই সঙ্গ করা উচিত। সকল সাধু কার্য্যে "মরিয়া" হইতে হয়। মৃত্যুত নাই— তবে লোকের হাস্য বিদ্রূপে সাধু পথও ত্যাগ করিতে যাহারা প্রস্তুত তাহারাই কাপুরুষ, তাহারাই আত্মপ্রবঞ্চক, দেশের কণ্ঠক। ইহারাই স্বার্থের জন্য স্বদেশকে, স্বমাতাকে অন্যের ক্রোড়ে তুলিয়া দিতে পারে। বল চাই—সাধু কার্য্যে বল আবশ্যক। সত্যের জন্য প্রাণ দাও, স্বর্গ আছেই।

আসনে স্থির ভাবে উপবেশন করিয়া একবার দুর্গাকে চিন্তা করিয়া লও। চক্ষু নিমীলিত কর—অন্ধকার ঠেকিবে। ইহাও দুর্গা—যে মন চঞ্চল হইতেছে, যে শরীর অসুখ বোধ করিতেছে এই শরীরাভ্যন্তরবর্ত্তী প্রতি জীবানু, এই শ্বাস প্রশ্বাস এই আলস্য অনিচ্ছা এই আকাশ বায়ু জল আসন মৃত্তিকা—যাহা আছে, যাহা দেখিতেছি যাহা ভাবিতেছি—সে ভিন্ন কিছুই নাই। যাহা মনে আসিতেছে—বৃক্ষলতা মানুষ পশু চন্দ্র নক্ষত্র আকাশ সূর্য্য আলস্য অনিচ্ছা যুদ্ধ বিগ্রহ দেবতা অসুর যাহা আছে সমস্তই সে। এই মন। মনও সে। তাহার সত্তায় আমার আমি টুকু হারাইয়া গিয়াছে। কে কাহার পূজা করিবে? তথাপি পূজা করিতে হইবে—ডাকিতে হইবে। মা আমার আপনিই দেবতা আপনিই মন্ত্র আপনিই সাধক। আপনিই পারিতেছেন আপনিই পারিতেছেন না—সুখ দুঃখ—কিছুই নাই—পারিলেও নাই না—পারিলেও নাই—সর্ব্বদা আনন্দ।

এই আনন্দে কর্ম্ম করিয়া যাও হউক না হউক এ কথা এখানে নাই। ফল কামনা এখানে নাই—একটুতেই সুখ একটুতেই দুঃখ এখানে নাই— আপন ভাবেও থাকা হইল—কর্ম্মও চলিল। বড় সুখের অবস্থা ইহা। আলস্য অনিচ্ছা জড়তা চিন্তা অচিন্তা সব মিলিয়া এক অপূর্ব্ব সুখের অবস্থা আনিয়া দিল। সন্ধ্যাবন্দনা বড় সুখের হইয়া গেল—শরীর যেমন থাকে

কিছুই ক্ষতি হইল না—ভাল নাই মন্দ নাই, এ কথা আর অসিল না—জপ পূজা বেশ চলিল। মূর্ত্তি বেশ করিয়া আসিল। ধ্যান বেশ চলিল। ধ্যান করিতে করিতে মূর্ত্তি ছাড়িয়া ভূর্ভুব স্ব ব্যাপী কি এক সীমা শূন্য শক্তির চিন্তা আসিল—শুধু শক্তি নহে—যাঁহার এই শক্তি যাঁহার এই বরণীয় ভর্গ যেন সেই বরণীয় ভর্গের উপর মন চড়িয়া বসিল।

সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইবা মাত্র সমুদ্রের ভিতর হইতে এক সুন্দর পদ্ম ভাসিয়া উঠিল—সেই পদ্মের উপর বসিবা মাত্র তীরের দিক হইতে সুন্দর তরঙ্গ মনোহর পদ্মকে সমুদ্র মধ্যে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। তরঙ্গে তরঙ্গে হেলিতে দুলিতে সুধা সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী মণিদ্বীপে পৌঁছাইয়া দিল। সেখানে সুন্দর সুন্দর সাধকের সহিত বসিয়া অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ভাবে পূজা হইল। সবই সে—সবই তার খেলা—আমিও সে—তবুও যেন সেবা করা হইতেছে। অদ্বৈত হইয়াও দ্বৈতভাবে জপ পূজা ব্যবহার চলিল। ক্রমে শান্ত অবস্থায় ধ্যান করিতে পারা গেল—সাকার নিরাকার যাহার যাহা রুচি-মূর্ত্তিতে ভাবেতে যতক্ষণ ইচ্ছা থাকা গেল। জপ পূজা সাঙ্গে এইরূপ ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতে ভিতরে বাহিরে, একাকি বা লোক সঙ্গে সেই একই বহু হইয়া আপনার সহিত আপনি রঙ্গ করিতেছে এই ভাব আসিবে। অস্থায়ী বিষয়ে, ক্ষণ স্থায়ী সাংসারিক ভাবে আস্থা থাকিবে না—তথাপি সাংসারের কর্ম্ম চলিবে মুক্তির দিকেও অগ্রসর হওয়া যাইবে। নিত্য কর্ম্ম এই ভাবে অভ্যস্ত হউক শাস্ত্র বিধি লঙ্ঘন না করিয়া সন্ধ্যা পূজা জানিয়া—তাহাকে জানিয়া তাহার ধ্যান অভ্যাস হইতে থাকুক। পূজার শুভ মুহূর্ত্ত আসিতে বিলম্ব নাই তখন ভাল করিয়া পূজা হইয়া যাইবে।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিতেছিলাম তাহা সক্ষেপতঃ এই—

"দেবে পরিচয়ো নাস্তি বদপুজাকথম্ভবেৎ"

যাহার সহিত পরিচয় নাই তাহার পূজা হয় কিরূপে? পরিচয় কোথাও শুনিয়া কোথাও দেখিয়া।

শুনিয়া যে পূজা তাহা বিশ্বাসে। দেখিয়া যে পূজা তাহা ভক্তিতে। হিন্দু, দেখিয়া—পরিচয় করিয়া, পূজা করেন। তাই মূর্ত্তির এত আদর।

যাঁহার মূর্ত্তি নাই, তাঁহার মূর্ত্তি তুমি গঠন কর কিরূপে? ভুল কথা তাঁহার মূর্ত্তি মানুষে গড়ে না। তিনি আপনি মূর্ত্তি ধারণ করেন—ভক্তের জন্য। "ভক্ত চিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবান্ অজঃ" যিনি অজ—যাঁহার জন্ম নাই—তিনি ভক্তের চিত্ততৃপ্তির জন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করেন। মূর্ত্তি না দেখিয়া বিশ্বাসী এক ভাবে চলে—সংসার করাই ইহাদের মুখ্য কথা, বিশ্বাস রাখিয়া একটু পবিত্র ভাবে সংসার করিয়াই যায়। বিশ্বাসী এই পর্য্যন্ত করে। ইহাদের নিরাকার হইলেও চলে। কিন্তু ভক্তের নিরাকারে চলে না। ভক্ত যাহার জন্য তুচ্ছ সংসার তুচ্ছ করে—যাহার জন্য সমস্ত ভোগেচ্ছা বিসর্জ্জন দেয় তাহাকে সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া ধরিতে চায়। সে কেমন দেখিতে—সে কত সুন্দর, সে কেমন কথা কয় ইহা না হইলে ভক্তের চলে না। তাই

শ্রীভগবান ভক্তচিত্তে উদয় হয়েন। বাহিরে প্রকট হইয়া কথা কহেন। ক্রীড়া করেন। অনন্ত শক্তি অনন্ত থাকিয়াও সান্ত মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া ভক্তের মানসরঞ্জন করেন। মূর্ত্তি মানুষের কল্পনা নহে। সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্ম রূপ কল্পনা। এ কল্পনা কে করে? লোকে ভুল বুঝিয়া বলে মানুষ ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করে। বড় ভুল কথা। ব্রহ্মই আপন রূপ কল্পনা করেন। কপ সামর্থ্যে। যিনি সর্ব্বশক্তিমান তাঁহার কি একটা মূর্ত্তি ধরিবার সামর্থ্যও নাই? তুমি প্রিয়ের মনোরঞ্জনের জন্য কত সাজিয়া গুজিয়া দেখা দাও আর তিনি? যে তাঁহার জন্য মরিয়া যাইতেছে তাহাকে তাহার মনোমত ভাবে দেখা দিতে পারেন না? এতটুকু শক্তি ও যে ঈশ্বরের নাই সে ঈশ্বরকে আবার পূজা করে কে? সে নিরাকার কি আবার ঈশ্বর—না একটা ফাঁকা কল্পনা—একটা ফাঁকা বানান কথা?

এস এস এই কুবুদ্ধি, এই মোহের কথা ছাড়িয়া আজ পূজার দিনে পূজা করি এস। জ্ঞান ধ্যান ও পূজা হউক। ইহাতে তাঁহাকে সন্তোষ করা যাইবে। তাঁহার সন্তোষই প্রার্থনা। তন্ত্র তাই বলেন—

দুর্গা দুর্গেতি দুর্গেতি দুর্গা নাম পরং মনুম্।
যো জপেৎ সততং চণ্ডীং জীবন্মুক্তঃ স মানবঃ॥
মহোৎপাতে মহারোগে মহাবিপদি সঙ্কটে।
মহাদুঃখে মহাশোকে মহাভয় সমুত্থিতে॥
যঃ স্মরেৎ সততং দুর্গাং জপেৎ যঃ পরমং মনুম্।
সজীব লোকে দেবেশি নীলকণ্ঠত্ব মাপ্নুয়াৎ॥

আজ বড় শুভ দিন। এস এস মার পুত্র কন্যা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "আমি ভাল" "আমি বুদ্ধিমান" "আমি চরিত্রবান" আর "সেই চরিত্র হীন" এই সমস্ত বিরোধ বাক্য ত্যাগ করিয়া—সবাই মিলিয়া এক প্রাণ হইয়া হিংসা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া জননীর পূজা করিবে আইস। এস এস—ঐ শুন মা ডাকিতেছেন। ঐ শুন পূজার বাজনা বাজিতেছে মা আসিয়াছেন—মা মণ্ডপে।

আর কি "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" এর সময় আছে? এই সময় একবার বাড়ীর ভিতরে গর্ভ ধারিণী জননীর পূজা করিয়া লও। দেখ দেখ তোমরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই বলিয়া মা যে বড় বিষণ্ণ। এস দেখি একবার জীবন্ত জননীর পূজা করি?

কখন জীবন্ত পূজা করিয়াছ? যে পূজায় বুঝিতে পারা যায় মা সন্তুষ্ট হইয়াছেন? মা হাসিয়াছেন? এস এস আজ ত সময় আসিয়াছে।

যদি কখন গর্ভ ধারিণী জননীকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা না করিয়া থাক তবে একবার এই পূজার সময়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মাতৃ পূজা কর। একবার মাতার পুত্র মাতার পুত্র বধূ সবাই মিলিয়া নূতন বস্ত্রাদি আনিয়া মাকে প্রদান কর। মাতাকে ভাল করিয়া আহার্য্য দ্রব্য প্রদান কর। জীবনের বড় একটা কার্য্য হইয়া থাকিবে—যদি স্বহস্তে একবার মাতৃ সেবা কর। এ

সেবা জগৎ জননী গ্রহণ করিবেন। তোমার এ পুণ্য তোমার ইহ ও পর-জীবনের মূলধন স্বরূপ থাকিবে। একবার করিয়া দেখ ইহাতে লজ্জা কি?

যদি জিজ্ঞাসা কর পুত্রগণ ও পুত্র বধূগণ কোথাও কি মার পূজা করিয়াছিল? ছিল বৈ কি।

মা যাইতেছেন পিত্রালয়ে। পিতা যজ্ঞ করিবেন। কন্যার নিমন্ত্রণ হয় নাই। কন্যা বিনা নিমন্ত্রণে পিত্রালয়ে যাইতেছেন। কোন প্রকার বস্ত্রালঙ্কার নাই—মা বিনা সজ্জায় যাইতেছেন--বিষাদে মুখ শশী ঢাকা পড়িয়াছে। পিতা জামাতার উপর ক্রোধ করিয়া যজ্ঞ করিয়াছেন—জামাতাকে যজ্ঞ ভাগ দিবেন না।

মাতা চলিয়াছেন—পথে পুত্রেব সহিত দেখা হইল। পুত্র মাতার বেশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল মা এ বেশে কোথায় যাইবে? বস্ত্র মধ্যে বাঘ ছাল আর অলঙ্কার মধ্যে রুদ্রাক্ষের মালা। মা পিত্রালয়ে যাইতেছেন তাহাই বলিলেন। পুত্রের প্রাণে ব্যথা লাগিল। পুত্র বলিয়া উঠিল "বাপ ঘরে যাবে কিম্বা বাঘ ছাল পরে।" না না আমি সন্তান থাকিতে এ বেশে তোমার যাইতে দিব না। মা তুমি একবার আমার আলয়ে আইস। মা পুত্রের কথা শুনিলেন। তখন পুত্র রুদ্রাক্ষের মালার পরিবর্ত্তে—মণিমুক্তা বিজড়িত বহু অলঙ্কারে দেহ সাজাইয়া দিল। বড় সুন্দর বস্ত্রে মাকে সাজাইল।

আজ পুত্রের মনে আনন্দ ধরে না। প্রকৃত আনন্দের ধর্ম্ম এই যে সে আনন্দ বিতরণ করিতে ইচ্ছা হয়। পুত্র মাকে সাজাইয়া অন্তঃপুরে গিয়াছেন—মার পুত্র বধূকে দেখাইতে। বধূ আসিল পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—দেখ দেখি মা কেমন সাজিয়াছেন? বধূ বড় ভক্তি ভরে প্রণাম করিল—করিয়া বলিল —মার আমার সজ্জা হয় নাই। পুত্র চমকিত হইল—বলিল এত প্রাণপণে সাজাইলাম তবু ও তোমার মনে ধরিল না? না হয় তুমি একবার সাজাইয়া দাও। বধূ ভরাপ্রাণে উদ্যানে গেল। বড় সুন্দর করিয়া অর্ঘ্য সাজাইয়া তখন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া মায়ের চরণে অর্ঘ্য দিল দিয়া বলিল রাঙ্গা জবা চরণে না দিলে কি আর মার সজ্জা সম্পূর্ণ হয়? "ও চরণে জবা বিনা সাঁজে কিহে কভু?" তখন কত আনন্দ উঠিল। তাই বলিতেছিলাম—যদি কখন মার পূজা না করিয়া থাক তবে মার পুত্র ও পুত্র বধূ মিলিয়া একবার মাকে পূজা করিয়া আনন্দ ভোগ কর—তোমাদের ঠাঁই ঠাঁই দূর হউক।

সত্যই এবার পূজা হইবে। বিপদকাল উপস্থিত না হইলে মা আসেন না। বিনা বিপদে মার পূজা হয় না। বিপদের আর বাকি কি আছে? জল প্লাবনে দেশ ভাসিয়া গেল, দুর্ভিক্ষে চারি দিকে মৃত্যু রোল উঠিল, ভূমিকম্প, প্লেগ, ম্যালেরিয়া, বিপদের বাকী কি?

মা আসিবেন—এইরূপ সময়েই মা চির দিন আসিয়াছেন। যখন সৃষ্টির আদিতে কিছুই ছিল না—সমস্ত এক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তখন পরমাত্মা প্রথমে এই পূজা করেন। আবার যখন চারি দিকে জল—স্থল কোথাও ছিল না—তখন জলশায়ী নারায়ণের কর্ণমল হইতে মধু কৈটভ

নামক দুই দৈত্য নারায়ণের সহিত পদ্মবাসী ব্রহ্মার হিংসার্থ গমন করে। ব্রহ্মা সেই সময়ে পূজা করেন। ইহাই দ্বিতীয় পূজা। আবার ত্রিপুর দানব বিনাশ সময়ে দেবাদিদেব জননীর পূজা করেন ইহাই তৃতীয় পূজা। মার চতুর্থ পূজা ইন্দ্র সমাধা করেন। ইন্দ্র লক্ষ্মী ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। মার পূজা করিয়া স্বর্গ রাজ্য অধিকার করেন। ইহার পরে দেবর্ষিগণ এই পূজা প্রচার করেন। এই পর্য্যন্ত মার যে পূজা হইয়াছিল সে পূজা মার চিণ্ময়ীমূর্ত্তির।

আবার কত কাল গেল। আবার জগতের দুঃখ আসিল। সুরত রাজা ও সমাধি বৈশ্য রাজ্য ও গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া বনে আসিলেন। সেখানে মেধা ঋষি মিলিল। ঋষির নিকটে তাঁহারা শক্তিকে জানিলেন। জানিয়া চিণ্ময়ীকে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতে ডাকিলেন। মা আসিলেন—মা বর দিলেন। উভয়ে ধন্য হইয়া গেলেন। মার অকাল বোধনের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাল্মীকিতে রামের এই পূজার কথা নাই, অন্য পুরাণে আছে। সকল যুগে একরূপ হয় না। তোমার ইতিহাসের মত ইতিহাস তাঁহারা লিখিতেন না। মোটের উপর প্রকৃত কথা এই যে কল্পে কল্পে পার্থক্য আছে। পুরাণে পুরাণে এই জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার পার্থক্য দেখা যায়। ইহা দেখিয়াই অল্পে বুদ্ধি লোক ভাবে সব প্রক্ষিপ্ত। এই সমস্ত নাস্তিক ভাব ত্যাগ কর। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র নিজের অনুভব যাহা বলিতেছে—যাহার রীতিমত ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে তুমি ইংরাজী মত লইয়া যদি বল সব প্রক্ষিপ্ত তোমার কথা বিশ্বাসের যোগ্য কিসে? তবু যে এত দিন লোকে তোমার কথায় শ্রদ্ধা করিতে যাইতেছিল সেটা মোহে—তোমার বাহিরের চটকে। এখন তোমার কথা ও কাজে এক দেখিতে না পাইয়া লোকের মোহ ভাঙ্গিয়াছে—তুমি আপনার শাস্ত্রকে ভক্তি করিতে পারনা—আপনার মনে ও মুখে এক নও—তোমার কথা মত লোকে চলিবে কেন? লোকের চক্ষে কয় দিন ধূলা দিয়া রাখা যায়? তুমি নিজের কিছুই দেখিলে না—পরের চাকচিক্য বাহিরের সজ্জা দেখিয়া ছুটিয়া গিয়াছিলে—সে চটক ভাঙ্গিয়াছে। যাহার অনুকরণে করিতে গিয়াছিলে সেই এখন তোমার কথাই বলিতেছে। আহারের পরে পান খাওয়া উচিত ইহাও ইয়ুরোপে আরম্ভ হইতে চলিল। প্রধান প্রধান সব আচার ব্যবহার ঠিক। পূজাত মহৎ ব্যাপার। বড় প্রাণভরা জিনিষ ইহাতে আছে, এখন এস মার পূজা কর।

আগমনী।

(১)

প্রভাতে অরুণ রাগে
জাগিছে নবীন প্রাণ।
আগমনী গাহিব না
গাহিব কি গান ?

(২)

নবশ্যাম দূর্ব্বা শিরে
শিশির মুকুতা শোভে ;
বুঝিবা সে স্নেহ অশ্রুধার।
আগমনী গাহিব না
গাহিব কি আর ?

(৩)

গাহি আজি আগমনী,
এসো দেবী বীণাপাণি,
কবিকণ্ঠ সুশোভিনী
কুসুমিত হার,
আগমনী গাহিব না
গাহিব কি আর ?

(৪)

এসো বিদ্যা, এসো বাণী,
এসো লক্ষ্মী, এসো রাণী
ক্ষেতে ক্ষেতে ভরা শস্য ভার।
আগমনী গাহিব না
গাহিব কি আর ?

(৫)

এসো, ভক্তি, এসো প্রীতি,
এসো এসো সুখ স্মৃতি—

শারদীয় অতুল শোভায়।
আগমনী গাহিব না
গাহিব কি আর?

(৬)

এসো শক্তি, এসো ধৃতি,
এসো বুদ্ধি সাধ্বী সতী,
মনোরাজ্যে সম্রাজ্ঞী আমার,
আগমনী গাহিব না
গাহিব কি আর?

(৭)

এসো রাজ রাজেশ্বরী,
অন্নপূর্ণা ক্ষেমঙ্করী,
বঙ্গলক্ষ্মী ধরিত্রী আমার।
আগমনী গাহিব না
গাহিব কি আর?

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

হিমাচলে উমা-আগমন।

নগরাজমহিষী নিশাশেষে স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বহুদিন পরে প্রাণের তনয়াকে নিদ্রাবেশে অবলোকন করিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। হিমবান্ সহসা তাঁহার এমন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী কহিলেন, "নগরাজ, আজ আমি প্রাণের উমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। মা আমার অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া আমাকে কহিতেছেন 'মা, তুমি কেমন করিয়া এমন নিদয় হইয়া আমাকে ভুলিয়া থাক। আমি যে তোমার বড় যত্নের, বড় আদরের ধন ছিলাম। আমি যে মা বিনা আর কিছুই জানিতাম না, আমি যে মা ছাড়া আর কাহাকেও চিনি না। মা, আর কি তোর দুঃখিনী মেয়ের খবর করবি না।"

বলিতে বলিতে গিরিরাণী বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠ হইলেন, আর বলিতে

পারিলেন না। ক্ষণকাল পরে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন ঃ—

"গিরি, গৌরী আমার এল কই?
ওই যে সবাই এসে দাড়া'য়েছে হেসে,
(শুধু) সুধামুখী আমার প্রাণের উমা নেই?"

"দেখ শরদাগমে নভোমণ্ডল মেঘনির্ম্মুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। বর্ষা-বারিবিধৌত ধরিত্রী নবপত্রপুষ্পে সজ্জিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। দেখ, স্রোতস্বিনীর জল নির্ম্মল হইয়াছে, কুমুদ কহ্লার পরিব্যাপ্ত সরোবরে হংসকারণ্ডবাদি জলবিহঙ্গকুল পরমানন্দে ক্রীড়া করিতেছে। অসংখ্য শেফালিকা. অতসি ও অপরাজিতা ফুটিয়া পুষ্পপ্রিয়া উমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। পুষ্পসৌরভবাহী মন্দবায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে ও ধীরে ধীরে বৃক্ষশাখা আন্দোলিত করিয়া কুসুম বৃষ্টি করিতেছে। মধুর কণ্ঠ বিহগ-কুলের কাকলিতে কানন প্রদেশ মুখরিত হইয়া উঠিল। এমন সুখের শরতে শরদিন্দুনিভাননী মা আমার কোথায়? গিরি, আমি মিনতি করিতেছি, তুমি আমার প্রাণের উমাকে আমার ক্রোড়ে আনিয়া দাও।"

পর্ব্বতরাজ বিচলিত হইলেন।

"মহীভৃতঃ পুত্রবতোঽপি দৃষ্টিঃ
তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্।"

বসন্ত কালে অসংখ্য প্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলেও ভ্রমরকুল যেমন আম্রমুকুলেই বিশেষ আসক্ত হইয়া থাকে, তেমনি বহু পুত্র কন্যা থাকিলেও হিমবানের চক্ষু যেন সেই কন্যাটীকে দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্তি পাইত না।

যাহাকে দেখিয়া দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হইত না যাহাকে ক্ষণকালও নেত্রান্তর করিলে প্রাণ অস্থির হইত, তাহাকে ভুলিয়া সম্বৎসর কেমন করিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন, গিরিরাজ তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। কিছুই বলিতে পারিলেন না, উমার কার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া তাঁহার নেত্র অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

তাঁহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া রাণী আবার কহিলেন, "মহারাজ, উমা আমার বড় অভিমানিনী; আমরা এতদিন তার সংবাদ লই নাই, মা আমার আর কি এ পুরে আসিবে? যে দিন পার্ব্বতী কৈলাসে প্রস্থান করিয়াছে, আমি সেই দিন হইতেই দিন গণনা করিতেছি। ঋতু, মাস, পক্ষ,

দিন গণনা করিতে করিতে আর আমার ধৈর্য্য ধারণ করা অসম্ভব হইয়াছে। প্রভু, তুমি, যাও,

"যাও যাও গিরি, আনগে গৌরী
উমা অভিমান করেছে।
আমি শুনেছি শ্রবণে, নারদের বচনে,
উমা মা, মা, বলে কেঁদেছে।"

উমা 'মা' 'মা' বলে কেঁদেছে একথা মায়ের প্রাণে শেলসম বাজিল। কাঁদিয়া কাটিয়া গিরিরাজকে বুঝাইয়া মেয়ে আনিতে পাঠাইলেন এবং আপনি উঠিয়া তাঁহার জন্য নানারূপ দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিলেন।

(২)

হিমাচলপুরে মহোৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। পুরবহির্ভাগে নির্ম্মিত অপূর্ব্ব তোরণ সকল পার্শ্বে, সপল্লব পূর্ণকুম্ভ সকল স্থাপিত হইল। নানাবর্ণের পত্রপুষ্পে পুরবাসীগণের বিচিত্র গৃহ সকল পরিশোভিত হইল। দোদুল্যমান কুসুমমালা হইতে চতুর্দ্দিকে সৌরভ ছড়াইয়া মলয়ানিল ক্রীড়া করিতে লাগিল। হিমবান্ আদেশ প্রচার করিলেন,

"উমা আসিবার পথ কর মনোহর।
উচ্চনীচ কাটিয়া করহ অগ্রসর।
দিব্য দিব্য গন্ধ বৃক্ষ রোপহ দুসারী।
মঙ্গল আচার কর নাচুক অপ্সরী।"

তানলয়পরিশুদ্ধ মধুর গন্ধর্ব্বসঙ্গীতের সহিত অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। উচ্চনীচ স্থান সকল সমতল করান হইল ও সম্পরিস্কৃত পথ ঘাটে, চন্দনের ছিটা দিয়া ধূলিশূন্য করা হইল। রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে সারি সারি কদলী বৃক্ষ ও তন্নিম্নে পূর্ণকুম্ভ শোভমান হইল। গৌরী আগমন দর্শন আশায় জনগণ হর্ষান্বিত হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল ও অনুক্ষণ পথপানে তাকাইয়া রহিল। পুরনারীগণ হর্ম্ম্যোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সিংহবাহিনীর পথের দিকে চাহিয়া পরস্পর অপর্ণার গুণাবলী প্রসঙ্গে দিবস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সকলে আনন্দে আপনা ভুলিয়া কেবল উমার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ শব্দ হইল, 'ঐ আসিতেছেন,' অমনি তুমুল কোলাহলে চতুর্দ্দিক

ভরিয়া গেল; "ঐ আসিতেছেন, ঐ দেখা যাইতেছে," বলিতে বলিতে সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল, গভীর বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। মেনকা গৃহমধ্যে বসিয়া ভাবিতেছেন। আহার নিদ্রা ভুলিয়া প্রাণের উমার আশায় বসিয়া আছেন। বাল্যকালে উমা কি ভাল বাসিতেন, কি খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, কি খেলা খেলিতে খেলিতে আহার ভুলিয়া যাইতেন, জননী মৃদুমধুর ভৎর্সনা করিয়া অন্বেষণ করিয়া আনিয়া আদর করিয়া আহার করাইতেন। গিরিরাণী বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন। আনন্দাশ্রুতে অঞ্চল একেবারে ভিজিয়া গেল। এ চিন্তা কি সুখের! আমি যাহাকে ভালবাসি, যাহার ক্ষণিক সুখের জন্য প্রাণপাত করিতে পারি, যাহার হাসিমুখ দেখিলে আমি সংসার বিস্মৃত হই, আমার সেই বড় আদরের ধন, বড় স্নেহের রতন, আজ বহুকাল পরে আবার আমার কোলে আসিবে। রাণীর রহিয়া রহিয়া হর্ষোৎকম্প হইতেছে, আনন্দাতিশয্যে ক্ষণে ক্ষণে ঝর ঝর করিয়া মুক্তা ফলের ন্যায় অশ্রুবারি পতিত হইতেছে কিছুতেই চাপিয়া রাখা যাইতেছে না।

'ঐ দেখা যাইতেছে,' শুনিয়া উমা-জননী অতিমাত্র ব্যতিব্যস্ত হইয়া প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিতে ছুটিলেন। অবিরল নেত্রজলে দৃষ্টি আচ্ছাদিত হইল, মেনকা কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কতবার চেষ্টা করিলেন কিছুতেই অশ্রুজল বারণ মানিল না।

গিরিরাজ-মহিষী শিলাপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কেশপাশ আলুথালু হইয়া পড়িল; রাণী অধৈর্য্য হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া এক রমণী সান্ত্বনা দিতে আসিলেন। তিনি কহিতে লাগিলেন, "রাজেন্দ্রাণি, অশ্রুজল সম্বরণ করুন। আপনার প্রাণের গৌরী আজি পুত্রদ্বয় ক্রোড় লইয়া সিংহবাহনে আসিতেছেন। দূরে, বহুদূরে, দিক্‌চক্রবাল রেখার অতি নিকটে সহসা আলোকচ্ছটা প্রকটিত হইল; আমরা বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম; ক্রমে লোহিতজ্যোতিরভ্যন্তরে অস্পষ্ট রেখা সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল; এবং ধীরে ধীরে কিরীটকুণ্ডলহারশোভিত দুর্গামূর্ত্তি ও যুগলতনয়ের মূর্ত্তি সিংহপৃষ্ঠে পরিদৃশ্যমান হইল। আমি ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি,—মা, আপনি উঠুন, রোদন সম্বরণ করিয়া এখন প্রাণের উমাকে বরণ করিয়া গৃহে আনয়ন করুন।"

শুনিতে শুনিতে গিরিরাণীর সংজ্ঞালোপ হইল। কস্তূরীসুবাসিত শিলাপৃষ্ঠে আলুথালুকেশা, বিস্রস্তবেশা রাণী পড়িয়া রহিলেন। এ দিকে বহির্ভাগে মুহুর্ম্মুহুঃ জয়ধ্বনি হইতে লাগিল; তুমুল বাদ্যকোলাহলে পৃথিবী কম্পিত হইল, পৌরস্ত্রীগণ আচার লাজ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। গৃহে গৃহে মঙ্গল সূচক শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি হিমাচল পুরবাসীগণের আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

এমন সময়ে উমার এক বাল্যসখী আসিয়া রাণীকে বলিলেন; 'মা উমা তোমার ঘরে, আর তুমি এখনও শয়ন করিয়া আছ ?'

'গা তোল গা তোল বান্ধ মা কুন্তল
ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী।
যুগল শিশু ল'য়ে কোলে "মা কই আমার" বলে
ঐ এল তোর শশধরবদনী॥
ত্রিভুবন ধন্যে, ত্রিভুবন মান্যে,
তোর মেয়ের তুলনা নাই গো রাণী,
আমরা ভাবিতাম ভবের প্রিয়ে, আজ শুনি তোর মেয়ে,
উমা নাকি ভবের ভয় হারিণী।
ধরিলি যে রত্ন উদরে, তোর মতন সংসারে
ওগো রত্নগর্ভা এমন নাই গো রাণী॥"

" কই আমার উমা কই " বলিয়া পাগলিনীর ন্যায় গিরিরাণী ছুটিলেন। "আলু থালু কেশ, পাগলিনীর বেশ, অবিরল ধারা বহে নয়নে।" এমন ভালবাসা, এমন ঐকান্তিক ভালবাসা যাহার হয়, তাহার বাড়ী সিংহবাহিনী আপনি আসিয়া থাকেন। গিরিরাণীর ন্যায় যাঁহার সকল চিন্তা, সকল ভাবনা, সকল আশা আকাঙ্খা, কর্ম্ম ধর্ম্ম জ্ঞান ঈশানীতে সমর্পিত, তাঁহার প্রাণ ঈশানীর জন্য কাঁদিয়া উঠিলেই, তিনি তাঁহাকে নিকটে আসিয়া দর্শন না দিয়া থাকিতে পারেন না। উভয়ে উভয়কে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া, পরস্পরের স্কন্ধে মস্তক রক্ষা কারিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে মেনকা তনয়াকে বক্ষে ধারণ করিয়া আদরে মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন।

" ও মা, মনে প'ড়ে এতদিনে।
এলি মা ভবনে,
পিতা মাতা আকুল তব, দরশন বিনে।

কুশল বল মা শুনি, জুড়াক তাপিত প্রাণী,
কোলে আয় মা ভবরাণী, মা ব'লে বদনে॥

মহিষী আবার কহিলেন, 'উমা, আজ মা বলে মনে পড়িল কি?' সারানিশি নিদ্রা নাই নয়নে আমার—তোর কথা ভেবে ভেবে যে আমি পাগলিনী হইলাম। হতভাগিনী জননীকে কি এমনি করিয়া ভুলিয়া থাকিতে হয়, তোকে যে পলকের তরে নয়নান্তরাল করিলে আমার প্রলয় জ্ঞান হইত, ওগো পাষাণ-নন্দিনি, তোর সে সব আর মনে নাই।' তিনি কত করিয়াও কত কথা কহিয়াও যেন কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। জননীর কথা শ্রবণ করিয়া গৌরী কহিলেন, "মা, আজ আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইল। তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোথায়ও সুস্থির চিত্তে থাকিতে পারি না। তোমার স্নেহ, তোমার প্রীতি, ভালবাসা, মনে করিলে আমি সংসার ভুলিয়া যাই। কি করিব মা, যাঁহার হাতে আমাকে সমর্পণ করিয়াছ, তিনি যে আমা বই আর কিছুই জানেন না। সে যে আমায় চোখে চোখে রেখেও শান্তিতে থাকিতে পারে না। আমি যে তার সম্পূর্ণ অবলম্বন;

"দিতে হয় মা মুখে তুলে,
নয় তো খেতে যায় গো ভুলে,
ক্ষ্যাপার দশা ভাবতে গেলে, আমাতে আর আমি নাই।"

সে যে খাইতে খাইতে আমার দিকে তাকাইয়া খাইতে ভুলিয়া যায়, মা,

"ভুলিয়ে যখন এলাম ছলে,
ভেসে গেল নয়ন জলে,
একলা পাছে যায় গো চলে,
আপন হারা এমন কই॥"

মা আমি বেশী দিন এখানে থাকিলে কি জানি কি বিপদ হয়। আমি তিন দিন এখানে থাকিব। যত দিন তোমার তনয়াকে মনে থাকিবে, যত দিন আমার জন্য শরদাগমে তোমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে, ততদিন আমি প্রতি বৎসর তোমাকে দেখিতে আসিব।

রাণী হর্ষোৎফুল্ললোচনে প্রীতিপ্রফুল্ল মনে ভবরাণীর পূজার আয়োজন করিতে যত্নবতী হইলেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক বি, এ।

রেজেষ্টরী নং A362.

দ্বিতীয় বর্ষ] ১৩১৪ সাল, কার্ত্তিক। [সপ্তম সংখ্যা

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

উৎসব।

ওঁ শ্রী আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২য় বর্ষ] ১৩১৪ সাল, কার্ত্তিক। [৭ম সংখ্যা

হংস গীতি।

ষোড়শী।

(১)

কে তুমি আনন্দময়ী শিবনাভিপদ্মোপরে।
পাশাঙ্কুশ ধনুর্ব্বাণ ধরা তোমার চারিটা করে॥
কেন এতো রূপের ছটা
কেন তোমার বসন আঁটা
কেন অলঙ্কারের ঘটা আছ কার অপেক্ষা করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
ঈশ্বর-আসনোপর
আবরণ শক্তি বুঝি, পুরুষ ধরো আপন জোরে॥
আমার কণ্ঠ কর রোধ
প্রকাশুক নিজ বোধ
হ'য়ে যাক্ জন্মের শোধ, স্থিতিব্রহ্মপরাৎপরে॥

(২)

এ সব মিথ্যা মাত্র ছায়া॥
কবির বাক্য আটা যেমন কল্পনাতে কায়া॥
স্থূল সূক্ষ্ম বলে প্রবীণ
যাতে হয় তাতেই লীন
আস্‌চে যাচ্চে হচ্চে হবে দৃশ্যবস্তুই মায়া॥

সারকথা।

(১)

জ্ঞান লাভ ভিন্ন পরমানন্দে নিত্যস্থিতি কখনই হইবে না। আর তাহা যদি না হইল তবে জনম মরণ স্রোত নিবারণ করা গেল না, দুঃখও অতিক্রম করা গেল না; আর জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হইল। তাই বলা হইল

কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং
ব্রতপরিপালনমথবা দানং
জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন
মুক্তির্নভবতি জন্মশতেন॥

(২)

মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। নিত্য আনন্দেস্থিতিই মৃত্যুশূন্য অবস্থা। মৃত্যুই যদি অতিক্রম করা না গেল তবে জীবনে কোন প্রয়োজন ছিল না। মৃত্যুতে বড় যাতনা। তাই মৃত্যু চাই না। কেহ যে মরে তাহাও দেখিতে পারি না। এমন হৃদয়-বিদারক আর কিছুই নাই। মূর্খ লোক এবং স্ত্রীলোকে যাহা বলে জগৎ তাহাই আজ বলিতেছে—সকলে মরে তুমিও মরিবে তার জন্য ভাবনা কি? জগতের লোকের বুদ্ধি স্ত্রী বুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী" তাই ইহা কলিযুগ। ঋষিগণ পুরুষ ছিলেন। মৃত্যু অতিক্রম করিতে হইবে। তাহার উপায় তাঁহারা বলিয়া দিয়া গিয়াছেন। মৃত্যু অতিক্রম জন্য যাহা করিতে হয় তাহাই এই জীবনে করিয়া যাও। তদ্ভিন্ন যাহা করিতেছ সমস্তই বৃথা, ভাবিয়া দেখ। সমস্ত জীবন ধরিয়া ত গাধার মোট বহিলে। কত ক্লেশ করিয়া ধন উপায় করিলে সুখভোগ করিলে কবে? একটা কথা ভুলিয়াছ—স্ত্রী পুত্র প্রতিপালনটা কর্ত্তব্য, ভারত উদ্ধারটা কর্ত্তব্য। কেন কর্ত্তব্য? প্রতিপালনটা কিরূপ হইল? উদ্ধারটা কাহাকে বলিতেছ? তোমার চক্ষের সম্মুখে শত শত লোক মরিতেছে, তুমি বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছ, পারিতেছ না, পুত্র কাতর হইয়া মৃত্যুকালে বলিতেছে "পিতঃ আমাকে বাঁচাও"; তুমি বৃদ্ধ গর্দ্দভের মত ডাক্তার আনিতেছ ঔষধ খাওয়াইতেছ, শেষ অবধি গর্দ্দভত্ব করিতেছ? হায়! জগৎ বড় মূর্খ হইয়া গিয়াছে।

যদি মৃত্যু অতিক্রম করা না যায় তবে কি বেদাদি শাস্ত্র এত করিয়া বলেন:—

১। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

২। তস্মাৎ য এতৈর্ম্মন্ত্রৈর্নিত্যং দেবং স্তৌতি।
স দেবং পশ্যতি সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি সোঽমৃতত্বঞ্চগচ্ছতীতি॥

৩। অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥

৪। তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থমষ্যাবেশিতচেতসাম্‌।
৫। অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি।
৬। মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহং।
৭। জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
৮। জন্মমৃত্যুজরা'দুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে॥
৯। জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তা পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্‌।
১০। সোহমৃতত্বায় কল্পতে।
১১। অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন।

মৃত্যু অতিক্রম না করিয়া যদি তুমি এখান হইতে তাড়িত হইলে তবে তুমি করিয়া গেলে কি? বিষয় সম্পত্তিতেই বা কি হইল, হাঁড়ি কলসী জাঁকাইয়া থাকা গৃহিণী হওয়াতেই বা কি হইল? উদ্ধার করিলে কাহাকে? বুদ্ধদেব এই জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। তুমি কোন বৌদ্ধ যে বুদ্ধদেবের মৃত্যু অতিক্রম করার উপদেশ বাদ দিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম পালন কর? হায়! জগৎ নিতান্ত পতিত অবস্থায় আসিয়াছে! যাহার জন্য সংসার করা, ধর্ম্মপথে চলা, রাজ্য পালন করা তাহা যদি স্বপ্নেও চিন্তা না করিলে তবে ত তোমার সমস্তই বৃথা। তাই বলা হয় "অন্ধা চলতা হ্যায়। কাঁহা চল্‌তা হ্যায়? চল্‌তা হ্যায় বাবা!"

(৩)

জ্ঞান লাভ কর। মৃত্যু বা অজ্ঞান অতিক্রম করিবে। এই জন্মেই।

জ্ঞান দুই প্রকার। ভগবান আছেন—সর্ব্বত্র আছেন—সাকার নিরাকার উভয় মূর্ত্তিতে আছেন। সর্ব্বত্র আছেন—সর্ব্ববস্তু মধ্যে আছেন। সর্ব্ববস্তু ব্যাপিয়া আছেন। ভিতরে বাহিরে আছেন। এই শাস্ত্রবাক্য বিচার যুক্তি দ্বারা স্থির নিশ্চয় কর এক প্রকারের জ্ঞান লাভ হইল।

দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞানে আমিই সেই ভগবান সেই আত্মা সেই ব্রহ্ম নিশ্চয় কর।

(৪)

যেমন অবস্থায় আইস না কেন—আবার কাঁচিয়া সাধনা কর-শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিও না—নিজের মনের মত উপাসনা করিও না, শাস্ত্র মত চল মৃত্যু অতিক্রম হইবে।

রাজর্ষি জনক।

(১)

রাজর্ষি জনক সংসারে থাকিয়াও ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছিলেন। সংসারও দেখিতেন জ্ঞানলাভও করিয়াছিলেন।

কিরূপে এই অবস্থা লাভ হইয়াছিল? একদিন তিনি মৃগয়া করিতে বনে

গমন করেন। বনভূমির মধ্যে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি সমস্ত লোককে বিদায় দিয়া একাকী বনের মধ্যে ভ্রমণ করেন। তখন তিনি অকস্মাৎ কতিপয় সিদ্ধপুরুষের আত্মতত্ত্ববিচার শ্রবণ করেন। শ্রবণ করিয়া তিনি যে বিচার দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তাহাই যদি তুমি আমি অভ্যাস করিতে পারি আমরাও জ্ঞানলাভ করিয়া আপন স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিব। বিষময় সংসারের পারে যাইয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারিব। আর আমাদিগকে সংসার যাতনা ভুগিতে হইবে না। আর জনন-মরণ ভয়ে ভীত হইতে হইবে না। আর পুত্রকলত্রাদিবিয়োগে অস্থির হইতে হইবে না।

এই বিচার কিরূপ তাহা শুনিতে কাহার না লোভ হয়?

রাজা জনক বিচার দ্বারা মনকে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। সমাধি বলিলেই আমরা হতাশ হই। কিন্তু ইহা যোগীর সমাধি নহে ইহা বিচার সমাধি। যোগবাশিষ্ঠ বড় জোর করিয়া বলিতেছেন, সামান্য বিবেক যাহার আছে, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা যে ভোগ করিয়া সংসারকে দুঃখময় বুঝিয়াছে সেই এই বিচার সমাধি লাভ করিতে পারে। কিন্তু এক ঝিনুক বিচার দুগ্ধ পান করিয়াই যদি জিজ্ঞাসা কর "বাবা! বল পেলি রে" তবে কিছুই হইবে না। কিম্বা বিচার কর বলিয়া যদি সন্ধ্যা জপ ক্রিয়া পাঠ বাদ দাও তাহা হইলেও হইবে না। সমকালে সমস্ত অভ্যাস কর—হইবেই। মনকে নিরন্তর উপদেশ করিতে করিতে এই সমাধি লাভ হইবে। সর্ব্বদা মনের সহিত কথা কহিতে কহিতে মন প্রবুদ্ধ হইবে। মন প্রবুদ্ধ হইলেই মন আপন সত্তা সেই চৈতন্যপুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করিবে।

আহার, নিদ্রা, শয়ন, ভ্রমণ সকল সময়েই মনকে জানাইতে থাক—মন তুমিই সংসার করিতেছ, তুমিই দুঃখী হইতেছ, তুমিই অভাব অভাব বলিয়া চীৎকার করিতেছ. তুমি রোগে শোকে কাতর হইতেছ, তুমিই মৃত্যু ভয়ে ভীত হইতেছ, তুমিই সংসারের জ্বালায় জ্বলিতেছ।

কিন্তু তুমি ওরূপ হও কেন? রোগ শোক দেহের, মৃত্যু জন্ম দেহের, ক্ষুধা তৃষ্ণা দেহের, আত্মার সহিত জনন মরণ, মৃত্যু ভয়, ভাবনা, সংসার ইহাদের ত কোন সম্পর্ক নাই। এই যে সমস্ত সঙ্কল্প মন তুলিতেছ ইহাতে আমার আস্থা করিবার কি আছে? জগতের সমস্ত বস্তুই ত দুঃখগন্ধি—এখানে আকাঙ্ক্ষার বস্তু ত কিছুই নাই। হর্ষ বিষাদের কি আছে এখানে—কিছু পাই নাই কিছু পাইয়াছি ইহা এই অসার সংসারের বস্তু সম্বন্ধে প্রয়োগ কিরূপে হইতে পারে? আত্মা ত পূর্ণ। ইনি আবার পাইবেন কি? তিনি নির্ভয় তাঁহার আবার ভয় কি? কিছু আছে তাহাও ভাল, নাই তাহাও ভাল। ক্ষুধা হইতেছে তাও ভাল, না হইতেছে তাও ভাল। সংস্কার বদলাইয়া দাও, ক্লেশ বা হর্ষ কিছুতেই কিছু বোধ হইবে না। গত ও ভবিষ্যৎ কিছুতেই কিছুই চিন্তা করিবার নাই, উপস্থিত যাহা আসিবে করিয়া যাও। কোন কিছুর ইচ্ছা করিবার তোমার নাই অনিচ্ছা করিবারও নাই। যাহা আসে আসুক যাহা হয় হউক তুমি উদাসীন ভাবে উপস্থিত সমস্ত করিয়া যাও।

সুখই বা কার দুঃখই বা কার? তুমি ইহাদের নও ইহারাও তোমার নহে। কেন বৃথা কত কি ভাবনা কর? মন তুমি ভাবনা ত্যাগ কর—সুস্থ হইয়া যাও। এ দেহও তোমার নহে ইহাও থাকিবে না বিশেষ থাকুক বা যাক্ তাহাতেও তোমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

এই যে বিচার এই বিচারটি সর্ব্বদা মনকে বলিতে হইবে। যেমন একজন লোকের সহিত কথা কও সেইরূপ একান্তে বসিয়া মনোমনুষ্যের সহিত এই কথা কহিতে হইবে—এইরূপ ভাবে কথা কহিতে হইবে। অভ্যাস কর তখন তোমার বিচারবতী প্রজ্ঞা জন্মিবে, জন্মিয়া প্রজ্ঞপ্তি দেবী যেমন লীলাকে জীবন্মুক্তি দিয়াছিলেন তোমার বিচারবতী প্রজ্ঞাও তোমাকে জীবন্মুক্তি দিয়া দিবেন। সর্ব্বদা এই বিচার কর—মন যেন একজন মানুষ বালককে উপদেশ করার মতন তুমি কথা কহিয়া,—বেশ শব্দ করিয়া কথা কহিয়া—এই বিচার অভ্যাস কর, জনক রাজার মত জীবন্মুক্ত থাকিয়া সংসার করিতে পারিবে।

লাভালাভ আধিব্যাধি জন্মমৃত্যু সকলেই তুমি নির্ভর।

(২)

এই যে বিচারের কথা বলা হইল ইহা একদিন করিলে হইবে না, দুই দিনে না, তিন দিনে না, যত দিনে না হয় তত দিন ধরিয়া অভ্যাস কর। করিয়া দেখ কত নিশ্চিন্ত হইয়া যাইবে। বিপদে বিপদ বোধ নাই, সম্পদে সম্পদ বোধ নাই, মৃত্যু আসিবে তাহাও ভয় নাই, স্বর্গ পাইবে তাহাও হর্ষ নাই। কিছুতেই বিচলিত হইতেছ না। পরম শান্ত অবস্থা ইহা। স্বস্বরূপে অবস্থান ইহা। স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়া—অনন্ত সীমাশূন্য হইয়াই কেন্দ্র স্থানে আসিয়া মূর্ত্তি ধরিয়া জগৎ লইয়া মন লইয়া খেলা ইহারই নাম। অনাস্থার আস্থা, অনিচ্ছার ইচ্ছা, অনাসক্তির আসক্তি এই বিচার অভ্যাস দ্বারাই জন্মিবে।

এই বিচার বড় শুভ। কিন্তু ইহার অপব্যবহারে ইহাও থাকে না—অন্য কিছুই থাকে না মানুষ হয় নাস্তিক।

সন্ধ্যাবন্দনাদি সমস্তই করিতে হইবে প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া এই বিচার অভ্যাস করিতে হইবে।

আর ভক্তিযোগের সহিতও ইহার বিরোধ নাই। প্রথমতঃ নিজের শক্তিতে কিছুই হয় না ইহাত পরীক্ষিত সত্য। এই জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর—প্রভু আমার দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না তুমি আমায় শক্তি দাও আমি সন্ধ্যা করি বা জপ করি বা পাঠ করি তোমার আজ্ঞা বলিয়া, ইহা দ্বারা কি হইবে কি না হইবে আমি জানি না। সেইরূপ ধ্যান করি তাহাও তোমার আজ্ঞা বলিয়া—পারি না তথাপি তোমার আজ্ঞা বলিয়া তোমার সাহায্য চাহিয়া করিয়া যাই।

আবার আত্মবিচার করি তাহাও তোমার আজ্ঞা বলিয়া। বিচার করিবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি তোমার আজ্ঞামত তোমার কথা দিয়াই মনকে প্রবুদ্ধ করি।

(৩)

হে ভগবান্! তোমার কৃপা কি জানিনা। মনে হয় তোমার আজ্ঞামত চলিতে ইচ্ছা করাই তোমার কৃপার পরিচয়। আবার তোমার আজ্ঞামত কার্য্য করাই তোমার কৃপা। কি করিলে কি হয় জানি না কিরূপ করিতে হইবে জানিনা, কিন্তু যথাসময়ে তোমার আজ্ঞামত কার্য্যে প্রবৃত্ত হই আর বলিতে থাক, আমি আবার আসিলাম আমি কর্ম্মে প্রস্তুত হইলাম এখন তুমি আমার কর্ম্ম নিষ্পত্তি করিয়া দাও। আমার শক্তি কিছুই নাই—আমার ইচ্ছা মাত্র আছে তোমার শক্তি দ্বারা আমাকে চালাইয়া লও।

সন্ধ্যা, জপ, পাঠ, ক্রিয়া, ধ্যান, আত্মবিচার যখন যাহাতে মন সুস্থ থাকে তাহাই কর। কিন্তু বিচার ভিন্ন অন্য কিছুতেই মন পরম শান্ত অবস্থা লাভ করিতে পারিবে না। শান্ত অবস্থায় যখন মন আসিবে তখন মনকে চূড়ালা শিখিধ্বজ সাজিতে বল, হরপার্ব্বতী সাজিতে বল, সীতারাম সাজিতে বল, রাধাকৃষ্ণ সাজিতে বল, ইহা বড় আনন্দে সাজিবে, সাজিয়া রাধা হইয়া কৃষ্ণ সেবা করিবে, সীতা হইয়া রামভজন ভজনা কর পার্ব্বতী হইয়া শিব পূজা কর, চূড়ালা হইয়া শিখিধ্বজকে জীবন্মুক্তি দাও—দেখিবে তোমার আনন্দে স্থিতি হইয়া যাইবে। তুমি তখন সর্ব্বদা সমাধিমগ্ন থাকিয়াও ব্যবহারিক কার্য্য করিয়া রাজর্ষি জনকের মত বিদেহ নগরের রাজা হইবে।

আবার যখন ইচ্ছা যাহার পূজা কর তাহাই হইয়া তৎস্বরূপে অবস্থান করিবে। শুধু মহাকাশ নহে, কিন্তু চিত্তাকাশ ও চিদাকাশ সমস্তই তোমার আয়ত্বাধীন হইবে। ইহাই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য। ইহা সম্পন্ন না করিয়া যদি সংসার ত্যাগ করিতে হয় তবে আমার মত নরগর্দ্দভ আর কে আছে।

এই জন্য জপ, ধ্যান ইত্যাদি নিয়মমত করিয়া আত্মবিচার লইয়া থাক।

আত্মবিচার ভিন্ন তুমি যাহাতে স্থিতি লাভ করিতে চাও তাহা হইবে না। আত্মবিচার ভিন্ন জরা মরণ অতিক্রম করা যাইবে না, আত্মবিচার ভিন্ন ভক্তি লাভ হইবে না। আত্মবিচার ভিন্ন কিছুই হইবে না। আর জীবন্মুক্ত হইয়া যাহা পাও তাহাই পাওয়া—তদ্ভিন্ন যাহা পাইলে তাহা আবার হারাইবে। চূড়ালা জীবন্মুক্ত হইয়াই চিরদিনের জন্য পাইয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ মনের সহিত কথা কহিতেন গানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—সাধক মাত্রেই মনকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ভগবানকে ডাকিবে মন—মনই যদি আপন তালে নাচিতে ব্যস্ত থাকিল তবে তুমি জপ ধ্যান আত্মবিচার করাও কাহাকে? তাই মনকে উপদেশ দিয়া প্রবুদ্ধ কর। সর্ব্বদা মনকে বিচার শোনাও। সর্ব্বদা পাগলের মত আপন মনে আপনি কথা কও। একান্তে ইহাই অভ্যাস কর। প্রাতে মধ্যাহ্নে শুভ জলে স্নান করিয়া সন্ধ্যাদি ক্রিয়া শেষ করিয়া আত্মবিচার কর। পারশ্রান্ত হইলে আবার ধ্যান কর, শ্রান্ত হইলে আবার জপ কর ইতি।

রুক্মিণী।

বালিকার কৃষ্ণপ্রেম।

বালিকা রুক্মিণীকে লইয়া সখীগণ বহুপ্রকার ক্রীড়া করিত। নিবিড় মেঘপ্রভা কুন্তলরাজিতে বিচিত্র কবরী নির্ম্মাণ করিয়া নানা কুসুমে ভূষিত করিত; ললাট দেশে সিন্দূরবিন্দু অঙ্কিত করিয়া দিয়া, প্রদোষকালে মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশ প্রান্তে পূর্ণচন্দ্রের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিত। কখনও বা অলকা তিলকায় অপরূপ সাজে সাজাইত এবং সুরভি কুসুমে মনোহর মালা গাঁথিয়া গলে পরাইত। কভু বা মহৈশ্বর্য্যময় হর্ম্ম্যতলে সিংহাসনে বসাইয়া উজ্জ্বলাভাময় মণিরত্নাদিখচিত অলঙ্কার সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিত, রূপের প্রভায় নয়ন ঝলসিয়া উঠিত, আবার কদাচিৎ বা গৈরিকবসনে অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী বালিকার দেহলতা আবৃত করিয়া যোগিনী মূর্ত্তিতে সাজাইত। নিকুঞ্জ-কাননে রুক্মিণীকে যখন সখীগণ পুষ্পাভরণভূষিতা করিয়া ফুলরাণী সাজাইত, বালিকার রূপের স্নিগ্ধজ্যোতিতে কুঞ্জবন আলোকিত হইয়া উঠিত।

সখীগণ কত গান গাহিত, কত কাব্যেতিহাসের মনোমুগ্ধকর প্রসঙ্গ লইয়া আমোদে মত্ত হইত, কত যুদ্ধবিগ্রহের গল্প করিত, কত রাজা ও রাণীর সুখদুঃখের কথা লইয়া সুখে কালযাপন করিত। রুক্মিণী যেন তাহাদের প্রাণ। তাহারা রুক্মিণীকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিত না, ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তাহার অনুগমন করিত। পিতামাতার বড় আদরের রুক্মিণী সর্ব্বজনপ্রিয়া আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, আদর আপ্যায়নে, শ্রদ্ধা ভক্তিতে যুগপৎ সকলের স্নেহ এবং প্রীতি আকর্ষণ করিল।

ভীষ্মক-দুহিতা লোকমুখে কৃষ্ণ কথা শুনিয়া শুনিয়া কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করিত। রুক্মিণী সখিগণকে শ্রীকৃষ্ণ গুণগান করিতে অনুরোধ করিত, আর কৃষ্ণবিষয়নী কথা উঠিলে নীরব নিস্পন্দ হইয়া তাহা শ্রবণ করিত। বাল্যসখিবৃন্দ নানা প্রকারে তাহাকে সজ্জিত করিলেও রাজনন্দিনী মাল্য চন্দন এবং অলকা তিলকা বড় ভালবাসিত। ভিখারী আপন মনে রাজপথ বাহিয়া স্বরলহরী তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণনামামৃত বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইত, শুনিতে শুনিতে বালিকার রোমাঞ্চ হইত, নিতান্ত অভিভূতার ন্যায় প্রাণ ভরিয়া তাহা পান করিত।

মায়াময়ী পূতনা কিরূপে স্তনযুগলে তীব্র বিষ মিশ্রিত করিয়া বালক কৃষ্ণের প্রাণনাশ করিতে প্রয়াস করিয়াছিল এবং কিরূপে আপনিই বিনষ্ট হইয়াছিল; কালীয় কি প্রকারে রাখাল বালকগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল ও শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে তাহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাহার দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন; তৃণাবর্ত্ত-বধ, বকাসুর বিনাশ, কংশের চাতুরী এবং ধনুর্যজ্ঞ-চ্ছলে কৃষ্ণানয়ন এবং তাঁহার প্রাণ সংহার চেষ্টা করিয়া কংশ কিরূপে আপনার

বধোপায় পরিষ্কৃত করিয়াছিল—সখিগণ যখন এই সব প্রসঙ্গ বলিতে থাকিত তখন ভীষ্মক কুমারীর অপূর্ব্ব ভাবাবেশ হইত। শুনিতে শুনিতে বালিকা এমনই মোহিত হইয়া যাইত, যেন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ হইয়া তাহার নয়নের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইত, কভু বা সর্ব্বশোভাময়ীর পূর্ণচন্দ্র-বিনিন্দি বদনমণ্ডল গম্ভীরভাব ধারণ করিত, কখনও বা অলক্তপ্রভ ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয় মৃদুহাস্যে ঈষদ্ ভিন্ন হইয়া স্থিরাকাশে চপলা চমকের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভায় মুগ্ধ করিত; আবার কদাচিৎ বা নীলোৎপলনিভ বৃহৎ নীল চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া যাইত।

মহারাজ ভীষ্মক তনয়ার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন। উপযুক্ত বস্তুতে অনুরাগ প্রত্যক্ষ করিলে কেই বা সন্তুষ্ট না হয়? রুক্মিণী বৃদ্ধ পিতার পূজার পাত্র পুষ্পপত্রাদি যথাস্থানে রক্ষা করিতেন। শুচি এবং সংযতা হইয়া গৃহ-প্রতিষ্ঠিতা কাত্যায়নীর নিকট যুক্তকরে কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণানুরাগ বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিতেন। প্রত্যহ সখিগণ-পরিবৃতা হইয়া ভক্তি গদগদ-চিত্তে পাষাণময়ীর অর্চ্চনা করিয়া যাইতেন এবং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেন 'মা, আমার সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছি। জননি, অম্বালিকে, লজ্জানিবারণি, অধমা তনয়ার সর্ব্বদোষ ক্ষমা কর মা। পাষাণি, আমার মান, সম্ভ্রম, লজ্জা তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম।"

রুক্মিণী ক্রমে ক্রমে সখীসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিল। রুদ্ধ কক্ষতলে ঊর্দ্ধনয়নে করুণ কণ্ঠে কহিত "ঠাকুর! তুমি অন্তর্যামী এই আশাতেই আমি বাঁচিয়া আছি। ভক্তি করিয়া পূজা উপহারে তোমাকে সন্তুষ্ট করিব, সে শক্তি আমার নাই। প্রভু, দীনার করুণ ক্রন্দন কি একদিন তোমার সিংহাসনতলে পৌঁছিবে না? আমি সকল সুখাশা পরিহার করিয়া তোমার চরণে আমার মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিলাম।"

ক্রমে ক্রমে রুক্মিণী কৃষ্ণানুরাগিনী হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ-কথায় তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইত। সখীগণকে অনবরত কৃষ্ণনাম গান এবং কৃষ্ণগুণাবলী বলিতে অনুরোধ করিতেন। রুক্মিণী চারিদিকে কৃষ্ণময় দেখিতে আরম্ভ করিলেন।

পিতাপুত্রে।

অস্তগমনোন্মুখ লোহিত রবির উজ্জ্বলালোকে ধরিত্রী সুবর্ণভূষণে বিভূষিতা। বিদর্ভনগরের রাজপ্রাসাদসমীপস্থ বৃক্ষাবলী হইতে পক্ষিগণ নানাশব্দে নীড়াভিমুখে ধাবমান হইল। যুবরাজ রুক্মী অনেকক্ষণ অবধি পিতার প্রতীক্ষা করিতেছেন। চিন্তিত এবং অন্যমনস্কে যুবরাজ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বাতায়ন-পথে রাজপথের দিকে তাকাইয়া আছেন। কোলাহলময় বিদর্ভ নগরীর সান্ধ্যশোভা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। কত লোক, কত উদ্দেশ্যে কত দিকে ধাবমান হইতেছে; হস্ত্যশ্বসঙ্কুল জনাকীর্ণ রাজবর্ত্ম

বহিয়া জনপদবাসী নিশ্চিন্তমনে আপনার কার্য্যে চলিয়াছে। এমন সময়ে মহারাজ ভীষ্মক ও তদীয় মহিষী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সকলে সুখাসীন হইলে যুবরাজ কহিলেন “মহারাজ আমি চেদিরাজের নিকট অশেষ প্রকারে সংকৃত হইয়া আসিয়াছি। বীর্য্যবান্ শিশুপাল আমার সুখের জন্য বহু আয়াস করিয়াছেন, আমার ক্ষণিক তুষ্টির জন্য রত্নময় গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া বিবিধ ভোক্ষ্য ভোজ্য বস্তু দ্বারা আমাকে পরিতোষ করাইয়াছেন। আমি ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য চেদিশ্বরের সেই সমস্ত প্রযত্ন স্মরণ করিয়া, প্রতিদান না করিতে পারিয়া অত্যন্ত লজ্জিতভাবে দিন যাপন করিতেছি।”

মহারাজ ভীষ্মক জিজ্ঞাসা করিলেন কি করিয়া তিনি এই আতিথ্যের জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চাহেন।

রুক্মী কহিলেন ‘মহারাজ, আমি শিশুপালকে বিদর্ভে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে বাসনা করিয়াছি। রাজ-অতিথির উপযুক্ত সম্মান তাঁহাকে প্রদর্শন করিয়া, আমাদের সর্ব্বলাবণ্যময়ী, অশেষগুণযুক্তা রুক্মিণীকে তাঁহার করে সম্প্রদান করিতে মানস করিয়াছি। মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ চেদিরাজ রুক্মিণীর অনুরূপ ভর্ত্তা হইবেন, সন্দেহ নাই।

রাজা—চেদিশ্বর শিশুপাল রুক্মিণীর উপযুক্ত বর সন্দেহ নাই, এবং তিনি তোমার প্রতি যেরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে পুরস্কৃত করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু রুক্মিণী সম্প্রদান বিষয়ে আমি এখন কিছু বলিতে পারি না।

রুক্মী বিমর্ষ হইলেন; কহিলেন আমাদের সহিত শিশুপালের চিরকালের মিত্রতা; রুক্মিণী সম্প্রদান করিলে তাহার ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে সন্দেহ নাই। বিশেষ উপকারীর প্রত্যুপকার করা ক্ষাত্র ধর্ম্ম। শিশুপাল আমার মহোপকারী বন্ধু; রুক্মিণী বিবাহের উপযুক্তা হইয়াছে। তাহার বিবাহ দিতেই হইবে। যাহাকে অন্যকেই সমর্পণ করিতে হইবে, তাহাকে কেননা বন্ধুহস্তে প্রদান করিয়া সৌহার্দ্দ দৃঢ় করি বুঝিতে পারি না। মহিষী এইবার কথা কহিলেন। তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎস রুক্মী, রুক্মিণী বিবাহোপযুক্তা হইয়াছে, তাহার জন্য আমারা চিন্তিত হইয়াছি। রুক্মিণী এখনও বালিকা, বিবাহের কথা হইলে বৃহৎ নীল চক্ষু দুইটী আমার চক্ষুর উপর স্থাপন করিয়া চাহিয়া থাকে, আমি তাহা দেখিয়া সকল ভুলিয়া যাই। সখী চঞ্চলা কহিল ‘রুক্মিণী দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের বিষয় শুনিতে বড় ভালবাসে, কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে তাহার বিশাললোচনদ্বয় জলে ভরিয়া যায়, পথিক পথ দিয়া কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে যায়, তাহা শুনিতে শুনিতে বালিকা সংসার বিস্মৃত হয়।’ আমি মনে করিতেছি রুক্মিণীকে কৃষ্ণকরে অর্পণ করিব। ক্রোধে অধীর হইয়া রুক্মী কহিল “জননি, কৃষ্ণ কি আমার ভগিনী বিবাহ করিবার উপযুক্ত? মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রভার ন্যায় যাহাদের কুলের প্রতিভা, তাহারা কিনা গোপের নন্দনকে কন্যাদান করিবে? কুক্কুর কি কখনও

যজ্ঞের হবি ভোজনের উপযুক্ত? মগধপতি জরাসন্ধের ভয়ে যে মথুরা ছাড়িয়া পলায়ন করে, সেই কাপুরুষকে কন্যাদান করিবে মা?"

মহারাজ ভীষ্মক কহিতে লাগিলেন "বৎস রুক্মী, অধীর হইও না। বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে পরিণামে সন্তাপ পাইতে হয় না। বিশেষতঃ রুক্মিণী তোমার বড় আদরের, বড় প্রিয়। ধনে, মানে, বিদ্যাবুদ্ধিতে, তেজ এবং বীর্য্যে শ্রীকৃষ্ণই এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বালক কৃষ্ণ কত দৈত্যদানব বিনাশ করিয়াছেন, এবং ধনুর্যজ্ঞে মহাবল কংশকেও বধ করিয়াছেন। নীলোৎপলদল-শ্যাম কৃষ্ণসুন্দর মূর্ত্তিটি কি মনোহর। তাঁহার করে রুক্মিণীকে প্রদান করিতে পারিলে আমি আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিব।"

যুবরাজ ক্রোধান্বিত হইলেন। পিতাপুত্রে অনেক কথা হইল। শেষে রাজা কহিলেন—"আচ্ছা, বাগবিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই। আমি স্বয়ম্বর ব্যপদেশে সমগ্র রাজন্যমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিব। সমাগত ভূপালগণ মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা কন্যা বরণ করিবে। তাহাই ক্ষত্রিয়গণের চিরন্তন প্রথা।"

রুক্মী উঠিয়া গেলেন। সমস্ত কথা গোপনে প্রিয় বন্ধু শিশুপালকে জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহাকে বরবেশে সাজিয়া আসিতে লিখিলেন। তিনি যেরূপে পারেন তাঁহার হস্তেই সর্ব্বশোভাময়ী রুক্মিণীকে সম্প্রদান করিবেন বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ সন্দেশ।

"সখি, শ্রীকৃষ্ণ বিনা যে সব শূন্যময় দেখি" রুক্মিণী কাঁদিয়া কহিলেন 'আমার উপায় হবে কি?' "আমি যে তাঁর শ্রীচরণসরোজে মনঃ প্রাণ সকলই সমর্পণ করিয়াছি।"

সখিগণ প্রমাদ গণিল। যুবরাজের আরক্তিম নয়ন দেখিয়া সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। এদিকে রুক্মিণীকেও আর ফিরাইবার উপায় নাই। তাহার কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান, কৃষ্ণ চিন্তা—পৃথিবী কৃষ্ণময় হইয়াছে। তাহার অন্তরে কালসোনা, বাহিরেও নবনীরদ বরণ। কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলা রুক্মিণী কখনও কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতেছেন—

অংসালম্বিতবামকুণ্ডলভরং মন্দোন্নতভ্রূলতং
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিতকোমলাধরপুটং সাচি প্রসারেক্ষণম্।
আলোলাঙ্গুলিপল্লবৈর্ম্মুরলিকা মাপূরয়ন্তং মুদা
মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গললিতং জানে জগন্মোহনম্॥

রাজ-নন্দিনী কত কি ভাবিতেছে, কত কি কহিতেছে। ঠাকুর যেন সব কথাই শুনিতেছেন।

সন্ধ্যা সমাগতা। সমস্ত দিন কিরণ প্রদান করিয়া সূর্য্যদেব বিশ্রামোদ্দেশ্যে অস্তগিরি অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিলেন। পশ্চিমাকাশ হিঙ্গুলবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে দুটী একটি করিয়া নক্ষত্র আকাশপথে উঁকি মারিতে লাগিল। সন্ধ্যার ঘনছায়া বিদর্ভ নগরী আচ্ছাদিত করিল। দেবমন্দির

হইতে কাঁশর, ঘণ্টা, শঙ্খ প্রভৃতি আরত্রিকের সময় সূচনা করিতে লাগিল। তখন রুক্মিণীর প্রিয়সহচরি চঞ্চলা কহিল—

রাজকুমারি, শুনেছ কি ? যুবরাজ তোমার জন্য শিশুপালকে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। শিশুপালকে যখন পতিরূপে বরণ করিতে হইবে, তখন আর বৃথা কাঁদা কাটার ফল কি ?"

অপরা সখী চপলা কহিল—আচ্ছা ভাই, আমাদের সখীর মন যে দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কি যুবোরাজকে কেহ বলিয়াছে ?

চঞ্চলা—মহারাজ এবং মহারাণী আপনারাই কহিয়াছিলেন, তাহাতে কুমার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "আমি যেরূপে পারি রুক্মিনীকে শিশুপালকে সম্প্রদান করিব ; শিশুপাল আমার প্রাণের বন্ধু।"

চপলা—ওমা, তবে কি হবে ?

চঞ্চলা—মহারাজ কহিলেন 'আমি সমস্ত নৃপতিমণ্ডলীকে একাকিনী স্বয়ংবর বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া আমন্ত্রন করিব। কন্যা আপনার অভীষ্টবর মনোনীত করিবে।' কিন্তু কুমার তাহাতে রাজী হইলেন না। শিশুপালের সহিত রুক্মিনীর বিবাহ দিতে তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। সখি, আমি বুঝিতে পারি না, এ বিপদে কি করা উচিত।

শুনিতে শুনিতে রুক্মিনীর কমল নয়নে জলধারা বহিল। তিনি কহিলেন " সখি, যাঁহার নাম স্মরণে বিপদ দূরে যায়, আমি তাঁহার পদে স্মরণ লইয়াছি। আমি কি ছার শিশুপালের ভয়ে ভীত ?

" শত জন্ম পরে যদি পাই লো তাঁহারে।
করিব তাহাই সখি প্রতিজ্ঞা আমারে ॥"

আমি যদি কায়মনোবাক্যে কখনও দেব সেবা করিয়া থাকি, আমি যদি কখনও ভক্তি পূর্ব্বক গুরু-অর্চ্চনা করিয়া থাকি, তবে সেই ব্রতোপবাস নিয়ম এবং সংযমের ফলে আমি আমার প্রাণবল্লভকে লাভ করিব। নতুবা,

"নিত্য ব্রত উপবাস করি আচরণ।
দেহ ক্ষীন করি দিব প্রাণ বিসর্জ্জন ॥

তখন সখিগণ মিলিয়া পরামর্শ করিতে বসিয়া গেল। বহুকথা হইল। শেষে চঞ্চলা কহিল 'রাজকুমারি, শ্রীকৃষ্ণকে একখানি প্রনয়জ্ঞাপক পত্রে তোমার অবস্থা জ্ঞাপন কর। তিনি অনাথের নাথ, তোমার প্রতি সদয় হইলে, এই বিপদ হইতে তোমাকে উদ্ধার করিবেন।' 'আমি আমাদের অনুগত সুদেব ব্রাহ্মণকে তোমার লিপি-বাহক করিয়া পাঠাইব ; ব্রাহ্মণ অর্থলোভে নিশ্চয়ই স্বীকৃত হইবে।

অপরা সখী কহিল 'ঠিক বলেছিস্ ভাই ; শ্রীকৃষ্ণ বিপদ-ভয়বারণ ; তাঁকে সংবাদ দিলে নিশ্চয়ই এ বিপদে তিনি রক্ষা করিবেন।

তখন সকলে মিলিয়া পত্র লিখিতে বসিয়া গেল, এবং বহুচেষ্টার পরে অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া রাজকুমারী পত্র সমাপন করিল,

" আমি শুনেছি পুরানে ও রাঙ্গা চরণে যে জন স্মরণ লয়,
তুমি বিষম সঙ্কটে আসিয়ে নিকটে দেও হে তারে পদাশ্রয়।
এই বিপদ সময় হইয়ে সদয় যদি আমারে না তারিবে,
তবে এই ত্রিভুবনে দয়াময় নামে চিরকলঙ্ক রহিবে।

বালিকাগণের অনুনয়ে এবং বিলক্ষণ পারিশ্রমিকের আশায় ব্রাহ্মণ সম্মত হইল। বহুকষ্ট করিয়া পদব্রজে দ্বারবতী পৌঁছিল। সেখানে ব্রাহ্মণের অবারিত দ্বার, সুতরাং সুদেবকে কষ্ট করিতে হইল না। দ্বারকানাথ ব্রাহ্মণের বহু প্রকারে সেবা এবং পরিচর্য্যার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পত্র-পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি নিকটস্থিত মহাবীর সাত্যকিকে কহিলেন "আগামী কল্য চতুরঙ্গ সেনাদলে বিদর্ভে যাইতে হইবে, তুমি তাহার বন্দোবস্ত কর।"

বরবেশে শিশুপাল।

চেদিরাজ-সভায় আজ বড় ধুম। মহারাজ শিশুপাল, বিদর্ভের যুবরাজ রুক্মী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। লোকললামভূতা ত্রিলোকমোহিনী রুক্মিণী শিশুপাল-মহিষী হইবেন। পূর্ণিমা রজনীতে মহাসিন্ধুর জলোচ্ছ্বাস যেমন চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী, তেমনি শিশুপালের হৃদয়েও আনন্দ আজ আর ধরিতেছে না। হৃদয়তন্ত্রীতে ঘাত প্রতিঘাত করিয়া অপূর্ব্ব সুখের সুর বাজিয়া উঠিতেছে। সর্ব্বলাবণ্যময়ী রুক্মিণী তাঁহার ভার্য্যা হইবেন, শিশুপাল সুখের স্বপ্ন দেখিয়া দেখিয়া জগত ভুলিয়া গেল।

কথা উঠিল, কি বেশে কুণ্ডীন নগরে যাওয়া উচিত। কেহ কহিল চতুরঙ্গ সেনাদলে সাজিয়া পদশব্দে মেদিনী কাঁপাইয়া যাওয়া যাক, কেহ পরামর্শ দিল অসংখ্য হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল বাহিনী সজ্জিত করিয়া নানাবাদ্য কোলাহলে দিকসকল মুখরিত করিয়া যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তখন শিশুপালের এক প্রিয়বন্ধু ধীরে ধীরে কহিল এ স্বয়ম্বর ত উপলক্ষ মাত্র; মহারাজেরই ত বিবাহ, সুতরাং বরবেশে সাজিয়া যাওয়াই সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত। আপনি

বরবেশে রত্নাভরণে ভূষিত হইয়া যাইবেন। একে আপনার পরমসুন্দর রূপ কণককিরীটহারে এবং মণিরত্নাদিতে বিভূষিত হইলে, আপনি দ্বিতীয় রতি-পতির ন্যায় শোভমান হইবেন। তখন সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা রুক্মিণী বুঝিবেন আপনাদের উভয়কে একত্র করিবার জন্যই বিধাতা এমন সকল সৌন্দর্য্যের আধার গড়িয়াছেন।'

রাজমন্ত্রী কহিলেন "মহারাজ নিশ্চয়ই সৈন্যসামন্ত লইয়া যাইবেন। স্বয়ম্বর স্থানে কন্যা স্বয়ংবর মনোনীত করিলেও প্রায়শঃই কলহ বিবাদ এবং যুদ্ধবিগ্রহাদি উপস্থিত হইয়া থাকে, সেজন্য প্রত্যেকেরই প্রস্তুত হইয়াই গমন করা উচিত। বিশেষতঃ আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে বৃদ্ধরাজা ভীষ্মকের মত অন্যরূপ।

শিশুপাল হাসিতে হাসিতে কহিল, "মন্ত্রী উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ করিতেছ কেন? যুবরাজ রুক্মী আমার প্রাণের সুহৃদ, বিশেষতঃ মগধেন্দ্র জরাসন্ধ প্রভৃতি আমার সহায়; আমি কি পৃথিবীতে কাহাকেও ভয় করি? মহারাজ ভীষ্মকের অমত হয়, আমি ক্ষত্রিয় প্রথানুযায়ী বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া লইয়া আসিব। তুমি বাহিনী সজ্জিত হইতে আদেশ কর।"

শিশুপাল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পরিচ্ছদাগারে গমন করিয়া কত রকম বেশ পরিধান করিলেন, দর্পনে প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া কিছুতেই মন উঠিল না। বিচিত্র কাঞ্চনময় অলঙ্কারনিচয়, রত্নময় হার, প্রবালমণিরঞ্জিত কণ্ঠাভরণ, কিরীট, কুন্তল, কর্ণাভরণ, কিছুতেই মন উঠিল না। বহুদেশ হইতে আনীত, উপায়ণপ্রাপ্ত বিবিধ প্রকার বস্ত্র আনীত হইল; মণিরত্নাদির প্রভায় পুরী রঞ্জিত হইল, কিন্তু শিশুপালের কিছুতেই মন উঠিল না। ললাটে স্বেদবিন্দু আবির্ভূত হইল; কেমন করিয়া শোভনা রুক্মিণীর মনোহরণ করি-বেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। শেষে বহুচিন্তার পর বিবাহের উপযুক্ত পট্টবাস পরিধান করিয়া যাওয়াই ঠিক বোধ হইতে লাগিল। তখন স্বহস্তে আপনাকে সুবেশ করিতে যত্নবান হইলেন।

সুবৃহৎ দর্পণ পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া শিশুপাল স্বহস্তে বরপাত্র সাজিতে লাগিলেন। চন্দন, কস্তূরী প্রভৃতি কত যে অঙ্গে লেপন করিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই; তথাপি মন সন্তুষ্ট হইল না। পরিশেষে স্ত্রীআচারের জন্য রমণীগণ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শিশুপাল কোন রূপে প্রসাধনাক্রিয়া সমাপন করিলেন।

মুহুর্ম্মুহুঃ, হুলুধ্বনি. জয়ধ্বনি এবং শঙ্খ, দুন্দুভিনাদের সহিত মহাবল পরাক্রান্ত নরাধিপ শিশুপাল আকাশমণ্ডল ধূলিপটলাচ্ছন্ন করিয়া চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে রুক্মিণী-পাণিগ্রহণার্থী হইয়া যাত্রা করিলেন। শব্দকোলাহলে ভীত হইয়া বায়সকুল অনবরত কঠোর রব করিতে লাগিল।

স্বয়ম্বর।

মহারাজ ভীষ্মক শুভ কাল, পুণ্য তিথি ও পবিত্র ক্ষণে সমাগত মহীপালগণকে বিচিত্র স্বয়ম্বর সভায় আহ্বান করিলেন। তৎশ্রবণ মাত্র রাজগণ অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া চারুদর্শনা রুক্মিণীলাভ আশায় তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। কেশরী যেমন গিরিমধ্যে প্রবেশ করে, মণিকুণ্ডলালঙ্কৃত স্রক্‌চন্দনাদিপরিশোভিত প্রিয়দর্শন নৃপতিবৃন্দ তদ্রূপ কণকস্তম্ভসংযুক্ত, তোরণরাজিবিরাজিত রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া বহুবিধ বিচিত্র আসনে উপবেশন করিলেন। যেমন ব্যাঘ্র সমূহে পর্ব্বতকন্দর পূর্ণ হয়, তেমনি সেই সমিতিমণ্ডপ ভূপালগণে পরিবৃত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিল। নির্ম্মল নভোমণ্ডলে নক্ষত্র শোভার ন্যায় হেমাঙ্গধারী সুচারুনয়নালঙ্কৃত পার্থিবগণের মুখমণ্ডল বিরাজমান হইতে লাগিল।

অন্তঃপুরে সখীগণপরিবৃতা রুক্মিনী শ্রীকৃষ্ণদর্শনাশায় নিরাশ হইয়া প্রাণপণ করিয়া বসিয়াছেন। সখিগণ বুঝাইতেছে, অশেষরূপ সান্ত্বনা দিতে যত্নবতী হইতেছে। রুক্মিনীর মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। রুক্মিণী শেষে কাঁদিয়া ২ কহিলেন "সখি, তিনি যে কাঁদাইতেই বড় ভাল বাসেন। না কাঁদিলে বুঝি তাঁর দয়া হয় না, বুঝি অশ্রুজলে মনের মলিনতা ধৌত না হইলে তাঁহার দয়া না। কিন্তু সখি, আমার যে আর সহে না। মনঃ প্রাণ যাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছি সেই কৃষ্ণশূন্য জীবন রাখিয়া ফল কি সখি। আমার কৃষ্ণসেবায় উৎসর্গীকৃত দেহ শিশুপাল ধারণ করিবে? সিংহের উপভোগ্য বস্তু শৃগালে গ্রহণ করিবে।" রুক্মিণী শিশুপালের কথা স্মরণ করিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। দাম্ভিক শিশুপাল, মগধপতির সহায়তায় মহাবল, আবার রুক্মী তাহাতে মিলিত হইয়াছে। কোমলহৃদয়া রাজকুমারী ছিন্নমূল ব্রততীর ন্যায় মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

চেতনা পাইয়া কহিলেন, "সখি, আমি কি অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলাম। 'চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী' শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া আমাকে অভয়

দিতেছেন।" রুক্মিণীর চক্ষে জলধারা বহিল। তিনি আবার কহিলেন "সখি আহা কি দেখিলাম

"চন্দ্রকচারু ময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশম্
প্রচুরপুরন্দরধনুরণুরঞ্জিত মেদুরমুদিরসুবেশম্ ॥"

হবে কি সখি? আমার এই সুখস্বপ্ন সফল হবে কি। নাথ, যেন শত বীণার ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, 'প্রেয়সি, ভীতা হইও না, আমি তোমাকে গ্রহণ করিব বলিয়া আসিয়াছি।'

মহাবেগে অতি ক্রোধে রুক্মী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ভগিনীকে সখিগণ মধ্যে রোদনপরায়ণা প্রত্যক্ষ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া কহিলেন "সমস্ত নরপালগণ সভায়; এখনও এখানে বিলম্ব কেন? অবিলম্বে রুক্মিণীকে লইয়া তোমরা আগমন কর।' বলিয়া রুক্মী চলিয়া গেল। সখিগণ মধুর বচনে রুক্মিণীকে প্রবোধ দিল, রুক্মিণী শূন্যমনে পতি অন্বেষণে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন।

সমবেত নৃপালমণ্ডলী নির্নিমেষ লোচনে, অলৌকিক রূপযৌবনসম্পন্না কন্যারত্ন রুক্মিণীকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টি ক্ষণকালের নিমিত্ত ও লক্ষ্যান্তরে পরিচালিত হইল না।

রুক্মিণী রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া আকুল নয়নে চারিদিকে তাকাইয়া স্বপ্নদৃষ্ট মদনমোহন রূপের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার চঞ্চল নয়নযুগল যেন কাহার সন্ধানে চারিদিকে ফিরিতেছে। শিশুপালের বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল, তাহার সর্ব্বশরীর স্বেদসিক্ত হইল। সভায় শ্রীকৃষ্ণ না দেখিয়া রুক্মিণী চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। বিশাল লোচনদ্বয় বর্ষাবারি-বিধৌত কমলিনীর ন্যায় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বড় কাতরে প্রাণের জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া ডাকিল "কোথায় তুমি লজ্জানিবারণ, অগতির গতি! আমি যে তোমার আশায় প্রাণ এখনও রাখিয়াছি। প্রভু, জীবন পরিত্যাগ করিব, মৃত্যুকালেও তোমাকে দেখিলাম না, এই বড় দুঃখ মনে রহিল।" রুক্মিণীর পদতল হইতে যেন ধরিত্রী সরিয়া গেল, আকাশমণ্ডল কপিশ বর্ণ ধারণ করিল। রুক্মিণী সংজ্ঞাহীনা হইল।

অকস্মাৎ সভা মধ্যে মহাকোলাহল শব্দ উঠিত হইল। অদৃষ্টপূর্ব্ব কেহ আসিয়া রাজকুমারীকে রথে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। রাজগণ যে যাহার আয়ুধ গ্রহণ করিয়া ভীমরবে ভীষণ বেগে পশ্চাৎ ২ ছুটিল। গরুড়ধ্বজ

দেখিয়া কাহারও আর বুঝিতে বাকী রহিল না। শিশুপাল মহাক্রোধে বহির্গত হইল। জরাসন্ধ গর্জ্জিয়া কহিল,

"আরে মূঢ় মন্দমতি, ওরে দুরাচার।
চুরি করি লহ কন্যা অগ্রেতে আমার।"

আমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধার্থে তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

"শৃগালের প্রায় কেন কর পলায়ন।
যুদ্ধ জিনি লহ কন্যা করি প্রাণপণ॥"

ক্ষত্রিয় যুদ্ধে আহূত হইলে প্রাণ গেলেও প্রত্যাখ্যান করে না। শ্রীকৃষ্ণ রথ ফিরাইলেন। তখন যদুবল গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইল, বলদেব, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি মহারথীবৃন্দ সিংহনাদ করিয়া যুদ্ধেচ্ছু নৃপতিমণ্ডলীকে আক্রমণ করিলেন। তুমুল সংঘর্ষ আরব্ধ হইল। রুক্মী সকলকে পশ্চাদ্পর করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রথ অনুসরণ করিল এবং তস্কর বলিয়া গালি দিল। শৃগালের শব্দে যেন সিংহ নেউটিল।" শ্রীকৃষ্ণ রথ ফিরাইয়া রুক্মীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে রাজগণ কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া যাদবগণের অপ্রমেয় পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। রুক্মী প্রাণপণ করিয়াছে। ভগিনীকে চুরি করিয়া লইয়া যায়, বিশেষ প্রিয় বন্ধুবর্গের সমক্ষে। সহস্র বৃশ্চিক যেন সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিতে লাগিল। রুক্মী আপ্রাণ চেষ্টায় বিবিধ শায়ক বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মহাবল শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল মধ্যেই তাহাকে অস্ত্রশূন্য করিলেন, এবং মহাক্রোধে তাহার শিরচ্ছেদন করিবার জন্য শাণিত খড়্গ উত্তোলন করিলেন।

এমন সময় প্রিয়দর্শনা রুক্মিণী যুক্ত করে সজলনয়নে শ্রীকৃষ্ণের নিকট দাঁড়াইয়া সহোদরের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ খড়্গ ফেলিয়া দিয়া আয়তলোচনা সর্ব্বশোভাময়ী রুক্মিণীকে বক্ষে ধারণ করিলেন। সুখের আতিশয্যে ভীষ্মক-দুহিতার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। 'আমি ক্ষমা করিলাম', এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বৈদর্ভীকে বাহুপাশে বদ্ধ করিলেন। নিবিড় জলদরাশিতে যেন সৌদামিনী শোভিল। সাধনা সিদ্ধির সহিত মিলিত হইল।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক বি, এ।

রেজেষ্টরী নং A362.

বতীয় বর্ষ] ১৩১৪ সাল, অগ্রহায়ণ ও পৌষ। [অষ্টম ও নবম সংখ্যা

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

বিষয়।

কতকগুলি অসুবিধায় পড়িয়া উৎসব বাহির হইতে বিলম্ব হইয়া গেল। মাঘের সংখ্যাও বাহির হইতে বিলম্ব হইতে পারে। এতদিন কলিকাতা হইতে কাগজ বাহির হইত, এখন আমরা ৺কাশীধাম হইতেই কাগজ বাহির করিব। ইহাতে ভবিষ্যতে কাগজ নিয়মিত সময়েই বাহির হইবে। ইতি—

সম্পাদক

উৎসব।

ওঁ শ্রী আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২য় বর্ষ]   ১৩১৪ সাল, অগ্রহায়ণ ও পৌষ।   [৮ম ৯ম সংখ্যা

একা।

সুখেতে কারো সাধিনি বাদ,
চলেছি আমি একা।
দাঁড়াতে নারি, সহেনা দেরি
পথটি বড় বাঁকা।
ওগো, চলেছি আমি একা।

আপন বোঝা আপনি বহি',
চলিনু ধীরে পথ বাহি',
ওদিকে আর ফিরে না চাহি—
সব শূন্য ফাঁকা।
ওগো, আমার ব্যথা আমি বুঝি,
চলেছি আমি একা।

জীবনভরা আর্ত্তনাদ,
মরণে মম বিষাদ,
চরণে সবে গড়ায়ে দাও—
ব্যথিতে কেন রাখা?
ওগো, আমার ব্যথা আমি বুঝি,
চলেছি আমি একা।

সন্ধ্যা দেখ ঘনায়ে আসে,
প্রকৃতি খল খল হাসে,
নবীন মেঘে উজল ছটা
সিন্দুর ঘনরেখা।
ওগো, বুঝেছি আমি ফুরাল দিন—
আমারে কেন ডাকা ?

চাহিনা কিছু রত্ন ধন,
চাহিনা রাজসিংহাসন,
আমার শিরে শোভিত
রাজ-ছত্র তরুশাখা।
ওগো, বুঝেছি আমি ফুরাল দিন—
আমারে কেন ডাকা ?

শ্রীহরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ইন্দ্রিয়ারাম ও আত্মারাম।

দুঃখ পাও তাত দেখিতেছি। সকল দিন ত এক রকমে কাটে না। যখন কিছু দেখিয়া একটা ভাব পাও—তখনও বিচার কর ভাবটুকু কতক্ষণ থাকিবে ? না হয় কবিতাই লিখিলে—তাহাতে হইল কি ? কত কবিতাই ত লেখা হইল কিন্তু দুঃখ কি গেল ? কাহাকে দেখাইতে লিখিবে বল ? না হয় কেহ দেখিল তাহাতে কি জুড়াইলে ? ভাব ত ক্ষণকালের জন্য আসিল গেল ইহাতে ত শান্তি মিলিল না। নিজের মনের ভাব নিজে দেখিবে বলিয়া না হয় লিখিয়া রাখিলে, তাহাতেও বল কোন্ ফল লাভ করিলে ? দুঃখের প্রতিকার যেখানে, সেখানে না খুঁজিয়া অন্য চেষ্টা করিলে কি হইবে ?

দুঃখ দেয় মন। যেই কেন হওনা—সাধক সাধিকা, প্রেমিক অপ্রেমিক, সাধু অসাধু, গৃহী গৃহত্যাগী, রাজা রাণী, সধবা বিধবা—যেই কেন হওনা বেশ করিয়া দেখ বুঝিবে দুঃখ দেয় মন। মনের উপর নজর না রাখিতে পার—কাহারও দুঃখ দূর করিতে পারিবে না। মনের উপর নজর না রাখিতে পার সাধন ভজন ও ঠিক হইবে না। রোজ করিতেছ, রোজ দুঃখ থাকিয়া যাই-তেছে। হট্টগোল করিয়া অন্য কর্ম্ম করিয়া মনকে একটা মায়িক তৃপ্তিতে ব্যাপৃত রাখিতেছ কিন্তু ইহাতে তোমার গন্তব্য স্থানে যাওয়া হইবে না।

মনই তোমার প্রবল শক্তি। এই শক্তিকে আয়ত্ব কর, দুঃখ দূর হইবে।

মনই তাঁহার ভর্গ। বরণীয় ভর্গই মনের নিবৃত্তি ভাগ—সাধারণ ভর্গ মনের প্রবৃত্তি অংশ। হে বরণীয় ভর্গ আমাকে—আমার বুদ্ধিকে তোমার শান্তরাজ্যে লইয়া চল, আমি আপনি পারিতেছি না—কোথায় তুমি নাই? যাহা কিছু দেখি সবই দেবের শক্তি বটে। যেখানে প্রবৃত্তি লাফালাফি করিতেছে সেখানেও মূলে বরণীয় ভর্গ আছে, নিবৃত্তি আছে। তাই যাহাকে দেখ না কেন সকলকেই বলিতে পার—আমি তোমার আজ্ঞামত চলিতে প্রাণ পণ করিতেছি—হে আকাশ, হে বায়ু, হে জল, হে পৃথ্বী, হে অগ্নি, হে মনুষ্য, হে পশু, হে পক্ষী, হে জল, বৃক্ষলতা সবাই তোমরা তাঁহার শক্তি সন্দেহ নাই; হে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র তোমরা সকলেই তার শক্তি—তাই আমায় তোমরা পথ দেখাইয়া লইয়া চল—আমি এক ভাবে চলিতে পারি না। ইহাই উৎকৃষ্ট উপাসনা। মনও সেই দেবতার শক্তি।

মনই দুঃখ দিতেছে সত্য—মনকেই প্রার্থনা করিতে হইবে। মন তোমার খেলা আর আমি সহ্য করিতে পারিনা—তুমি আমায় আমার প্রিয়দর্শনের কাছে লইয়া চল।

মনই আমার প্রকৃতি। এই প্রকৃতি পুরুষের বক্ষে নাচিতে ছিল। মন নাচে চৈতন্যের উপরে। চৈতন্য নাচেন না—এই নৃত্য পুরুষ ছাড়িয়াই হয়। এই নৃত্যই ব্যভিচার।

মনের চেতন অংশই পুরুষ। জড় অংশ প্রকৃতি। পুরুষের উগ্র চিন্তায় প্রকৃতির ব্যভিচার শান্ত হয়।

প্রবৃত্তি (চঞ্চল মন) দৃষ্ট হইল—নিবৃত্তি আর কিছুই প্রথমে পারুক আর না পারুক, শুধু চঞ্চল মনের চাঞ্চল্য স্থির হইয়া দেখিল। নিবৃত্তিই বৈরাগ্য। দেখিতে দেখিতে বৈরাগ্য আসিল। মন নৃত্য ছাড়িল—ছাড়িয়া ডুবিল নিবৃত্তি মার্গে। প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে শান্ত হইল।

কর্ম্ম করা হয় কর্ম্মত্যাগের জন্য। প্রবৃত্তিমার্গে মনই কর্ম্ম করে। সে কর্ম্ম স্বাভাবিক। এই গুলি ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম—রিপুর কর্ম্ম। এই স্বাভাবিক কর্ম্ম মৃত্যু।

প্রবৃত্তি—নিবৃত্তিমার্গে বেদবোধিত কর্ম্ম—ইহাও অবিদ্যা সত্য—কর্ম্মমাত্রই অবিদ্যা—তথাপি বেদবোধিত অবিদ্যা-দুষ্ট কর্ম্ম শুভ পথে লইয়া যায়। খাঁটি নিবৃত্তি মার্গ কর্ম্ম ছুটাইয়া অবিদ্যার হস্ত হইতে রক্ষা করে। অবিদ্যা দ্বারা বিদ্যা লাভ হয়। বিদ্যা লাভ হইবামাত্র প্রকৃতি পুরুষের সমান চিত্তবৃত্তির

সঙ্গম-আস্বাদনজনিত যে সুখ সেই সুখই চিত্তাকাশে ভোগ হয়। অন্য সমস্ত সুখ মহাকাশে ভোগ হয়। স্থূল সুখের কামনা যতদিন থাকে ততদিন দুঃখ দূর হয় না—চিত্তাকাশে যে সুখভোগ হয় তাহাই ভক্তিযোগ—ইহাই নিত্য-ধামে লইতে পারে।

বড় দরকারী কথা এই—সমান চিত্তবৃত্তির সঙ্গম-আস্বাদন-জনিত সুখ। প্রকৃতি পুরুষের যথার্থ মিলন ইহা—এই মিলনে নিত্য সুখ প্রকাশ হয়।

আর ইন্দ্রিয়সুখ আগমাপায়ী। মূঢ় লোকে মনে করে লাখ লাখ যুগ বুঝি হিয়ায় হিয়ায় রাখা যায়। ইন্দ্রিয়সুখ অবিরামে ভোগ হয়না। নিবৃত্তিমার্গের সুখই নিত্য সুখ—এই সুখই অবিরামে ভোগ হয়। শ্রীভগবান ইহা লক্ষ্য করিয়াই বলেন—ব্রহ্মসংস্পর্শে অত্যন্ত সুখ—"অত্যন্তং সুখমশ্নুতে।"

ব্রহ্মসংস্পর্শ-জনিত সুখ অপেক্ষা অত্যন্ত সুখ আর কিছুই নাই। হায়! আজকাল সভ্য জগৎ নিতান্ত অসভ্যের মত ইন্দ্রিয়সুখকেই স্থায়ী করিতে চায়—দীর্ঘকাল ধরিয়া ভোগ করিতে চায়—দীর্ঘকাল না পারিলে আবার পুনঃ পুনঃ ভোগ করিয়া প্রবাহরূপে নিত্যত্ব আনিতে চায়। সভ্য জগতের গর্দ্দভত্ব ইহা আর কোথাও নাই।

জগতের জন্য কার্য্য কর। কি কাজ করিব? যে কার্য্য করিলে আর এই দুঃখ থাকে না সেই কার্য্য দেখাও। কার্য্যত অনেক করিতেছে—আর শেষে মরিতেছে—শেষে মৃত্যুকালে আধুনিক কর্ম্মী কিছুই করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ করিয়া বিষম যাতনা পাইয়া মরিতেছে। জগতের দুঃখ কিন্তু কিছুই নিবারণ হইতেছে না। বড় বড় আজকালকার কর্ম্মবীর কত মরিল কিন্তু জগতকে কতটুকু দুঃখশূন্য করিয়া গেল? দুঃখ যে দিতেছে তাহার দিকে লক্ষ্য নাই শুধু কর্ম্ম কর—ইহা অপেক্ষা অজ্ঞান আর কি আছে? যেই দুঃখ দিতেছে সেই কর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া মৃত্যুমুখে ছুটাইতেছে।

যাহার স্বভাব আগমাপায়ী সে কি নিত্য সুখের সংবাদ দিতে পারে?

আপনার মধ্যে যে প্রকৃতির নৃত্য পুরুষের উপর হইতেছে, যে মনের চঞ্চলতা চৈতন্যের উপর হইতেছে—এই নৃত্য শান্ত করিয়া যিনি প্রকৃতি পুরুষের শান্তভাব অনুভব করিয়াছেন—পুরুষের সহিত মিলনে প্রকৃতি আপন সত্ত্বা হারাইয়া যখন একমাত্র পুরুষ সত্ত্বাতেই মগ্ন হইয়া থাকে—যখন আনন্দভাবে তন্ময় হইয়া যায়, শেষে এই আনন্দেই সমাধিমগ্ন হইয়া স্থিতিলাভ করে—আবার সমাধি ভঙ্গ করিয়া "স্বরমন্য মিবোল্লসন্" হয়—সমাধির পরেও সৃষ্টি হইলে সে

সৃষ্টিতে যখন খেলা মাত্র থাকে কোন অজ্ঞান থাকে না তখনই জীবনের উদ্দেশ্য সমাধা হয়।

সৃষ্টিই প্রকৃতির ব্যভিচার—প্রবৃত্তির নৃত্য। প্রকৃতির নৃত্য নৃত্যছন্দ মত ও হয় আবার বিকৃতিছন্দেও হয়। প্রকৃতছন্দে নৃত্য অমৃত মুখে, আনন্দ মুখে; বিকৃতছন্দে নৃত্য মৃত্যুমুখে—ইহাতে যে একটু সুখ থাকে সেটা সুখগন্ধি, দুঃখ মাত্র। এই সুখগন্ধি দুঃখের জন্য ছুটিয়া মরিবে কেন, ইহাতে জুড়াইতে পারিবে না।

প্রকৃতির বিকৃতছন্দ ভঙ্গ কর। পুরুষের উগ্র দর্শনে প্রকৃতির বিকৃত-ছন্দ ভাঙ্গিবে। মন বক্ষের উপরে যেমনভাবে নাচে নাচুক, তুমি মনকেই দেখিতে চেষ্টা কর—নিত্য কর্ম্ম করিতে করিতে মন যাহা করে দেখ, ইহাতেই মনের বিকৃতছন্দ ভাঙ্গিবে। প্রকৃতছন্দে নৃত্য আরম্ভ হইলে—ক্রমে সমস্ত স্পন্দন, সমস্ত নৃত্য শেষ হইয়া প্রকৃতি পুরুষের মিলন হইবে—অর্দ্ধনারীশ্বর অবস্থায় নয়নে নয়নাবদ্ধ মূর্ত্তিতে এক হইতে থাকিবে। কখন এক হইবে, কখন বহু হইয়া আপনার সহিত আপনি খেলা করিবে। অনন্তকাল ধরিয়া এই খেলা চলিবে, চলিয়াছিল, চলিতেছে।

দেখদেখি দেবাদিদেব কিরাতরূপ ধারণ করিয়াছেন আর সম্মুখে কিরাতিনী কি অপূর্ব্ব সাজে সাজিয়া আসিল দেখ—মস্তকে ময়ূর পুচ্ছ, পৃষ্ঠে কিরাতের তূণীর, চরণে নূপুর। কি মনোহর বেশ। দৃষ্টি কিন্তু ত্রিশূলধারী সর্পবিভূষিত, চন্দ্রকলা-মৌলিবদ্ধ কিরাতের উপর। ইঁহারাই জগতের কর্ত্তা—ইঁহারাই শক্তি শক্তিমান সর্ব্বব্যাপী হইয়াও কিরাত কিরাতিনী সাজিয়াছেন। তুমি যাহাই কেন হও না নিজ শক্তিকে না দেখা পর্য্যন্ত সাধ কিছুতেই মিটিবে না—ইহার উপরের খেলা কেহই বলেন না। সেখানে বুঝি খেলা নাই। ইহা বুঝিয়া ইহাতে যোগদান করিতে পারিলেই জীবিতোদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

নিজে ধন্য হইয়া সকলে যাহাতে ধন্য হইতে পারে তাহার জন্য লোককে কর্ম্ম করাইতে পারিলেই ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য হইল। প্রবৃত্তি মার্গে চলা বা চলিতে উপদেশ করা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধন নহে। প্রবৃত্তিমার্গ ইন্দ্রিয় সুখের জন্য।

তাই একবার ভাল করিয়া দেখ ইন্দ্রিয়সুখই অবলম্বন করিয়া আছ কি না? "অঘায়ু ইন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি" ইন্দ্রিয়ারাম যদি হও তবে তোমার জীবন পাপ জীবন—তোমার জীবন বৃথা। বড় সাবধান হইয়া দেখিও

যেন ইন্দ্রিয়ারাম না হইয়া যাও। আগমাপায়ী যাহা তাহা ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিপথে চল। ব্রহ্মসংস্পর্শ হউক। প্রকৃত সুখ আস্বাদিত হউক।

তাই আবার বলি নৃত্যকালি! একবার নৃত্য ছাড়। আর যদি নাচিতেই হয় তখন বিকৃত নৃত্য ত্যাগ করিয়া একবার না হয় ছন্দ মত নাচ, আমি স্বচ্ছন্দ হইয়া যাই। রজতমের নৃত্য ছাড়িয়া একবার না হয় সত্ত্বতালে নাচ। সর্ব্বাপেক্ষা এই ত্রিবিধ নৃত্য ত্যাগ করিয়া একবার নিবৃত্ত হইয়া স্বামীকে বক্ষে ধারণ কর।

এতদিন ত স্বামীর বক্ষে নাচিয়াছ এখন একবার স্বামীকে বক্ষে ধারণ কর। প্রকৃতি পুরুষকে বক্ষে ধারণ করিলেই প্রথমে অর্দ্ধনারীশ্বর—শেষে শুধু পুরুষ। প্রকৃতি-লবন পুত্তলিকার সমুদ্র মাফ করা মত, ছায়ার সূর্য্যালোক দর্শন করা মত, প্রিয়তমের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অভিন্নভাবে একবার আত্মসংস্থ হও। শিবশক্তি একত্র হউক—শক্তি শক্তিমান্ মিলিত হউক। ইহাই চরম আনন্দ। এক হইয়াও আবার খেলা পাইলে আবার প্রকৃতি গ্রহণ হইবে। প্রথম ঘুম ঘোরে আলিঙ্গন, তাহাই সুষুপ্তি—ক্রমে সূক্ষ্মভাবে চিত্তাকাশে শক্তি শক্তিমান, ক্রমে স্থূল জাগ্রত জগতে মহাকাশে খেলা। ছন্দমত খেলা করিতে পারিলে জাগ্রতস্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় যাওয়া আসায় ভার নাই।

তাই শাস্ত্র বলেন, শাস্ত্রমত শরীর বাক্য ও মনকে স্পন্দন করিতে পারিলেই সমস্ত পুরুষার্থ সিদ্ধি। আর বেদবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নাচিতে গেলে ছন্দ-ভঙ্গ হয়, তালমত নাচা হয় না এই রূপেই দুঃখ হইতে দুঃখান্তর পুনঃ পুনঃ যাওয়া আসা হইতে থাকে। তাই বলি মন নৃত্য ছাড়। ইন্দ্রিয়ারাম না হইয়া আত্মারাম হও। কবে হইবে?

বিজয়া।

(প্রাপ্ত)

"আগমনী" লিখিতে গিয়াও আমার "বিজয়া" লেখা হইয়া যায়। আমার বিজয়া বারমাস। তাই সময়ে বিজয়া হয় নাই, পাঠক পাঠিকাগণ যেন আমায় ক্ষমা করেন।

আজ তিন দিন গিরিরাণী বড় ব্যস্ত ছিলেন। বহু কষ্টে বহু সাধ্যসাধনায় হৃদয়ের ধন পাইয়া সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হইয়াছিল। রাণী একে একে উমাকে

সব দেখাইতেছেন, একে একে হর্ষ-গদ-গদ ভাবে আপনার দুঃখের কথা বলিতেছেন। একে শরৎকাল, তায় উমা আগমনে দশদিক্ আর ও নির্ম্মল হইয়াছে। রজনী গভীর, সমস্ত দিন উৎসবের পর হিমালয়পুরী এখন নিস্তব্ধ। মেনকার চক্ষে নিদ্রা নাই। পূর্ণ আনন্দে জড়তা কোথায়? জ্যোৎস্না-লোকে মেনকা উমাকে কোলে ধারণ করিয়া কত কথা কহিতে চান, আনন্দে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আইসে, উমার মুখের পানে অনিমিষ লোচনে চাহিয়া থাকেন, বলা আর কিছু হয় না। বহুক্ষণ পরে রাণী আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন মা, এই চাঁদ কতবার উঠিল, কতবার ডুবিল আমি তোমার আশা পথ চাহিয়া চাহিয়া দিন গণনা করি। তুমি যাহা ভালবাস, তোমার যাহা প্রিয়, আমি জীবন ভরিয়া তাহা সংগ্রহ করি। তোমার প্রিয় বস্তুগুলি আমি স্তরে স্তরে গুছাইয়া রাখি, সারাটি বৎসর ধরিয়া আমি তোমারই জন্য আয়োজন করি। দিন গণিতে গণিতে বাড়িয়া যায় তুমি আর এসনা, নিরাশায় বুক ফাটিয়া যায়, দেহ ভাঙ্গিয়া পড়ে, তথাপি জোর করিয়া সব করি। দেহত্যাগ ইহাত বড় সহজ কথা, কিন্তু মা! বলিতে কি, আমার এ দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না, কেন না এই ক্রোড়ে তোমায় একদিন ধারণ করিয়াছিলাম, আমি এই বক্ষে রাখিয়া তোমায় একদিন স্তনপান করাইয়াছিলাম, এই চক্ষু একদিন তোমায় মনমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, এই কর্ণ একদিন তোমার মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়াছিল। তুমিও একদিন মা ভিন্ন কিছু জানিতে না। হায় মা, সে দিন আমার কোথায় গেল? আমি না সাজাইলে তুমি সাজিতে না, আমি না খাওয়াইলে তুমি খাইতে না, আমি না আদর করিলে তোমার অভিমান ভাঙ্গিত না। বল মা এতদিন কেমন করিয়া ছিলে। আমি না হইলে তোমার যে ক্ষণকালও চলিত না, বল মা এ দীর্ঘকাল কেমন করিয়া থাক? পাষাণী, কেমন করিয়া বুক বান্ধিয়াছ? এ দুঃখিনীকে কি একেবারে ভুলিয়াছিলে? মাগো, তোর অভাবে আমার বড়ই যন্ত্রণা হয়, বল মা, আর আমায় ছেড়ে যাবিনি, বল মা, আর আমায় কাঁদাইবিনি, মা আমার যে আর কেহ নাই, বলিতে বলিতে মেনকা উমার কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন। ভক্তবৎসলা জগতজননী বড় আদর কোরে মার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া ডাকিলেন, মা! রাণী অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন সজল নয়নে উমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। যাঁর বিশ্ববিমোহিণী মায়ায় ব্রহ্মাণ্ড আবৃত, মেনকাকে ভুলাইতে তাঁহার কতক্ষণ। উমা আধ আধ স্বরে মায়ের গলা ধোরে হরের ঘরের কথা কতই কহিলেন।

বড় অভিমান কোরে বলিলেন মা, তুমি যে বড় সুখে থাক, তাহা আমি জানি, আমি ভিন্ন তোমার যে আর কেহ নাই, তাহা আমি বেশ জানি। কিন্তু মা তোমরাই ত দেখিয়া শুনিয়া আমায় পাগলের করে সমর্পণ করিয়াছ?

সে ভিন্ন আমার কেহ নাই, সেই সব, সে ছাড়া আমি এক দণ্ড থাকিতে পারি না, এ কথা মার নিকটে বলিতে বুঝি কেমন একটু বাধ বাধ হয়, কেমন আপনা হইতে একটু লজ্জা আইসে, তাই মা বলিলেন, মা "আমি বিনা পাগলের কেহ নাহি আর" মাগো,

আমি যদি যাই সোরে ক্ষণিকে প্রলয় করে,
শব প্রায় থাকে পড়ে, আসিতে পারিনে তাই,
কেঁদনা কেঁদনা তুমি, তোমারই আছি মা আমি,
স্মরিছে পাগল স্বামী এখন তবে মা যাই।

ভক্তের কথা কহিতে কহিতে মা বড় ব্যাকুল হইলেন।

কহিতে হরের কথা অভয়া চঞ্চল,
রোমাঞ্চিত কলেবর আঁখি ছল ছল।

হিমালয় কি মার ভক্ত নয়? ভক্ত সত্য। ভক্ত না হইলে মা জগতজননী আসিবেন কেন। যাঁহার জঠরে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড তিনি ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে অজ হইয়াও জন্মগ্রহণ করেন, নিরাকার হইয়াও ভক্তের মনমত রূপ গ্রহণ করেন, নিষ্কর্ম্মা হইয়াও সকল কর্ম্ম আচরণ করেন। হিমালয়ের মত ভাগ্যবান কে? ভগবান ব্যাস বলিয়াছিলেন—"অহো হিমালয়স্যাস্ত ধন্যোঽহসৌ ভাগ্যবানিতি, যস্যাস্ত জঠরে সন্তি ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ কোটয়ঃ। সৈব যস্য সুতা জাতা কো বা স্যাত্তৎসমো ভুবি॥ মায়ে ঝিয়ে কত কথাই হইল। কথায় কথায় নবমী রাত্রি শেষপ্রায়, সহসা বিদায়-বাজনা বাজিয়া উঠিল। গিরিরাণী একবারে চমকিয়া উঠিলেন। দুই হস্তে উমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া মা, মা, করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মেনকা জানিতেন মেয়ে বড় একগুঁয়ে, যা ধরে তাই করে, উমার তপস্যার কথা মনে হইল। আর বাধা দিলেন না। অন্তরে একটু সুখও হইল, উমার সুখই আমার সুখ, উমার আনন্দই আমার আনন্দ। উমা যেখানে সুখে থাকে থাকুক, ইহা স্থির করিয়াও মার মন প্রবোধ মানে না, তবুও হৃদয় বাঁধিতে পারেন না। উমার বিদায় এ ভাবিলেও যেন অন্তর খসিয়া যায়, মন আপনা হইতে ব্যাকুল হয়। পুরনারী ও উমার শৈশব সঙ্গিনীগণ উমাকে চারিদিকে ঘেরিয়া রোদন করিতেছেন। সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে উমার মুখে মিষ্টান্ন ও সুবাসিত তাম্বুল প্রদান করিতেছেন, কেহ বা অতি যত্নে

মার নূপুরশোভিত যাবক-চুম্বিত শ্রীপাদপদ্মের ধূলি ঝাড়িয়া দিতেছেন, কেহ বা মার সিঁথায় সিন্দূর ঢালিয়া দিয়া বিধুখণ্ড ভালে টিপ কাটিয়া দিতেছেন, মার মুকুটস্থিত মণিচয় অলক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া বড় ঝলমল করিতেছে। মা সিংহবাহিনী সবে মাত্র বাম পদ বাড়াইয়াছেন, প্রীতিপ্রফুল্লমুখে চম্পক অঙ্গুলি ঈষৎ সঞ্চালন করিতে করিতে যেন সকলকে সান্ত্বনা করিতেছেন, নীল নলীনাভ আঁখি অশ্রুজলে রক্তকোকনদসম শোভা পাইতেছে। এমন সময়ে রুক্ষকেশা মুক্তবেশা মেনকা বহু কষ্টে ভিড় সরাইয়া দুবাহু তুলিয়া উন্মাদিনীসম বলিয়া উঠিলেন, "দাঁড়া মা দাঁড়া উমা, দাঁড়া জন্মের মত হেরি, যাবার বেলা মা বলিয়ে আয় মা একবার কোলে করি, সম্বৎসর পর শিবে, তুমি পুনঃ আসিবে, সে আশায় না প্রাণ রবে ওগো শঙ্করী" দাঁড়া মা দাঁড়া একবার ভাল কোরে দেখি তোরে। সুধামুখী! একবার কোলে আয়, আর একবার মা বলে ডাক্, মাগো তোর কথা শুনিয়া, আমার আশ মিটেনা, তোকে দেখিয়া দেখিয়াও আমার দেখার শেষ হইল না। মা বহুবার শত কষ্ট সহিয়াও তোমার আশায় জীবন রাখিয়াছি, মা আর বুঝি তোমার বিরহ এ দেহ সহ্য করিতে পারিল না। মাগো, তোমায় না পাইলে এ জীবন আমার বৃথা। মা কবে তুমি আমার নিকটে নিত্য থাকিবে, কবে তোমার এই আনন্দময়ী মূর্ত্তি আমি সর্ব্বদা দেখিতে পাইব। তুমি যে সচ্চিদানন্দরূপিনী, তুমি যে ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী ইহা আমি জানি। মা নিত্যা শুদ্ধা সনাতনী, আমায় কখন ত্যাগ করিও না, মা আর ভুলে থাকিস্ না। মা আর একটী কথা, সেই মহাবিস্মৃতি সময়ে, সেই মহামোহ কালে একবার এমনি কোরে দাঁড়াস্ মা; মা, তুমি ভিন্ন আর আমার কে আছে মা, মাগো রক্ষা কর এ মহাসঙ্কট হইতে আমায় উদ্ধার কর।

(মাগো) যখন এসে ধোরবে্ কালে, রক্ষা কোরো মা সেই কালে
কেহ নাহি নিদান কালে ভরসা ঐ চরণ তরি।

হইল না কেন ?

এতদিনেও ত হইল না? কি করিলে তবে? সম্মুখে যে ভারি বিপদের দিন আসিতেছে।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৮।৬ গীতা ৷

মৃত্যুকালে—ঠিক এই দেহটি ত্যাগ করিয়া যখন যাইতে হইবে—তখন যে ভাবটি মনে উদয় হইবে সেই ভাবের দেহটি ধরিতে হইবে। সেই ভাবে ভাবিত থাকিতে বড় অভ্যাস করিয়াছিলে বলিয়া মৃত্যুকালে চির অভ্যাসের ভাবটি যে দেহে অনায়াসে কার্য্য করিতে পারে সেই দেহটি তোমায় ধরিতে হইবে।

একবার মানুষ দেহ পাইলে আর পশু দেহে যাইতে হয় না এই শিক্ষা যাঁহারা দিতেছেন তাঁহারা জগতের অজ্ঞান-বৃদ্ধির জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, বিচার এবং অনুভব সমস্ত দিয়াই দেখান যায় মানুষ হইলেই নিষ্কৃতি পাইলেনা—মানুষের কার্য্য যে ধারণাভ্যাসী হওয়া এবং যুক্তিমান হওয়া তাহা যতদিন না হইতেছে ততদিন—"যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং"—মৃত্যুকালে যাহা মনে পড়িবে তাহাই হইতে হইবে। একজন বেশ ধর্ম্ম আচরণ করিতেন—কিন্তু অভ্যাস পাকা হইল কিনা তজ্জন্য চেষ্টা ছিল না। লোকটির গঙ্গাজলে, গুরুর নিকটে, গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বলিবার অব্যবহিত পরেই মৃত্যু হইল। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পরেই উহাদিগের গৃহে ভূতের ভয় হইল। কোথাও কিছু নাই হঠাৎ মাটির গৃহ চাল শুদ্ধ নড়ে, যেখানে সেখানে ইট পাটকেল পড়ে, সন্ধ্যার সময় মনে হয় কে যেন অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে—ইত্যাদি বহু অত্যাচার হইতে লাগিল। গৃহস্থ, গুরুকে ডাকিলেন। গুরু সিদ্ধপুরুষ। গুরু কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। মৃত ব্যক্তি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গুরু মৃত প্রেতের সহিত কথা কহিয়া জানিয়াছিলেন তাহার প্রেতত্ব ঘটিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "গঙ্গাজলে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বলিয়া তোমার মৃত্যু হইল তথাপি এরূপ অসদগতি কেন হইল" ? প্রেত বলিল, গঙ্গা নারায়ণব্রহ্ম বলিবার পরে পলকের মধ্যে মনে হইয়া গিয়াছিল শ্বেতথানায় গিয়াছি। অমনি মৃত্যু হইল। মৃত্যু হইবামাত্র প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইলাম।

এই সমস্ত কথাকে কেহ কেহ বলিবেন কুসংস্কার। কেননা জগতের ভারি কবি সেক্সপীর বলিয়া গিয়াছেন "From whose bourne no traveller ever returns" কবি সেক্সপীরের কথা ঠিক করিয়া না বুঝিয়া প্রেত হ্যাম্‌লেটের কথাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না।

সেক্সপিরের দেশবাসী মিল্টন প্রমাণ করিয়াছেন (তাঁহার কোমস্ গ্রন্থে) যে ভূত প্রেত পিশাচ আছে—দেখাও যায়, আর প্লেটো প্রভৃতি পবিত্র আত্মাগণ

ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পবিত্রহৃদয় যাঁহারা, তাঁহারা কখন মিথ্যা কথা কহেন না। আবার উপস্থিত সময়ে থিয়োসফি ক্লায়ারভইণ্ট অবস্থার দেখাইয়া দিতেছেন প্রেত আত্মার সহিত কথা কহা যায়। ইহাতেও যাঁহারা সত্য কথা স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের দেশের কোন বিজ্ঞ গ্রন্থকার বলিতেছেন "ভায়ার জ্ঞানগঙ্গাটা বুঝি কোন সাহেবের পবিত্র গোমুখী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে"।

বিদ্রূপ করা আমাদের ব্যবসা নহে। তবে অজ্ঞানের প্রচার এরূপভাবে মূর্খ অবিবেকী লোকদ্বারা হইতেছে যে এইরূপ না করিলে অদৃঢ়বিশ্বাসীর সন্দেহ কিছুতেই দূর হয় না। যাঁহারা সৎ চিন্তা করিতে জানেন, যাঁহারা বাল্মীকি, ব্যাস, বশিষ্ঠ মনু প্রভৃতি মহাজনের বাক্য বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা বেদ, উপনিষদ্, তন্ত্র পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রের মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারেন, যাঁহারা শাস্ত্রের অধিকারী বিচার করিতে পারিতেছেন, যাঁহারা ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল বেদান্ত ইত্যাদি দর্শনগুলি যে আত্মজ্ঞান লাভ করিবার ক্রমমাত্র, এক এক অবস্থায় এক একটী শাস্ত্র উপযোগী, কাজেই তত্ত্বসম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই—এক কথায় যাঁহাদের সৎবুদ্ধি শাস্ত্রের সামঞ্জস্য দেখিয়া শাস্ত্র বিশ্বাস করিতে পারিয়াছে তাঁহাদের পক্ষে অজ্ঞানীর মত খণ্ডন জন্য যে পরিশ্রম তাহা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের মত মন্দবুদ্ধির জন্য অসত্য খণ্ডন করিয়া সত্য গ্রহণ করাই উচিত। নতুবা মনে গোঁজামিলন দিয়া কোন কিছু গ্রহণ করিলে—কালে শত শত সন্দেহ রক্তবীজের মত প্রথমে অগ্রাহ্য এবং অবিচারে পরিত্যক্ত সন্দেহ-বীজ হইতে জন্মগ্রহণ করিবে। তখন মানুষ বিরক্ত হইয়া, যে গলাবাজী করিয়া কোন কথা বলিবে তাহাই গ্রহণ পূর্ব্বক, অজ্ঞানী হইয়াও আপনাকে জ্ঞানী ভাবিয়া অজ্ঞানীর যে তুষ্টি তাহাই লাভ করিয়া শাস্ত্রাদি ভ্রান্ত বলিয়া হাটে মাঠে প্রচারার্থ ছুটিবে।

হে রমণীয় দর্শন! বড় দুঃসময়ে আমরা জন্মিয়াছি। তুমি ভিন্ন আমাদের বুদ্ধিকে যথার্থ সত্য পথে চালাইতে আর কাহারও সাধ্য নাই। হে প্রভু! তুমি আমাদিগকে বেদাদি শাস্ত্রবিশ্বাসী করিয়া উদ্ধার কর। বশিষ্ট, ব্যাস, মনু শঙ্করাদি মহাজনের বাক্য যেন আমরা যথার্থ ধারণা করিয়া যথার্থ বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বশিষ্ট ব্যাসাদির নাম যেন আমরা পরম শ্রদ্ধার সহিত করিতে পারি।

বলিতেছিলাম মৃত্যুকালে মনে যে ভাবটি উঠিবে যদি আমাকে তদনুকূল

যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয়—তবে অভ্যাস পাকা না হওয়া পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হইব কিরূপে ?

এক এক জন এক এক রকম তুষ্টি লইয়া বসিয়া আছেন। কেহ বলিতে-ছেন গুরু বলিয়াছেন আমি মুক্ত—আমাকে আর জন্মাইতে হইবে না। ইহাই আমার তুষ্টি। কিন্তু গুরু ঐ কথা বলিয়া আমার করিবার কর্ম্ম দিয়াছেন—ঐ কর্ম্ম শেষ এই জন্মেই করিতে হইবে। কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের পরাবস্থা লাভ করিলে তবে মৃত্যু অতিক্রম করা গেল। কিন্তু গুরু-আজ্ঞা শুনিলাম না—আজ্ঞামত কর্ম্ম করিলাম না, গুরুর কাছে একবার পা টিপিয়া, পায়ের ধুলা লইয়া—গুরুকে কিছু বলিতে না দিয়া (পাছে কাজ করিতে বলিয়া ফেলেন) আপনিই আগে ভাগে বলিলাম—বাবা আর আমায় জন্মাইতে হইবে না। গুরু আর কি বলেন একটু হাসিলেন। শিষ্য ভাবিলেন—মৌনং সম্মতি লক্ষণং। তবে আর কি ! বাবা বলিয়াছেন। ঠিক হইয়া গেল আর জন্মাইতে হইবে না।

ইহারই নাম গুরুর সহিত কপটতা করা। গুরু যে কার্য্য দিয়াছেন, যে মন্ত্র দিয়াছেন, যে ইষ্ট দেবতা দেখাইয়া দিয়াছেন, যে নাম ধরাইয়া দিয়াছেন, তাহাই জীবন্ত তিনি। সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে রাখিবার বস্তু। ঐ নাম যখন এক ক্ষণের জন্যও আমার ভুল হইবে না, শয়নে, স্বপনে, জাগ্রতে, ভ্রমণে এক মুহূর্ত্ত জন্য ও. যখন শ্রীগুরু ভুল হইবে না, যখন সর্ব্বদা অন্তর্যামীকে লইয়া আমি থাকিব—যখন শতরূপে শত গোলমালের অবস্থায় পড়িয়াও আমি আপনাকে আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখিব—নাম ভুলি নাই, মন্ত্র ভুলি নাই, কূটস্থবিহারীকে ভুলি নাই—পুনঃ পুনঃ দণ্ডে দণ্ডে আত্মপরীক্ষা করিয়া যখন জানিব ঠিক হইয়াছে, তখন সানন্দে দেহক্ষয়ের জন্য অপেক্ষা করিব। কেননা তখন মন্ত্ররূপী, নামরূপী শ্রীগুরু আমায় সর্ব্বদা আশ্বাস দিয়া বলিতে-ছেন, 'ভয় নাই, আমিই তোমায় উদ্ধার করিব'। রামপ্রসাদ ইহা করিয়া-ছিলেন তাই প্রাণপ্রয়াণ-সময়ে দুরন্ত শমনকে নিকটে আসিয়া হাত বাড়াইতে দেখিয়াও ভয় পান নাই। মহিষগলঘণ্টা শুনিয়াও—মহিষারূঢ় বিকটাকার কৃতান্তকে দেখিয়াও বলিতে পারিয়াছিলেন "তিলেক দাঁড়াওরে শমন আমি বদনভরে মাকে ডাকি। তবে তারা নামের কবচমালা বৃথা আমি গলায় রাখি।" তাই অন্য সাধক জোর করিয়া বলিয়াছিলেন "শমন তুমি এসনা এখানে, মা যদি তা শুনে তবে অপমানের বাকী রবে না"। হরি হরি তুমি কি এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছ ? পরীক্ষা করিয়া কি দেখিয়াছ—মৃত্যুর

মতন যে নিদ্রা তোমাকে নিত্য আক্রমন করিতেছে, সেই নিদ্রাকালে তোমার অবস্থা কি হয়, ছি ছি আত্মপ্রতারণা আর করিও না। এস এস একবার আত্মপরীক্ষা করি এস।

কৈ কি গিয়াছে? কেহ নিন্দা করিলে না হয় চুপ করিয়া থাকিতে পারি—কিন্তু মনের মধ্যে কি কিছু গর গর করে না—একটু প্রশংসা করিলে মনটা কেমন কেমন একটু বেশ লাগে না? নিজের মতের বিপরীত কথা বলিলে কি কিছু হয় না—যদি তাই হইল তবে "তুল্য নিন্দা স্তুতি মৌনী" মুখেই আওড়ান হইয়াছে—হয় নাই কিছু। কিরূপে হইবে? সাধনা অভ্যাস হইল কৈ? শ্রীগুরু বলিয়া দিলেন, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়াই একবার স্মরণ করিও—ব্রহ্মমেতি মাং মধুমেতি মাং—ইত্যাদি ইত্যাদি—নিদ্রাভঙ্গ হইলেই প্রথমে প্রার্থনা করিও, হে প্রভু, হে জগন্নাথ, হে মন্নাথ, হে প্রণতপাল, হে দীন-দয়াল আমি তোমার কাছে যাইতে পারিলাম না—আমি তোমাকে পাইতে পারিলাম না—হে প্রভু, হে দয়াময়, তোমার কাছে যাইবার শক্তি আমার নাই—আমি কি করিব? তুমিই প্রভু আমাকে প্রাপ্ত হও—তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই মধু—তুমিই মধুময় ব্রহ্ম—তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও—পতিরেব জায়াং—পতি যেমন জায়াকে প্রাপ্ত হয়, তুমি সেইরূপে আমাকে প্রাপ্ত হও। শ্রীগুরু বলিয়া-দিলেন, প্রাতঃকালে এই প্রার্থনা প্রথমেই কর, করিয়া বল, হে প্রাণেশ্বর! আমি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সন্ধ্যা হইতে আবার প্রভাত পর্য্যন্ত যে যে কার্য্য করিব, সেই সেই কর্ম্মও তৎ তৎ কর্ম্ম ফল তোমাতেই অর্পণ করিতেছি —আমার সমস্ত কর্ম্মই তোমার দ্বারা কৃত হইতেছে এই বোধ আমার যেন হয় তবেই আর কোন কর্ম্মে আমার অহংবোধ থাকিবে না। এস এস নিত্য ইহা স্মরণ করিয়া আলস্যবর্জ্জিত হইয়া প্রাতে, মধ্যাহ্নে; সন্ধ্যায় মধ্য রাত্রে নিত্য কর্ম্ম অভ্যাস কর। বলিতে পার বহুদিন ধরিয়া ত চেষ্টা করিতেছি—অভ্যাস হইল কৈ? যে দিন সময়ে কার্য্য হয় না, সে দিন মনে হইল কৈ—আজ যে সময় মত কর্ম্ম করিতে পারিলাম না, কোন্ মুখে তোমার কাছে যাইব? এখনও যে, যে দিন সন্ধ্যা বাদ থাকে সে দিন বড় হর্ষে বলিয়া ফেল আজ আর সন্ধ্যা নাই। কৈ যে দিন সন্ধ্যা না থাকে সে দিন ত প্রাণ কেমন করে না? আজ তোমার আজ্ঞা মতই তোমাকে ডাকিতে পাইব না এই বলিয়া ক্লেশবোধ হইল কৈ? তোমাকে ডাকাই আনন্দ—তোমাকে বিধি-পূর্ব্বক না ডাকাই ক্লেশ। কৈ ইহা হইল? যত দিন ইহা না হইতেছে ততদিন

কোন অভ্যাস পাকা হইল না বুঝিও। এক দণ্ড ও তোমায় ছাড়িয়া থাকাই আমার মৃত্যু, ইহা যতক্ষণ না বোধ হইবে ততদিন ধারণাভ্যাসী বা যুক্তিমান কিছুই হওয়া গেল না।

এখন এস একবার বিচার কর—এখনও কেন বলিতে হয় "কভু হয় কভু হয় না"—যাহাতে ইহা আর না বলিতে হয়—যাহাতে অভ্যাস ঠিক হইয়া যায়—কিরূপ প্রতিকার করিলে আনন্দে ছুটিয়া তোমার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, তাই একবার আলোচনা করি এস।

বালক হও বা ছাত্র হও, সধবা হও বা বিধবা হও, ব্রাহ্মণ হও বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হও, গৃহী হও বা সন্ন্যাসী হও—তুমি যাহাই কর কেন না—যে কার্য্যেই না কেন ব্যস্ত থাক—সর্ব্বদা ভগবানকে ডাকা বা ভগবান লইয়া থাকা তোমায় অভ্যাস করিতে হইবে—নিতান্ত স্থূল সাংসারিক কার্য্যের প্রতিবিরাম কালে তোমায় সর্ব্বদা করিবার কর্ম্মটিতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। যত দিন না সর্ব্বদা করিবার কর্ম্মটি তোমার আয়ত্ব হইয়া যায় ততদিন তুমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছ না বুঝিও। সর্ব্বদা করিবার কর্ম্মটি পাকা অভ্যাস না হওয়া পর্য্যন্ত যদি মনে কর আমাকে আর জন্মাইতে হইবে না, তবে তুমি ভারি প্রতারণায় পড়িয়া রহিয়াছ মনে করিও। এই সর্ব্বদা করিবার কর্ম্মটি অধিকারীভেদে কাহার পক্ষে জপ, কাহারও পক্ষে ধ্যান, কাহারও পক্ষে আত্মবিচার, কাহার ও পক্ষে সমাধি।

এই জপ, ধ্যান, আত্মবিচারই আবার প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় ও মধ্য রাত্রের নিত্যক্রিয়া। ঐ চারিটি নির্দ্ধারিত সময়ে ত বিধিপূর্ব্বক সন্ধ্যা আহ্নিক ক্রিয়াদি করিবেই তদ্ভিন্ন সকল সময়ে নাম জপাদি করিতে হইবে।

এত দিন করিতেছ তবু ও যে হয় না তাহার কারণ আছে। ঐ যে ভাবিয়া রাখিয়াছ এত জপ করিলেই আমার পাওয়া হইবে—এত জপ ত করিলাম আজও ত কিছুই হইল না, কোন আনন্দ ত পাইলাম না—কাল কিন্তু এই জপ করিয়াই ত বেশ আনন্দ পাইয়াছিলাম, এই ফলাকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য থাকে বলিয়া তোমার কভু হয়, কভু হয় না। আনন্দ পাও বলিয়া জপ করিতে যাও—আনন্দ পাওনা বলিয়া করিতে ইচ্ছা করে না এ ভাব যতদিন থাকিবে ততদিন তোমার কিছুই হয় নাই। এ ভাবে যাইও না।

প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায়, মধ্য রাত্রে যে তোমায় ডাকিতে যাই তাহা কোন প্রাপ্তির আশায় নহে, কেবল তোমার আজ্ঞা বলিয়া—তুমি করিতে

বলিয়াছ বলিয়া যাই। আমি যে জপ করিয়াই তোমায় পাইব ইহা দুরাশা মাত্র। জপ কেমন করিয়া করিলে হয়, ক্রিয়া কিরূপ করিলে ঠিক ঠিক হয়, কেমন করিয়া সন্ধ্যা করিলে সন্ধ্যা হয় তাহা তুমি বলিয়া দিয়াছ কিন্তু তথাপি আমার হইতেছে না। আমার শক্তিতে ইহা ঠিক মত হইবে না। তোমার আজ্ঞা বলিয়া আমি করি, হে প্রভু! আমি তোমার আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ করিব,.যেমন করিয়া করিলে হয়, তুমি করিয়া দিও। এই প্রাণে সময় মত ক্রিয়া করিলে দয়াময় দয়া করিবেনই। নিশ্চয় করিবেন ইহা তিনিই বলিয়াছেন।

মরণ-সঙ্গিনী।

এস এস জীবনে ত সঙ্গিনী হইলে না—একবার মরণ-সঙ্গিনী হইবে আইস। আমি দিনে দিনে মরণ অভ্যাস করিব—তুমি তাহাই দেখিবে আইস—অধিক আর কিছুই বলিতেছি না।

আজ কত নরনারী আছেন যাঁহারা এই কথা বড় আদর করিয়া বলিতে রাজি। তবে বলার মধ্যে ভাবের তফাত আছে।

যাঁহার দৃষ্টি পৃথিবীলোক, অন্তরীক্ষলোক, স্বর্গলোক, ছাড়াইয়া গিয়াছে স্বর্গ লোকের উপরেও যে লোক, যে লোক শুধু এক মহাশূন্য—তাহার উপরেও যে লোক, যে লোকে সব মরিয়া যাইবার পরে আবার সব সৃজন হয়,—তাহার উপরেও যে লোক, যে লোক অতি শান্ত, অতি নির্জ্জন, অতি মনোরম বলিয়া নিত্য তপস্বীদিগের তপস্যার স্থান—তাহার উপরেও যে লোক—যেখানে কোন ক্লেশ নাই, যেখানে সবাই আনন্দভুক্—তাহার সর্ব্বোচ্চস্থান যেটি—সেখানে যাহা আছে তাহাই আনন্দ—এই সর্ব্বোচ্চ সত্য লোকে যাঁহার দৃষ্টি তিনি যখন ডাকেন 'মরণসঙ্গী বা মরণসঙ্গিনী হইবে আইস তাঁহার ভাব এক প্রকার কিন্তু যাহার দৃষ্টি "ভাগাড়ে" তাহার মরণসঙ্গী বা মরণসঙ্গিনীকে ডাকা আর এক প্রকারের। আর ভাগাড় হইতেও যে সত্য লোকে যাইবার আশা রাখে তাহারও ভাব অন্য প্রকারের। সবই ভাবের তফাত—যে যেমন।

আমার কোন্ ভাবের ডাকা, তাহা তুমিই জান। যাহা দেখি তাহাই

তাহার শক্তি। তুমি তাহার বরণীয় শক্তি। তুমি সর্ব্বত্র থাকিয়াও আদিত্য-পথগামিনী—সহস্রবাসিনী—অন্য কাহাকেও জানাইতে চাই না। এস এস আমি ডাকিতেছি, একবার মরণসঙ্গিণী হইবে আইস।

আগেই মরণের কথা—তার পরে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কথা।

মরণের কথা।

ব্রাহ্মণের মরণ তপস্যায় আত্মবিচারে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মরণ যুদ্ধে—বা যুদ্ধ অবসান কালে "যোগেনান্তে তনুত্যজাম্", শূদ্রের মরণ সেবায়—এই মরণের সাধারণ বিধি।

জীবনে আমার অমঙ্গল হইয়া গেল—জীবনে তোমায় লইয়া ঘর কন্না হইল না। মরণই আমার মঙ্গল। এস এস মরণ অভ্যাস দেখিবে আইস। না মরিলে তুমি আমার হইবে না, এত দিনে জানিয়াছি।

তুমি আসিলে না—তুমি আসিবেও না জানিয়াছি। প্রবৃত্তিমাখা মনের মরণই মরণ। প্রবৃত্তি লইয়া মরণ—সে কেবল পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি করার জন্য—পুনঃ পুন্য জননের জন্য। সে মরণে বা জীবনে তোমায় পাওয়া যাইবে না। আমার মরণই মঙ্গল—এস এস আমার মরণ অভ্যাস দেখিবে আইস। আমার মরণ তোমার সঙ্গে অনন্ত জীবনের জন্য।

কেমন করিয়া মরিব? সেত তুমিই শিখাইয়াছ। রাক্ষস-গৃহে নিরন্তর পীড়ন মধ্যে থাকিয়া জনকনন্দিনী বলিয়াছিলেন "ইদানীমেব মরণং কেনোপায়েণ মে ভবেৎ" এখনই মরণ আমার কি উপায়ে হয়? মরণে কৃতনিশ্চয়া মা আমার বৃক্ষ-শাখা অবলম্বন করিয়া—মরিবার উপায় না পাইয়া বড় দুঃখে বিমুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়াছিলেন। সহসা পৃষ্ঠোপরি লম্বিত বেণী দুলিয়া উঠিল। বিদেহতনয়া লম্বিত বেণী হস্তে ধরিলেন—আবার কাঁদিতে লাগিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন :—

উদ্বন্ধনেন বা মোক্ষে শরীরং রাঘবং বিনা।
জীবিতেন ফলং কিং স্যান্মম রক্ষোঽধিমধ্যতঃ॥

রাম নাই—এই শরীর আছে? উদ্বন্ধনেই কি এই শরীর ছাড়িব? রাক্ষস রাক্ষসী মধ্যে এই জীবন রাখিয়া আমার ফল কি? সত্যই—আমার এই দীর্ঘা বেণী? 'দীর্ঘা বেণী মমাত্যর্থ মুদ্বন্ধায় ভবিষ্যতি'।

জানকী উপায় পাইলেন। আমার এই দীর্ঘা বেণী? ভগবান আমায় দীর্ঘ কেশপাশ দিয়াছেন। হউক তাঁহার আদরের কেশপাশ। যে আদর

করিবে সেই যদি আসিল না—সেই যখন রাক্ষসপীড়ন হইতে মুক্ত করে না তবে ইহাই আমার মৃত্যুর কারণ হউক। রামরাণী তখন বেণী গলায় জড়াইলেন, জড়াইয়া বৃক্ষ শাখায় তুলিলেন। আবার অশ্রুজলে গণ্ড প্লাবিত হইল। এই দেহ—তাঁহার আদরের বস্তু অবহেলা করিতে হইবে? কিন্তু আর উপায় ত নাই। মা মরিতে যাইতেছেন—সহসা শ্রীভগবানের দূত ভগবানের দয়া জানাইল। মার আর মরা হইল না।

এ মরণ এক রকমের। এ মরণ হয় না সংবাদ পাইলে। তার আসাই জীবন, অনন্ত জীবন। দূত ও আসিল না তবে আমার মরণই নিশ্চয়।

তুমি আসিবে না—এ কথাও ত বলিতে যাতনা পাই। তুমি আসিবে কিন্তু কবে? কত আর দেরী করিব? কবে আসিবে—তাওত ভাল করিয়া বলিলে না? তবে আর দেরী করিব কেন? আর যে পারি না।

বড় অন্ধকার। নিরন্তর অন্ধকারে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। তোমাকে দেখিতে পাইনা—তুমি কি করিতেছ জানিতে পারি না।—নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে বড় ভয় পাই। কি সব রাক্ষস রাক্ষসী—বিকটাকার দেখি—আর ত থাকিতে পারি না। তাই ডাকি, এস এস মরণ অভ্যাস দেখিবে এস। তুমিই আমার নিত্যসঙ্গিনী। তোমাকে না দেখা—তোমার সংবাদ না পাওয়া, তোমার বদলে ভূত প্রেত দেখা—সতত বিভীষিকা পাওয়া—ইহা অপেক্ষা আর যাতনা আমার কি হইতে পারে? এস এস মরণে অগ্রসর করিয়া দাও।

আমার ক্লেশ কি শুনিবে? রাক্ষসের উৎপাৎ। একা থাকিলেও সূক্ষ্ম-দেহে মন্দেহা রাক্ষসের জ্বালা। বাহিরে আসিলে ত কথাই নাই। স্থূল দেহেই সমস্ত দেখিতে পাই। বিশ্বামিত্র যজ্ঞে আহুতি দিতে গেলেই মারিচ সুবাহু রুধির দিয়া যজ্ঞ নিবাইয়া দিয়া অন্ধকার করিয়া উৎপাৎ করে। এ উৎপাৎ আর সহ্য করিতে পারি না।

প্রবৃত্তির উৎপাৎ আর কত সহিব? তোমায় ছাড়িয়া "দৃশ্য-দর্শন" ইহাও যাতনা—নির্জ্জনে সূক্ষ্ম শরীরে প্রবৃত্তির পুরাতন দৃশ্য-দর্শন ইহাও যাতনা। আমি এই যাতনা এড়াইতে চাই। দেখা শুনা—কি স্থূলে কি সূক্ষ্মে সকলই যে প্রবৃত্তি। সকলই যে প্রকৃতি—সকলই যে মায়া। তোমায় পাইনা, তোমার মায়ায় প্রাণান্ত হয়।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ
সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা।

এই রাক্ষসী সর্ব্বদা শ্বেত কৃষ্ণ লোহিতাদি প্রজা সৃজন করিতেছে। সর্ব্বদাই গর্ভ হইতে নাড়ী-রুধির-জড়িত পুত্র কন্যা জন্মিতেছে। ইহারাই বড় হইয়া বড় দুরন্ত হইতেছে—সর্ব্বদা মোহ জন্মাইতেছে।

কাম ক্রোধাদি পুত্রাদ্যাঃ হিংসা তৃষ্ণাদি কন্যকাঃ।
মোহয়ন্ত্যনিশং * * * *

কামক্রোধাদি পুত্র, হিংসা তৃষ্ণাদি কন্যা—বড়ই যে মোহ জন্মাইতেছে। এই রাক্ষসী সংসার-সাগরে পতিপুত্রধনাদিতে সর্ব্বদাই যে ভ্রমণ করিতে বলে—আমি "গতাগতেন শ্রান্তোস্মি দীর্ঘ-সংসার-বর্ত্মসু"—আর গতাগতি করিতে পারি না—আমিও বলিতে চাই

সংসার-সাগরে মগ্না পতিপুত্রধনাদিষু
ভ্রমামি মায়য়া ভেদ্য পাদমূলমুপাগতা॥

আর ভ্রমণ করিতে পারি না—তোমার পাদমূলে পতিত থাকিতে চাই। তাই পুনঃ পুনঃ বলি পাদমূলে থাকা কি জানি। আমি বলিয়াই আর অন্য স্থানে থাকিতে পারি না। তবু ও যে থাকি বড় যাতনায়।

কি করিবে তাও ত কিছু বল মা। যদি কাছেই মা থাকিতে পাইলাম—তবে কি করিয়া থাকিব বল? তাও পারিতাম যদি তোমার পরিচিত লোকের কাছেও রাখিতে? যাহাদের কাছে সর্ব্বদা তোমার কথা শুনিতে পাই, তাহাদের সঙ্গে যদি থাকিতে দিতে! তাহাও হয় না। কর্ম্ম-দোষ আমার আছে সত্য। কিন্তু তুমি আসিলেও কি কর্ম্ম-দোষ থাকিবে? আসিয়াই দেখ, কর্ম্ম-দোষ থাকে কি না?

যদি আসিতে তোমার নিতান্ত ক্লেশ হয় তবে না হয় এই হউক যেঃ—

ত্বদ্ভক্তেষু সদা সঙ্গো ভূয়াম্মে প্রাকৃতেষু ন।
জিহ্বা মে রামরামেতি ভক্ত্যা বদতু সর্ব্বদা।
মানসং শ্যামলং রূপং সীতালক্ষ্মণসংযুতম্।
ধনুর্ব্বাণধরং পীতবাসসং মুকুটোজ্জ্বলম্॥
অঙ্গদৈঃ নূপুরৈ মুক্তাহারৈঃ কৌস্তুভকুণ্ডলৈঃ।
ভান্তং স্মরতু মে রাম বরং নান্যং বৃণে প্রভো॥

তোমায় না পাই তোমার ভক্তের সঙ্গ হউক। তাঁহাদের নিকট তোমার কথা শুনিবার অধিকার দাও। প্রাকৃত জনের সঙ্গ কত করিব? রসনা সর্ব্বদা গদ্গদ্ ভাবে রাম রাম করুক—প্রাকৃত কথা কত বলিব আর কতই

না শুনিব? ভক্ত জনের সাধের মত সাধ কি আমার হইতে নাই? আমার কি ইচ্ছা করে না—নবীন জলধর অঙ্গে তড়িল্লতা খেলা করুক—সুন্দর চরণ যুগল নূপুর ধ্বনিতে শিঞ্জিত হউক—কৌস্তুভ কুণ্ডলে, অঙ্গদ মুক্তাহারে কেমন দেখায় দেখি, আর কমলিধ্যানমগ্ন নয়নে নয়ন আবদ্ধ মূর্ত্তিতে উজ্জ্বল মুকুট কেমন দেখায় একবার দেখি।—এ সব যদি অসম্ভব হয়—যদি আমার কাছে তুমি আসিতেই না চাও তবে বল—আমার মরণই মঙ্গল কিনা?

মরণেই মঙ্গল কেন—আর মরণ অভ্যাস কি করিয়া করিতে হইবে ইহা তোমাকে বলিব।

মন ত চিন্তা কিছুতেই ছাড়ে না। কোন প্রয়োজন নাই তথাপি যেন সর্ব্বদাই ব্যস্ত। কখন বাহিরের যাহা হয় কিছু লইয়া ব্যস্ত কখন বা ভিতরে আর বিক্ষেপরূপ তম ও রজঃ লইয়া ব্যস্ত। কিরূপে ইহা দূর হইবে? যে মনকে সাধনায় বসাইয়া প্রতি বিক্ষেপে বলিতে অভ্যাস করে 'মরিবই নিশ্চয়' তবে আর অন্য চিন্তা কি করিবে? তার বেশ ফল লাভ হয়। কিন্তু ইহাই কয় জনের হয়। তারপর দেখি মানুষের মৃত্যুকাল যখন আইসে তখন আর বাহিরের সংসারের কথা, বিষয়সম্পত্তির কথা কহিতে চায় না। আত্মীয় স্বজন কেহ নিকটে গেলেও বিরক্ত হয়। কোন কথা কহিতে গেলে বেজার বোধ করে। তবেই ত বুঝি মৃত্যুই মানুষের প্রবৃত্তি ছাড়াইয়া দেয়। ঘোর সংসারী ও মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে টাকা দেখিতে পারে না—টাকার কথায় তৃপ্তি পায় না।

মৃত্যুই যদি প্রবৃত্তি ছাড়াইতে সক্ষম হয় তখন মরণ অভ্যাসে মনের বিক্ষিপ্ত চিন্তা দূর করা যাইবে—মনের আলস্য অনিচ্ছারূপ মূঢ় ভাব ত্যাগ হইবে।

হায়! তোমায় পাইলে ত অন্য চিন্তা থাকে না, তোমার কাছে ত আমার আলস্য অনিচ্ছা থাকে না। তুমি থাকিলে আমার আহার নিদ্রারও আবশ্যক হয় না। ইহা ত আমি দেখিয়াছি। তুমি যদি আসিতে তবে ত বড় সুখের সহিত আমার প্রবৃত্তি দমিত হইয়া যাইত—বড় সুখে শম দম অভ্যাস হইয়া যাইত। তুমিত আসিলে না—তোমায় লইয়া ঘর করা করিতে ত পাইলাম না। তাই তোমার নাম ও তোমার কর্ম্মকে তোমার স্থানে বসাইয়া মরণ অভ্যাস করিব। তুমি এস একবার মরণ-সঙ্গিনী হও।

এখন কি করিয়া মরণ অভ্যাস করিতে চাই সেই কথা বাকী।

দুস্তর পৃথ্বালয় মত যদিও ইচ্ছা নাই। বিষ খাইয়া বা জলে ডুবিয়া

মরিতে চাই না। তুমি যাহা শিখাইয়াছ—মরিতেই বাকী আছে—ইহা ভাবিতে ভাবিতে সাধিব। সাধিতে সাধিতে যদি তোমার দয়া হইয়া যায় তবে এই জীবনেই তোমায় সঙ্গিনী পাইয়া আমার প্রবৃত্তি মরিয়া যাইবে। বল বল আসিবে কি? যদি না এস তবে তোমার কথা সাধিয়া মরিতেছি বলিয়া দেহ অন্তে যেন তোমার সহিত চির মিলন হয়।

মরার সময় যে ক্লেশগুলি হইবে সেই ক্লেশ জীবনে অভ্যাস করিতে বলিয়াছ।

মৃত্যুসময়ে ক্লেশ কি? অহো! তাহা সুস্থ শরীরে স্মরণ করিলেও ব্যাকুল হই।

আসন করিয়া বহুক্ষণ বসিতে পারি না—কেন? ক্লেশ হয় বলিয়া। কিন্তু মৃত্যুকালে কত দীর্ঘকাল ধরিয়া যে দেহকে এক অবস্থায় রাখিতে হইবে? হাত পা বড় অবশ হইয়া পড়িয়া থাকিবে—নাড়িবার ইচ্ছা হইলে নাড়িতে পারিব না। এই স্মরণে যতই ক্লেশ হউক না কেন দেহকে আসনে বসাইয়া রাখিতে অভ্যাস করিতে হইবে। কষ্ট হইলে বলিতে হইবে—যে মরিবে তাহার আবার দেহকে একভাবে বসাইয়া রাখিবার ক্লেশ গণ্য করিলে চলিবে কেন?

মৃত্যুতে শ্বাসরোধ হইবে। তবে জীবিত কালে শ্বাস রোধে-কুম্ভকে ক্লেশ না করিলে চলিবে কেন? শনৈ শনৈ কুম্ভক বাড়াইতে হইবে।

মৃত্যুতে আরও কত যাতনা। এখন উদর একটু স্ফীত হইলে শ্বাস টানিতে ফেলিতে কত ক্লেশ হয় আর তখন? তখন যে উদর বড়ই স্ফীত হইবে, তখন কি করিব? এখন বক্ষে কফ জমিলে তাহা নিঃসারণ না করা পর্য্যন্ত বড় ক্লেশ হয়। আর তখন? কত শ্লেষ্মা জমিবে—তখন কি করিব? এখন একটু নিদ্রা কমাইতে ক্লেশ বোধ করি, আর তখন দিনের পর দিন যাইবে, রাত্রির পর রাত্রি যাইবে—কত ছটফট করিতে হইবে—নিদ্রা ত আসিবে না। তখন কি করিব? এখন হইতে নিদ্রা কমাইয়া সাধনা করিতে হইবে। এখন এক দিন একটু আহার কম হইলে ভাবি শরীর খারাপ হইবে। আর তখন? এক দিন উপবাসে ক্লেশ পাই আর তখন যে উপবাসের উপর উপবাস চলিবে—খাইতেই রুচি থাকিবে না—তখন? সকল অভ্যাস বদলাইয়া সাধনা করিতে হইবে। আহার নিদ্রা ভয়—সমস্তই অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

যে সাধনা করিয়া মরিতে চায়—যে সাধনায় বসিয়া আগে ভাবে—মরিতেই ত আসিয়াছি—সে আবার আলস্য অনিচ্ছা করিবে কি? আলস্য অনিচ্ছা করিয়া পড়িয়া থাকা—এত একটু আয়াস লাভ জন্য? যে মরিবে তাহার আবার

আয়াস খোঁজা কি? সে নিদ্রা না আসিলেও শয্যায় যাইয়া নিদ্রাকে ডাকিবে কি? সে আবার শয্যা ত্যাগে আলস্য করিবে কি? সে আবার ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের কার্য্য রৌদ্র মুহূর্ত্তে করিব বলিয়া ফেলিয়া রাখিবে কি? সে উদর ভার হইবে জানিয়াও—আহার অনাবশ্যক বুঝিয়াও—শরীর খারাপ হইবার ভয়ে আহার করিবে কি? সে কোন্ ভয়ে—বা কোন্ ক্লেশ ভাবিয়া শরীরকে এক আসনে বসাইয়া রাখিতে চায় না—দীর্ঘকাল বায়ু ধরিয়া রাখা অভ্যাস করে না?

মরণসঙ্গিনি! না মরিলে তুমি আমার হইবে না—তাই প্রতিজ্ঞা করিলাম, 'মরিব'। তোমায় ডাকিতে ডাকিতে মরিব—

স্নাত্বা প্রাতঃ শুভজলে কৃত্বা সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ
তত একান্তমাশ্রিত্য সুখাসনপরিগ্রহঃ॥

বিসৃজ্য সর্ব্বতঃ সঙ্গমিতরান্ বিষয়ান্ বহিঃ।
বহিঃ প্রবৃত্তক্ষিগণং শনৈঃ সম্যক্ প্রবাহয়॥

প্রাতে স্নান করিয়া বা আর্দ্রবস্ত্রে শরীর পরিষ্কার করিয়া প্রথমেই নিত্য অনিত্য বিচার করিয়া—সন্ধ্যাদি ক্রিয়া অনলসে সম্পন্ন করিতে হইবে। পরে একান্তে সুখাসনে উপবেশন করিয়া—সকল সঙ্গত্যাগ করিয়া চক্ষু কর্ণাদির বাহিরে আগমন ব্যাপার রোধ করিয়া আত্মায় প্রবাহিত করিতে হইবে। কর্ণ শ্বাসের সহিত নাম জপ এত শুনিবে যে যেন আর বাহিরের কিছুই শুনিতে না পায়—চক্ষু ভ্রূমধ্যে জ্যোতি-জড়িত মূর্ত্তি এতই ধ্যান করিবে যেন বাহিরে চাহিলে আর কোন কিছুই না দেখে—প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সহিত মনকে আত্মায় প্রবাহিত করিয়া মনের ক্রিয়া প্রবৃত্তিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। পরে মনকে স্থির করিয়া "প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদা নঘ" মনের চিন্তারহিত অবস্থায় যাঁহাকে পাওয়া গেল—তাঁহার সহিত ভিতরের বাহিরের কোন বস্তুর সহিতই সঙ্গ হয় না—এই নিশ্চয় করিতে হইবে। কখন বা শান্ত হইয়া 'আমি কে' 'কে আমি'? পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্ন করিয়া করিয়া কুম্ভকে থাকিতে হইবে। আর যদি এই অবস্থা—এই নিরোধভাব অধিকক্ষণ না রাখিতে পারা যায়, তবে রত্নসিংহাসনস্থ নয়নে নয়ন আবদ্ধ সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট কেয়ূরবান্ কণককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী—হিরণ্ময়দ্যুতি—বিদ্যুৎ-জড়িত নবদূর্ব্বাদলশ্যামসুন্দর মূর্ত্তির ধ্যান অভ্যাস করিতে হইবে।

এই কার্য্য করিতে করিতে মরণ অভ্যাস করিতে চাই। জপ ধ্যান অভ্-

বিচার—একটিতে শ্রান্ত হইলে অন্যটি, অন্যটিতে শ্রান্ত হইলে অপরটি—ইহা সাধিতে সাধিতে মরিব।

তাই বলি "মরিব" নিশ্চয় করিয়াই ডাকিতে বসিব। "মরিব" স্থির করিয়া ডাকিতে বসিলাম—ছিছি একটু শরীরের ক্লেশ হইতেছে বলিয়া কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব - করিয়া শরীরের বিলাসিতা রক্ষা করিতে ছুটিব? যে মরিবে তার আবার শারীরিক ক্লেশকে ভয় কেন? যে মরিবে তার আবার আলস্য অনিচ্ছায় বিলাসিতা কেন? যে মরিবে তার আবার নিদ্রা না আসিলেও শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া নিদ্রাকে ডাকা কেন? যে মরিবে সে কি আবার "কভু হয়" "কভু হয় না" ইহাতে হর্ষ-বিষাদ গ্রাহ্য করিবে? ভাল হউক মন্দ হউক সে আবার ইহা দেখিবে কি? সে সমান ভাবে ডাকিয়াই যাইবে—সুখে দুঃখে যাতে পারে, যেমন করিয়া পারে সে ডাকিয়াই যাইবে। যাহাকে চাই সেই বলিয়াছে বলিয়া ডাকি।

যতদিন না পাওয়া যায় ততদিন মরাতে ক্লেশ থাকিবেই – সাধনাতে ক্লেশ হইবেই। আর যে পাইয়াছে তাহার মরাতে বড় সুখ। কিন্তু তুমি কি পাইয়াছ যে বলিতেছ মরায় আবার দুঃখ কি? মৃত্যুতে যে প্রাণ উৎক্রামণ হয়। কাশী-প্রান্তবিহারিণী সোপানাবলী ভাঙ্গিয়া আইস প্রাণ উৎক্রামণে কত ক্লেশ বুঝিবে? ছিছি ভাল করিয়া একবার পরীক্ষা কর, আত্মপ্রতারণা ত করিতেছ না?

সাধনার দুঃখ আছে সত্য—কিন্তু সব দুঃখ অগ্রাহ্য হইয়া যায় তাহাকে নিশ্চয়ই পাইব বলিয়া। তাহার কথা মত চলিতেছি—তোমার কথা মত কাজ করিয়া মরিব, পাইব না কেন? তোমার কথা ত কখন মিথ্যা নহে।

তবে এস মরণসঙ্গিনি! আমি বড় কষ্ট পাই। প্রবৃত্তির জ্বালায় আমি বড় জ্বলি। তুমি একবার আসিয়া দাঁড়াও—আমি একবার তোমায় ভাল করিয়া দেখি—দেখিয়া দেখিয়া মরি। কৈ আমি তোমায় দেখিলাম? তোমায় ভাল করিয়া যে আমার দেখা হয় নাই? তোমায় ভাল করিয়া না দেখিতে দেখিতেই তুমি চলিয়া গিয়াছ। গিয়াছ সে আমারই অপরাধে। তুমি নিবৃত্তি-মহারাণী। আমি প্রবৃত্তি-রাণীর বশ বলিয়া তুমি দূরে গিয়াছ। এস এস আর আমার প্রবৃত্তির বশ হইবার ইচ্ছা নাই। আমি পারি না, তুমি আসিয়া আমায় মুক্ত কর। তোমার আশ্রয়ে আমার মরণ সাধনা অভ্যস্ত হউক। এস এস একবার আমার মরণ দেখিবে এস। আর যাহারা জীবন্তে মরিতে চাও—নারী হও, পুরুষ হও, সবাই আমার সহায়। প্রাকৃত সঙ্গ আর যেন না হয়।

অগ্রহায়ণও পৌষে—আবার মরণ-চিন্তা। কি জানি এই দুই মাসে কোন প্রাণ-প্রয়াণ-ব্যাপার যেন হিয়ায় মিশিয়া আছে?

মরণের কথা শেষ হইল এখন সঙ্গিনীর কথা।

সঙ্গিনীর কথা।

"সঙ্গিনী" চাই "সঙ্গী" নহে এ শুনিয়া লোকেত বিদ্রূপ করে? করুক বিদ্রূপ—যে মরিতে চায় তার বিদ্রূপের ক্লেশ কি গ্রাহ্যের বস্তু? মরণ ক্লেশ যে সহিতে রাজি, তার আর উপহাস-জনিত ক্লেশে কি হইবে?

তবুও ত লোকনিন্দা। সত্যই—লোকনিন্দা বড় ভাল বস্তু। তথাপি "লৌকিকাচারঃ মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ" বড় ভাল কথা ইহা। লোক অপবাদ যে মানেনা সে ব্যভিচারী। আমি কি ব্যভিচারী?

কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ চাই? মাও কি কামিনী? সহধর্ম্মিনী ও কি কামিনী? আমি কিন্তু সঙ্গিনীই চাই।

ব্রহ্ম হওয়া কি আমি ধারণা করিতে পারি না। আমার ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি-মান। শক্তিশূন্য ঈশ্বরে আমার হইবে না। নবীন জলধর আমার কাছে অন্ধকারেই ঢাকা থাকে যদি বিদ্যুৎরূপিনী মা আমার তাঁর অঙ্গে যাওয়া আসা না করেন। "তমসস্তু পরং জ্যোতি" মা আমার বরণীয় ভর্গ। অন্ধ-কারে ঢাকা কাল মেঘকে বিদ্যুৎ ভিন্ন প্রকাশ করিবার কেহ নাই। কাল তড়িল্লতা ভিন্ন আমার হয় না। রাম-জলধরে সীতা কানকী-লতা ভিন্ন আমি দেখিতে পারি না। শিব সঙ্গে শিবরাণী—মহাকালে মহাকালী, আদি নারায়ণে মহালক্ষ্মী, শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধা, চতুর্ম্মুখে মহাসরস্বতী—বশিষ্ঠে অরুন্ধতী, শিখিধ্বজে চূড়ালা—ইহা দেখিয়া মনে ধারণা করিয়া ফেলিয়াছি—আমার মহাশক্তিই আমার জীবন সঙ্গিনী। শক্তিকেই দেখিতে চাই—শক্তি ভিন্ন আমার জীবের শিবদর্শন হইবে না।

তুমি উপহাস করিলে কি করিব? 'নিজশক্তিমুমাম্ পশ্য মহেশ ইব নৃত্যসি' এ ভিন্ন ব্রহ্মানন্দ আমার ধারণায় আইসে না। অদ্বৈত হইয়া যায়—দ্বৈত পর্য্যন্ত সাধনা। যখন আসিবে আসুক—কিন্তু যদি চাহিবার কিছু থাকে তবে এই "বামাঙ্কে দধতং" এই সীতারাম হরপার্ব্বতী, রাধাকৃষ্ণ, ব্রহ্ম, সরস্বতী। যদি আকাঙ্ক্ষার কিছু থাকে তবে এই শক্তি-জড়িত শক্তিমান। শক্তিই দেখা দিয়া থাকেন। শক্তি লইয়াই ছিলাম, শক্তি লইয়াই থাকিতে

চাই—তবে এত দিন ছিলাম প্রবৃত্তি-রাণীর সঙ্গে, এখন থাকিতে চাই নিবৃত্তি-মহারাণীকে লইয়া। বরণীয় ভর্গই তিনি—আদিত্য-পথ-গামিনী তিনিই। তিনি ভিন্ন পথ দেখাইতে কেহ নাই—তিনি ভিন্ন প্রচোদয়াৎ নাই। 'যন্ন বেদা বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্ ন যত্র বাক্ প্রভবতি'—মা আমার তাঁহারই শক্তি—সকলই তাঁহার শক্তি—প্রকাশককে প্রকাশ করিতে যদি কেহ পারেন তবে তিনি—সেই দেবতার বরণীয় ভর্গ। শক্তি ভিন্ন উপাসনা নাই।

শক্তিদর্শন।

রোগ হইতে উঠিলেই একটা ক্ষুধা হয়। সেই ক্ষুধা সামলাইতে না পারিলে আবার রোগ হয়। বহু ভাগ্যে ভব-রোগ ক্ষণিক শান্ত হইলে পরমেশ্বর-ক্ষুধা পায়। সে সময়ে মাত্রা বেশী চড়াইলে অনিষ্ট হয়। সেই জন্য অনেক বার ধরিয়া বসা ভাল কিন্তু রাতারাতি বঁড় মানুষ হইতে যাওয়া কিছু নয়। ধীরে ধীরে শনৈঃ শনৈঃ অভ্যাস করিতে হয়। অল্পে অল্পে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, মধ্যরাত্রের সময়টা আরম্ভ করিতে হয়। অগ্রে সময়ে বসা অভ্যাস করিতে হয়। হউক না হউক—কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া তারে ভালবাসিয়া যথা সময়ে তাহার সমীপে বসিতে হইবে। সমীপে বসাই উপাসনা। এ সমস্ত বড় ধীরের কার্য্য। হট করিলে কিছুতেই হয় না।

ভালবাসিতে না জানিলে কাহার আজ্ঞা পালন জন্য দৌড়িয়া যাইব? যাহার হৃদয়ে ভালবাসা নাই তার আবার সন্ধ্যা পূজা কি? যে কখন নীল আকাশে তারা ফুটিতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া না থাকে, যে কখন সূর্য্যচন্দ্রোদয় কালে অবাক হইয়া না দেখে, যে কখন বৃক্ষলতা পর্ব্বত আকাশ দেখিয়া দেখিয়া কাহাকেও না দেখে, যে কখন মানুষ, পশু, পক্ষী দেখিয়া কাহাকেও দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করে তার আবার ধর্ম্ম কর্ম্ম কি? যে কখন তাহার জন্য তীর্থে যায় না, গঙ্গা স্নান করে না তার আবার তীর্থই বা কি আর গঙ্গাই বা কি?

এই জগতের যে অর্থ আছে সে কেবল এক জনের জন্য। সেই এক জন বাদ দিলে জগৎ নাই, চন্দ্র সূর্য্য নাই, বৃক্ষলতা নাই, তীর্থ প্রতিমা নাই, মানব নাই, সংসার নাই, আকাশ নাই নক্ষত্র নাই, পৃথিবী নাই, ফুল নাই। তবুও যার সংসার থাকে তার সংসার দুঃখের কারাগার। তবুও যার সংসার থাকে সে মানুষ নয়। সে নামধারী আর কিছু।

ভালবাসা মোটা মূর্ত্তিতে দেখা যায় বটে কিন্তু ভালবাসার রস স্থূলে নাই। মহাকাশে ভালবাসা ভোগ করিতে যাও, স্থূলে ভালবাসায় মাখামাখি করিতে যাও, তোমার সব হারাইয়া যাইবে। ভালবাসার স্বস্থান চিত্তাকাশ। ভালবাসার বিহার চিত্তাকাশে। প্রাণই রহিল চোরকুটুরিতে, আর প্রাণেশ্বর কি থাকিবে কুটুরির বাহিরে—হাড় মাসের উপরে? চিত্ত স্থির না করিলে প্রাণের গতাগতির পথ ধরা যায় না—আর প্রাণেশ্বরের সন্ধান কি মিলিবে পথে, উপপথে, বনে, উপবনে? স্থূলে মন্দির থাকিতে পারে—মহাকাশে যাহা তাহা লোভ দেখাইতে পারে কিন্তু তাহার সঙ্গে মিলন মহাকাশে হয় না—হয় চিত্তাকাশে। "একই রজকে" কাপড় ধুইতে দিলে কি হইবে, ছায়ায় ছায়ায় মিলিবে বলিয়া পাকে পাকে ঘুরিলে কি হইবে—লোক নিন্দায় নামে নামেও ত মিলিল বলিয়া মনকে চক্ষু ঠারিলে কি হইবে এ সব বড় জড় অবস্থার কথা—ইহাতে প্রেম হয় না ইহাতে থাকে কাম। সে যদি পড়ে বলিয়া কবিতা লিখিয়া হা হুতাশ করিলে কি হইবে—এটা কামমাত্র। আমি যে বড় দুঃখ পাই তার অভাবে—এটা পাকে প্রকারে জানাইলে কি হইবে! এটা ভালবাসা নয়, এটা কাম। স্থূলটাই সহজ হইয়া গিয়াছে—স্থূলে সুখভোগ যাহা সেটা ঘৃণিত কাম—কিন্তু চিত্তাকাশ ভিন্ন সঙ্গ নাই। চিত্তাকাশে ভয় নাই, লজ্জা নাই, তাই সাধকের পথ চিত্তাকাশ। চিত্তাকাশই ভক্তির মার্গ। বিনা ভক্তিতে ভালবাসা কোথায়? বিনা সাধনায় ভালবাসা নাই। যে দিক দিয়াই যাও চিত্তাকাশে মানস-পূজার নিত্য অভ্যাস ব্যতীত ঈপ্সিতমকে পাইবে না। চিত্তাকাশে স্থিতি ভিন্ন ধারণাভ্যাসী হইতে পারিবে না। ধারণাভ্যাসী না হওয়া পর্য্যন্ত ভালবাসার স্থায়িত্ব নাই। চিত্তাকাশের উপরে চিদাকাশ। সেখানে আমি তুমি নাই, সব আমি বা সব তুমি। এটা আপনা হইতে হইয়া যায়। এখানে সাধনা নাই, এখানে আছে সিদ্ধি। ইহাই জ্ঞান। জ্ঞান হইবার পরে যে খেলা সেই খেলাই নিত্যখেলা। সেই খেলাই আজও খেলা করেন সীতা রাম, হর পার্ব্বতী, রাধা কৃষ্ণ, মহাকাল মহাকালী, আদিনারায়ণ মহালক্ষ্মী, লোকপিতামহ ব্রহ্মা, মহা সরস্বতী। এই মিলনই সকল সাধকের অভীপ্সিত।

শাস্ত্রে শুনি ইহার ক্রম। কত মধুর, কত রসোদ্গারী, কত সুন্দর! চিত্তাকাশে যখন প্রথম দর্শন হয়—যখন নীলনলিনাভ চক্ষে চেয়ে চেয়ে ডাকা হয়—সুন্দর রূপ দেখিয়া সর্ব্বদা কাছে থাকিতে ইচ্ছা করে কিন্তু তখন পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি ধ্বংস হয় না বলিয়া সে বিহার করে না—কাম গন্ধ থাকে বলিয়া দর্শন স্থায়ী হয় না। একবার দর্শনে যখন প্রাণ উছলিয়া উঠে—কিন্তু তথায় থাকিতে পাওয়া যায়না বলিয়া একটা যাতনা হয়—তখন কাছে যাইবার জন্য প্রাণ কেমন ব্যাকুল হয়।

মিলন-আশা-ব্যাকুল সাধারণ নায়ক নায়িকার ভাব যেমন যদি চিত্তকাশে মিলনে সেইরূপ না হয় তবে আর ভালবাসা কি? কত সাজে সাজিতে ইচ্ছা

করে, কত যত্ন করিয়া বস্ত্র অলঙ্কার পরিতে ইচ্ছা হয়, কত যত্ন করিয়া বেশ বিন্যাস করিতে ভাল লাগে। একটু বিলম্ব হইলে প্রাণ কত ব্যাকুল হয়। কত ছট্ ফট্ করিতে করিতে ঘর বাহির করে—কোন কাজ নাই শুধু শুধু দাস দাসীকে ডাকিতে হয়—পাছে কেহ ব্যাকুলতা জানিতে পারে—মিছামিছি যাহাকে তাহাকে একটা কাজ করিতে বলিতে হয় পাছে কেহ সন্দেহ করে।

তার পরে যখন দর্শন মিলে? কত করিয়া সাধক তখন বলে—তুমি এত সুন্দর—আমার উপর একটু কৃপা কর আর আমাকে যাইতে বলিও না।

কিন্তু তখন ও প্রবৃত্তি যায় নাই। একটু প্রবৃত্তি পূর্ব্বক স্পর্শে পবিত্রতা কলঙ্কিত হইয়া যায়। তাই থাকিতে পায় না।

সাধক কত করিয়া আবার বলে? তোমায় ছাড়িয়া থাকাই আমার প্রাণান্ত। তুমি জানিতে কি পার যখন তোমার এই মধুর মূর্ত্তি দেখিয়াও আমাকে ছাড়িয়া যাইতে হয় তখন আমার দশা কি হয়? তোমার ছবি আমার সঙ্গে যায়—তোমার শ্বাস পর্য্যন্ত যেন আমাকে মাতাইয়া তুলে। আমার নিদ্রা থাকে না—কতই ডাকি—মনে হয় হায়! তুমি বুঝি আমায় কৃপা করিলে না—যদি করিতে তবে এসনা কেন? পরক্ষণেই আবার মধুর রূপ জাগে, প্রাণে আশ্বাস হয়—আবার কিছুই থাকে না—হরি হরি এ ক্লেশ ত বলা যায় না।

তোমার জন্য এই ভাবে ব্যাকুলতা যদি জন্মায় তবে বুঝি তোমার স্বরূপ দৃষ্টিপথে আইসে। কবে এ ব্যাকুলতা পূর্ণ হইবে?

কবে তুমি আসিবে? কবে তুমি চিরতরে তোমার কাছে রাখিবে? কবে আর বিদায় দিবে না?

এসব খেলা ভক্তি মার্গের। ব্যাকুলতা নাই ভক্তি করি, এ ভক্তিতে কপটতা আছে। এ ভক্তি সংসার-গন্ধি।

দর্শন পাইতে কত ক্লেশ? চিত্তাকাশে দর্শন কত সাধনার কার্য্য। বিশেষ যে শুধু নাম মাত্র পাইয়াছে তাহাকে কত করিয়া তবে নামের সজীবতা অনুভব করিতে হয়—কত করিলে তবে মন্ত্র চৈতন্য লাভ হয়।

যখন নামই "জীবন্ত সে" হইয়া যায়—চিত্তাকাশে নামের স্পর্শে তাহার স্পর্শ অনুভব হয়—অশ্রু-স্বেদ-পুলক তখন আইসে। সেই সঙ্গে সঙ্গে নাম নামী এক হইয়া জগতের সমস্ত বস্তুতে মিশিয়া যায়। সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। এইরূপ নাম-সাধনার ফলে জ্ঞান শীঘ্র লাভ হয়। তখন প্রবৃত্তি-মরণে মরণ-সঙ্গিনী পাওয়া যায়। ইহাই অনন্ত মিলন।

প্রাচীন রাজনীতি।

মদালসা অলর্ক উপদেশ দিতেছেন—প্রজাগণকে তাহাদের আপনাপন ধর্ম্ম অনুসারে পালন করাই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। রাজ-মন্ত্রণার বহির্গমন কিছুতেই হওয়া উচিত নহে। মন্ত্রণা বহির্গত হইয়া পড়িলে রাজাকে শত্রু কর্ত্তৃক অভিভূত হইতে হয় এবং রাজাকে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে হয়। অরাতিগণের দোষে অমাত্যবর্গ দূষিত হইয়াছে কিনা অর্থাৎ শত্রুগণ উৎকোচাদি দ্বারা অমাত্যবর্গকে দূষিত করিয়াছে কিনা রাজার ইহা জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা চর দ্বারা অরাতি চরদিগের গতিবিধি সযত্নে অনুসন্ধান করিবেন। কি মিত্র কি আপ্ত কি বন্ধু রাজা কাহাকেও বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু কার্য্য বশতঃ সময়ান্তরে শত্রুকে বিশ্বাস করিতে হয়।

রাজা কামের বশবর্ত্তী না হইয়া স্থান বৃদ্ধি ও ক্ষয় অবগত হইবেন। সন্ধি বিগ্রহাদি ষড়্‌গুণে তাঁহাকে বিভূষিত হইতে হইবে।

রাজা প্রথমতঃ আপনাকে, তৎপরে অমাত্যগণকে, তৎপরে ভৃত্য সমূহকে পরে পৌরবর্গকে বশীভূত করিয়া তবে অরাতি সহ বিরোধ করিবেন।

যিনি প্রথমে আত্মজয়ী না হইয়া-অর্থাৎ আপনার কাম ক্রোধাদি বশীভূত না করিয়া শত্রুগণকে পরাভূত করিতে বাসনা করেন সেই অজিতাত্মা মহীপতি অমাত্য কর্ত্তৃক বিজীত হইয়া শত্রুর বশীভূত হয়েন।

কাম ক্রোধ লোভ মদ মান হর্ষ ইহারাই অরি। ইহারা রাজাদিগের বিনাশের কারণ। পাণ্ডু রাজা কাম বশতঃই নষ্ট হয়েন। অনুহ্রাদ ক্রোধ বশতঃ পুত্রধনে বঞ্চিত হয়েন ঐল রাজা লোভ বশতঃ বিনষ্ট হয়েন। বেন রাজা মদবশে বিপ্রগণ কর্ত্তৃক নিহত হয়েন, অনায়ুষ পুত্র বলি অভিমান জন্য বিনষ্ট হয়েন এবং পুরঞ্জয় হর্ষ বশতঃ নিধন প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু রাজা মরুও ঐ সমস্ত রিপুকে পরাজয় করিয়া সংসার জয় করিয়াছিলেন।

শত্রুর প্রতি ব্যবহার—রাজা শত্রুর প্রতি কীটের ন্যায় ব্যবহার করিবেন অর্থাৎ কীট যেমন কোনরূপ আড়ম্বর না করিয়া দ্রব্যাদি কর্ত্তন পূর্ব্বক জর্জ্জরিত করে রাজা শত্রুকে সেই রূপ নিঃশব্দে জর্জ্জরিত করিবেন।

সঞ্চয়াদি—রাজা পিপীলিকার ন্যায় সঞ্চয়ী হইবেন। রাজা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও শাল্মলী বীজের ন্যায় ব্যাপনশীল হইবেন। সর্ব্বত্র আপন সত্তা স্থাপন করিবেন। রাজা চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় রাজনীতি প্রয়োগ পূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্য-

যেরূপ করিবেন। চন্দ্র সূর্য্য যেরূপ সকলের গৃহেই কিরণ বিতরণ করেন এবং কখন তীক্ষ্ণ কখন মৃদু হন, সেইরূপ রাজনীতি প্রয়োগ করিয়া উদয়শীল হওয়াই রাজার সমুচিত।

বন্ধকী, পদ্ম, শরভ, শূলিকা গুর্ব্বিনীস্তন ও গোপাঙ্গানা নরপতি এই সকলের নিকট প্রজ্ঞা শিক্ষা করিবেন। বন্ধকী যেমন পর পুরুষের চিত্ত বিনোদন করে নরপতিকেও সেই রূপে প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করিতে হইবে। তিনি পদ্মের ন্যায় সকল ব্যক্তিরই চিত্তহারী হইবেন, শরভের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিবেন। শূলিকার ন্যায় একবারেই শত্রুকে ধ্বংস করিবেন। গুর্ব্বিনীর স্তন যেরূপ ভাবী সন্তানের প্রতিপালনার্থ দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া রাখে, নরপতিও সেইরূপ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়শীল হইতে যত্ন করিবেন। গোপাঙ্গনা যেরূপ একমাত্র দুগ্ধদ্বারা নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করে, রাজাকেও সেইরূপ কল্পনা পটু হইতে হইবে।

বসুন্ধরা পালন করিতে হইলে ইন্দ্র সূর্য্য যম চন্দ্র বায়ু এই পঞ্চ দেবতার অনুরূপ আচরণ করিতে হইবে।

যেমন ইন্দ্র চারি মাস বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীবাসিগণকে আপ্যায়িত করেন, রাজাও সেইরূপ অর্থাদি দানে সকলের প্রীতিসাধন করিবেন। সূর্য্য যেমন রশ্মি যোগে আটমাস জল শোষন করেন সেইরূপ সূক্ষ্ম উপায়ে শুল্কাদি গ্রহণ করিবেন। কাল প্রাপ্ত হইলে যম যেরূপ কি প্রিয় দ্বেষ্য সকলকে নিগৃহীত করিয়া থাকেন, রাজাও সেইরূপ কি প্রিয় কি অপ্রিয় কি তুষ্ট, কি অতুষ্ট সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবেন। পূর্ণচন্দ্র সন্দর্শনে যেমন সকলের প্রীতিলাভ হয়, যাঁহার শাসনে প্রজাপুঞ্জ সেইরূপ সুখানুভব করে, সেই নরপতির আচরই প্রকৃত শশধরের অনুরূপ।

বায়ু যেরূপে গুপ্তভাবে সর্ব্বভুতেই বিচরণ করিয়া থাকে নরপতিও সেইরূপ চর দ্বারা পৌর অমাত্য ও বান্ধব প্রভৃতির চরিত্রাদি অন্বেষণ করিবেন। কাম লোভ কিম্বা অর্থবশে অথবা অন্য কোন কারণে যাহার মন সমাকৃষ্ট না হয় সেই নরপতিই স্বর্গে গমন করেন।

হে বৎস! যে রাজার রাজ্যে বর্ণ ধর্ম্ম বা আশ্রম ধর্ম্ম কোন প্রকারে অবসাদ প্রাপ্ত না হয় তিনি ইহ পরলোকে শাশ্বতসুখ উপভোগ করেন।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি বর্গের পরামর্শে নিরন্তর কার্য্য করা ও সকলকে স্বস্ব ধর্ম্মে স্থাপন করাই রাজার এক মাত্র কার্য্য এবং ইহাই তাঁহার সিদ্ধি লাভের কারণ।

রেজেষ্টরী নং A362.

দ্বিতীয় বর্ষ] ১৩১৪ সাল, মাঘ। [১০ম সংখ্যা

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ।

কাশী হাড়ারবাগ, মহালক্ষ্মী প্রেসে শ্রীঅক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

বিষয়

বিজ্ঞাপন।

ওঁ শ্রী আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২য় বর্ষ] ১৩১৪ সাল, মাঘ। [১০ম সংখ্যা

হংসগীতি।

শব্দেতে কি বুঝ্‌বি তারে?
সে যে— উপাদানে মা হ'য়ে যায়, নিমিত্তে বাপ্ একই হ'রে।
ছেড়েদে লৌকিকের ফাঁকি
চক্ষু বুজে বোস্ আপন জোরে
দেখ্‌বি— স্ত্রী-পুরুষে মাতা মাতি
ক্লীবের রতি নাই সে ঘরে॥ ১
কথার সঙ্গে অর্থ যায় কি
অর্থের সঙ্গে কথা ফেরে?
ওরে— ভাষা সব ইসারা মাত্র
যে ডোবে সে হারায় হেরে॥ ২
ওরে— দাঁতের উপর দাঁত বসিয়ে
ঠোঁটের উপর ঠোঁটটা যুড়ে
ওভাই— জিহ্বাটা রেখে আপন স্থানে,
শ্বাসের ঘায়েই মনটা মরে॥ ৩
শতাধিক চুয়াল্লিশ বারের
প্রাণায়ামে ধারণা রে
এটার— বার গুণে ধ্যানাবস্থা
তারও বারোতে সমাধিরে॥ ৪

হবে— নিশ্চয় মরণ উমাচরণ জেনে বল্লে আঙ্গুল নেড়ে
বদি— চাবি মোক্ষ করেরে লক্ষ বক্ষমাঝে প্রাণবায়ুরে ॥

বাণী।

চাহিনা ইন্দ্রত্ব আমি,
চাহিনা স্বরগ সুখ,
হে দেবি, হে অমৃত ভাষিণি।
কবির মানস-কুঞ্জে—
তুমি নিত্য ফুটি' থাক,
হে, আমার মানস-নলিনি।
হে আমার মধুলুব্ধে,
দিব্যনেত্রে অঞ্জন দায়িনি।
পুষ্পে পুষ্পে ফিরি ঘুরি—
মধু আহরণ করি,
এসো পুণ্য প্রভাতের নয়ন-রঞ্জিনি।
এসো সদ্য পরিস্নাত
সঙ্গীত অমিয়-ধারা
হে মুগ্ধে, হে ভুবন মোহিনি।
এসো তুমি ভীত ভীত,
মলয় সমীর মত—
আমার জীবন-পথে মৃদু প্রবাহিনি।
এসো শান্তি, এসো ক্ষমা,
ত্রিভুবন মনোরমা—
সুমঙ্গলা শুচি-বিলাসিনি।
এসো সাধ্বি, এসো বাণি
কবিতা-নিকুঞ্জ রাণি
পাদক্ষেপে রোমাঞ্চ ধরণী ॥

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অনন্ত জীবন ও অনন্ত মরণ।

মনের দুই স্রোত। মনের একপ্রকারের চিন্তা বিনা আহ্বানে আসিতেছে। অন্য প্রকারের চিন্তা আনিতে পরিশ্রম করিতে হয়। প্রথম চিন্তাস্রোত স্বাভাবিক। জীবনের কতেক বয়স পর্য্যন্ত ইহারা অবাধে চলিতে পায়না, বাধা প্রাপ্ত হয়। কিছু বয়স হইয়া গেলে এই স্বাভাবিক চিন্তা প্রবাহ বিনা বাধায় চলিতে থাকে। মানুষ তখন এই চিন্তার দাস। "চিন্তয়া জীর্ণ দেহ" যে কথা পাওয়া যায়, তাহা এই অবস্থার কথা। এই অবস্থাই মৃত্যু।

এই স্বাভাবিক চিন্তার প্রবাহকে উপেক্ষা করিয়া যিনি ভগবানের নাম, রূপ বা গুণ বা স্বরূপের চিন্তা প্রবাহ লইয়া থাকিতে পারেন—তিনিই যথার্থ পুরুষকার অবলম্বন করিয়াছেন। সর্ব্বদা পুরুষার্থ লইয়া থাকিতে পারিলেই অমরত্ব লাভ হয়। স্বাভাবিক চিন্তা প্রবাহে থাকাই মৃত্যু। স্বাভাবিক চিন্তা প্রবাহ, প্রথম প্রথম অগ্রাহ্য করিয়া, শেষে একবারে দূর করিয়া পুরুষার্থে থাকাই অনন্ত জীবন।

কে কতদূর মরিতেছেন বা জীবন পথে চলিতেছেন ইহাই তাহার পরীক্ষা।

শুধু ভগবানের নাম জপ, রূপ ধ্যান ও গুণ স্মরণ এবং স্বরূপ চিন্তা ভিন্ন অন্যভাবে যিনি চেষ্টা করিতেছেন সে চেষ্টাকে পুরুষার্থ বলেনা। বলে উন্মত্ত চেষ্টা। সংসারের কর্ত্তব্য পালন জন্য কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করিতে না পারিলে উন্মত্ত চেষ্টাই হয়।

উন্মত্ত চেষ্টায় অনন্ত জীবন লাভ হয় না। অধিকারী ভেদে ইহাতে স্বর্গ পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। তাহার পরেই পতন আছে। অনন্ত জীবন লাভ হইবে প্রকৃত পুরুষার্থে সর্ব্বদা থাকিতে পারিলে।

মিলন পিপাসা।

জ্ঞান মার্গের মিলনের কথা বলা হইতেছে না। এখানে অজ্ঞানের নাশকেই মিলন বলে। এই মিলনের নাম স্বরূপে স্থিতি। আমরা বলিতেছি ভক্তি মার্গের কথা।

"আমার সাধ না মিটিল" "আশা না পূরিল" ইহাই কত জীবের কাতরোক্তি। কোন্ মিলন পিপাসায় জীব ব্যাকুল? কেন এ হাহাকার? কেন শুনা যায়—

"কতদিনে ঘুচব ইহ হাহাকার!
কতদিনে ঘুচব গুরুয়া দুখ ভার!
কতদিনে চাঁদ চকোরে হব মেলি!
কতদিনে ভ্রমর কমলে কুরু কেলি"!

কোন্ সাধ মেটেনা বলিয়া জীব দুঃখ করে? কোন্ আশা পূর্ণ হয়না বলিয়া জীব গুরুদুঃখ ভারে ব্যথিত হয়?

পরিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছিন্নে মিলিতে চায়, খণ্ড অখণ্ডে মিলিতে চায় ইহাই প্রকৃত মিলন! আর এক প্রকার মিলন আছে যেখানে পরিচ্ছিন্ন পরিচ্ছিন্নে মিলিত হয়, যেখানে খণ্ড খণ্ডে মিলিত হয়, সেখানে সমান সমানে মিলিতে চায়। শেষোক্ত মিলনেও সুখ নাই, আপাততঃ একটু সুখের প্রলেপ পাইয়া ক্ষণিক আনন্দ হয় মাত্র। কিন্তু এ সুখ দুঃখেরই অন্যরূপ। ইহা সুখগন্ধি দুঃখই। নতুবা যে বিবাহে স্ত্রী পুরুষের একটা মিলন হয় তাহাতে এত প্রচুর দুঃখ কেন উঠে? দুই দিন পরেই স্ত্রী পুরুষের এত বিতৃষ্ণা হইয়া যায় কেন? তবে কি প্রকৃত বিবাহ ইহা নহে? প্রকৃত বিবাহ তাহার নাম যেখানে এক হৃদয় অন্য হৃদয়ে মিলিত হইয়া—এক ইচ্ছা অন্য ইচ্ছায় মিলিয়া বললাভ করিয়া সেই পূর্ণ হৃদয়ে মিশিতে পারে। খণ্ড খণ্ডে মিলিয়া, পরিচ্ছিন্ন পরিচ্ছিন্নে মিশিয়া, বল লাভ করিয়া, সেই অখণ্ডে অপরিচ্ছিন্নে মিলিত হইতে পারে। ইহা যেখানে নাই সেখানে হাহাকার মিটিতে পারেনা; সেখানে গুরু দুঃখ ভার যায়না।

ধর্ম্ম জীবন ভিন্ন মানুষের সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি হইতেই পারে না। এই বিশ্বাসে আজ জগতের কত নর নারী ধর্ম্ম আচরণ করিতে ছুটিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম আচরণ করিয়া কয় জন জুড়াইয়াছেন? কেন জুড়াইতে পারে না তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

আমরা সকল সম্প্রদায়ের কথা বলিবনা সাধারণতঃ লোকে যাহা অবলম্বন করিয়াছে তাহাই আমরা আলোচনা করিতে চাই।

ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি। শাস্ত্র বলেন অন্যান্য দেশ ভোগভূমি। একথা পূর্ণ সত্য। ভারতের লোকের ব্যবহার, ভারতের লোকের ত্যাগ স্বীকার, ভারতের লোকের প্রার্থনা, যাঁহারা অল্পমাত্র আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই একথা ধারণা করিতে পারেন। ভারতের লোক স্বর্গও চায়না, অমরাবতী পাইলেও জুড়াইতে পারে না—ইহারা চায় পূর্ণের সহিত মিলিতে—নতুবা

ইহাদের জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। ভারতের ঋষি শিক্ষা দিলেন "ভুবি ভোগা ন রোচন্তে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে"। ভুবি ভোগ তুচ্ছ—কেননা ক্ষণিক, স্বর্গ প্রার্থনার বস্তু নহে—কেননা "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"। পুণ্য ক্ষয় হইলে আবার দুঃখসাগর স্বরূপ এই সংসারে পড়িতে হইবে। যেখানে গেলে আর পতন নাই, যেখানে গেলে আর ফিরিতে হইবেনা, যেখানে গেলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, যেখানে থাকিলে নিত্য আনন্দে স্থিতি, তাহাই ভারতের শিক্ষা।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি জন্য বহু উপায় ভারতের লোক জানেন। বহু লোক বহু সাধনা অভ্যাস করিতেছেন। আমরা সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে প্রচলিত যে মন্ত্র জপ তাহাতেই ইহা অনুস্যূত কিরূপে, তাহাই আলোচনা করিতেছি।

সাধক ও ইষ্টদেবতা; গুরু ও শিষ্য; স্বামী ও স্ত্রী ইহাদের মিলন পিপাসা মিটাইবার জন্য জপ যজ্ঞ। স্থূল শরীরকে তীর্থে লইয়া গেলে তীর্থের সহিত স্থূলে মিলন হয়; কিন্তু সূক্ষ্মশরীর হইতেছে মন, মনকেও যেখানে লইয়া যাওয়া যায় সেখানেও প্রিয়ের সহিত ইহার মিলন হয়। সূক্ষ্মে থাকিয়া স্থূলে মিলন ইহাও প্রশস্ত। ভক্তগণ মানসিক মিলন অভ্যাস করেন। এই মানসিক মিলনের সুখ যত বিশুদ্ধ, স্থূল মিলনের সুখ সেরূপ নহে। যাঁহাদের জড়ত্ব বেশী তাঁহারাই স্থূল মিলনের জন্য ব্যাকুল। ইহারা তম প্রকৃতির লোক। কিন্তু সাত্ত্বিক প্রকৃতির সাধক সূক্ষ্ম মিলনেই অধিক সুখ অনুভব করেন। মন্ত্র, গুরু, স্বামী এই সূক্ষ্ম মিলনই দেখাইয়া দিয়া থাকেন। ভক্তি জগতে মন্ত্রজপ, মানসপূজা, লীলাচিন্তা এই সূক্ষ্ম মিলনের জন্য। শাস্ত্র বলেন—

"এই জগতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল জাতি সকল শরীরীই সর্ব্বদা দ্বিশরীরী। তন্মধ্যে মনঃশরীরই ক্ষিপ্রকারী ও সর্ব্বদা চঞ্চল। অন্য মাংস—নির্ম্মিত দেহ অকিঞ্চিৎকর তাহার কোন ক্ষমতা নাই। ঐ মাংসময় শরীরই শাপ, অভিচার ক্রিয়া প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়। ঐ দেহই মূকপ্রায়, অশক্ত, ক্ষণভঙ্গুর, পদ্মপত্রগত সলিলের ন্যায় চঞ্চল ও দৈবাদির বশে অবস্থিতিমান। কিন্তু মনোময় শরীর প্রাণিদিগের আয়ত্ত হইয়াও আয়ত্ত হয় না। যদি কেহ সর্ব্বদা স্বকীয় পৌরুষ ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতে পারেন, তবে দুঃখাদি আসিয়া তাঁহার চিত্ত—দেহকে আক্রমণ করিতে পারেনা ও দূষিত করিতে পারেনা। দেহীগণের ঐ মনোদেহ যে যে প্রকারে যত্নবান হয় সেই সেই প্রকারেই উহা স্বীয় দৃঢ় প্রযত্নে ফল প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মাংসময় শরীরের কোন পৌরুষই সফল হয় না। মনোদেহের সকল চেষ্টাই সফল হয়।

যে চিত্ত সর্ব্বদা পবিত্র বিষয়ের স্মরণ করে, তাহাতে শাপ প্রভৃতি সকল ক্রিয়াই শিলায় বাণক্ষেপবৎ নিষ্ফল হয়। মাংস শরীর কর্দ্দমে জলে বা বহ্নিতে নিপতিত হউক না কেন, মন যাহার অনুসন্ধান করে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হয়।

কৃত্রিম ইন্দ্র পৌরুষ বলেই অন্তঃকরণকে প্রিয়াময় করিয়া কোন প্রকার দুঃখই অনুভব করেন নাই। মাণ্ডব্য মুনি শূলে আরোপিত হইলেও মনকে বিষয় বিহীন ও বিগত জ্বর করিয়া সমুদায় ক্লেশ জয় করিয়াছিলেন।

দীর্ঘতপা ঋষি যাগ করিবার অভিলাষে যাগোপকরণ সংগ্রহার্থ বহির্গত হইয়া অন্ধকূপে নিপতিত হন, পরে সেই কূপ মধ্যেই মানসিক যজ্ঞ করিয়া বিবিদ পদ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। ইন্দু পুত্রগণ মানুষ হইয়াও ধ্যান বলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

দেখান হইল—যাহা পাইলে তুমি জুড়াইতে পার সেইটি বেশ করিয়া বিচার করিয়া নিশ্চয় করিয়া লও, করিয়া তাহার সহিত মনোময় শরীরে নিরন্তর জড়াইয়া থাক, তুমি নিশ্চয়ই তোমার প্রাণের প্রাণকে পাইবেই। কিন্তু যাহাকে তাহাকে যদি প্রাণের প্রাণ বলিয়া নিরন্তর স্থূলে মিলিতে চাও তবে তুমি বহুবার জনন মরণ স্রোতে পড়িবে।

তাই অগ্রে প্রাণের প্রাণকে ঠিক করিয়া লও। মন্ত্রতন্ত্র আমাদিগকে সেই রমণীয় দর্শনকে দেখাইয়া দিতেছেন এবং তাহার কাছে লইয়া যাইবার জন্য জপ যজ্ঞ বিধান করিতেছেন।

শাস্ত্র মত মন্ত্র যে গুলি, সেগুলিতে প্রণব বা অধিকারী ভেদে প্রণবের প্রতিনিধি স্বরূপ কিছু, বীজ ও নাম আছে। শ্রুতি বলিয়া দিতেছেন—ইহার প্রথমটি "আত্ম স্বরূপম্" মধ্যটি "প্রকৃতি স্বরূপম্" শেষটি "পরব্রহ্ম স্বরূপম্"। পরে বলিতেছেন "ইতি য এবং বেদ। সোঽমৃতো ভবতি।"

আত্ম স্বরূপও যাহা, পরমাত্মা স্বরূপও তাহাই, তথাপি জীবে ও শিবে যে ভেদ তাহা অজ্ঞানজ। আত্ম স্বরূপকে প্রকৃতি সাহায্যে পরব্রহ্ম স্বরূপে মিলাইতে হইবে—ইহাই মন্ত্র ব্যাখ্যা। প্রকৃতিই শক্তি। শ্রুতি বলেন ওঁ শ্রীগুরুঃ সার্ব্বকারণ ভূতা শক্তিঃ। ওঁ শ্রীগুরুই এই শক্তি। তিনিই মাতা। মাতার সাহায্যে খণ্ড অখণ্ডে, পরিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছিন্নে মিলিত হইবে। মাতাই মিলাইয়া দিবেন। জীব একটা অবিদ্যা বশে আপনাকে পরিচ্ছিন্ন মনে করিয়া রাখিয়াছে। শক্তি উপাসনা করিতে করিতে অপরিচ্ছিন্নকে পরিচ্ছিন্নের উপর ধারণা করিতে করিতে আপনাকে অপরিচ্ছিন্ন দেখিতে পাইলেই ইহাঁর সকল আশা মিটিবে সকল সাধ পূর্ণ হইবে।

লবণ পুত্তলিকা আপন উৎপত্তি স্থান যে সমুদ্র তাহা মাপিতে গেলে গলিয়া সমুদ্রই ত হইয়া যায়—"ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি" শ্রুতিও ত ইহাই বলিতেছেন। তবে ভক্তের মিলন কিরূপে হইবে? অনন্ত কাল দাস বা দাসী হইয়া সেবা করা যাইবে কিরূপে? ইহার একমাত্র উত্তর যাহার জন্য প্রবল সংকল্প করা যায়, যাহার জন্য তীব্র ভাবনা করা যায় তাহাই লাভ হয়। ভগবানের সহিত এক হইয়াও তীব্র ভাবনা বলে ভক্ত আপনাকে পৃথক রাখেন—চিরদিন দাস বা দাসী হইয়া সেবা করেন ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। জ্ঞানীও অদ্বৈত ভাবে নিত্য থাকিয়াও দ্বৈত ভাবে খেলা করেন। যেমন নির্গুণ ব্রহ্ম সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকিয়াও অবতার হইয়া রঙ্গ করেন, অথবা পাপী আপনার চরিত্র সর্ব্বদা জানিয়াও ভদ্র সমাজে ভদ্র লোক হইয়া নানা কার্য্য করেন সেইরূপ। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা গেলনা—যাঁহার যেরূপ অধিকার তিনি সেইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

চিত্তস্পন্দন।*

(শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য বি এ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক)

"চিত্তস্পন্দন" একখানি সরস কবিতা-নিবন্ধ হ্রস্বায়তন গ্রন্থ। উপহার পাইলাম সমালোচনার জন্য। মূল্য আট আনা মাত্র।

উপহার পাইয়া সুখী হইলাম। প্রথমে কিছু শিহরিয়া ছিলাম—সমালোচনা করিতে হইবে জানিতে পারিয়া। একটু অহং ভাবও জাগিয়াছিল, মনে হইয়াছিল "সত্যংব্রুয়াৎ প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াৎ এষঃ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ"। গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে কিন্তু মনে মনে চমক পাইতে লাগিলাম। সলজ্জ সঙ্কোচে মনে মনে বলিতে হইল কবি অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ না করিলেই ভাল হইত। লোচন হীনের সমালোচনা সাজেনা। আশঙ্কা হইতেছে পাছে "পড়িয়া ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।"

গ্রন্থ খানি দেখিতে ছোট। তা' ছাড়া আর কোন অঙ্গে বড় একটা ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছিনা। কবি প্রতিভায় মৌলিকতা ও কল্পনার কর্কশতা কদাচিৎ দৃষ্টি গোচর হয়।

প্রথমেই অল্প কথায় একটি উপহার। কবির মৌলিকতা দেখাইবার জন্য আমরা উপহারটি উদ্ধৃত করিতেছি। বড় সুন্দর কথায় কবি আপন

---

* ১৯নং তারক চাটুয্যির লেন। কলিকাতা, শ্রীরামদয়াল দের নিকটে পাওয়া যায়।

উপাস্য বস্তুতে আত্ম সমর্পণ দেখাইয়াছেন। কবি উপাস্যের সহিত এক প্রাণ হইয়াছেন কেবল খেলার জন্য একটা "অহং" ব্যবধান রহিয়াছে। কবি যে নিজে লিখিতেছেন তাহাও বলিতে যেন চান না। তাঁহার যেন কোন কর্ম্ম আর নাই তবে যে কর্ম্ম চলিতেছে একর্ম্ম কবির নহে তাঁহার উপাস্যের। তিনি যে কবিতা লিখিয়াছেন এ খেলাও যেন তাঁহার নহে কবি বলিতেছেন।

"তুমি গাঁথিয়াছ আজ কবিতার হার"
"দেখি কত সাজে নাথ পর এক বার"

ভগবানের বস্ত্র ভগবানকে দিতে বড় সুখ। ভগবান আপনি পরেন না। কবি তাঁহার 'কবিতার হার' তাঁহাকে পরাইয়া নিজের সাধ মিটাইতেছেন। পাঠক ও পাঠিকা এ উপহারে বহু সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন। কবি বলিতেছেন—

নয়নে তপন তব মনে সুধাকর,
প্রতি লোমকূপে প্রভু বিশ্ব চরাচর,
নেত্র উন্মীলনে দিবা মুদিলে রজনী,
বুদ্ধে বৃহস্পতি, তব বাক্যে বীণাপাণি,
সকলই তোমার গুরো! কি আছে আমার,
হৃদি যে পূজিতে চায় এ সাধও তোমার।
বিশাল সাগর বক্ষে তরঙ্গের মালা,
তুলিয়া যেমন খেল এও সেই খেলা।
তোমায় আমার প্রভু একই পরাণ,
পূজার কারণ বুঝি "আমি" ব্যবধান।
তুমি গাঁথিয়াছ আজ কবিতার হার,
দেখি কত সাজে নাথ—পর একবার।

শেষের ছত্র জীবন্ত। আমারা যেন দেখিতে পাই কবি হার পরাইয়া দিতেছেন। "বালা যোগীর আশ্রম" শীর্ষক কবিতাটি পরিস্ফুট ভাবে কবির কল্পনা, কবির চিত্র অঙ্কন শক্তি, কবির জ্ঞান পিপাসা—প্রভৃতি বহু প্রতিভার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। নিম্নে প্রতিভাময়ী বর্ণনার একটু আভাস দেওয়া গেল। সমগ্র কবিতা না পড়িলে সর্ব্ব রসের সমাবেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

কবি হৃষিকেশ পরে লছমন ঝোলার দৃশ্য সম্বন্ধে বলিতেছেন।

সুন্দর পর্ব্বত মালা! সুন্দর জাহ্নবী!
পর্ব্বতের কোলে কোলে গঙ্গার প্রবাহ!
হিমাদ্রি দেখিয়া হেথা মনে ভ্রম হয়,
যেন বা মেনকা রাণী উমার বিদায়ে—
কাঁদিয়া—দাঁড়ায়ে আছে পশ্চাৎ ফিরিয়া—
উমার গমন পথ না পারি দেখিতে।
সীমন্তের দুই ধারে মুক্ত কেশ পাশ—
এলায়ে পড়েছে যেন পর্ব্বত আকারে।
প্রভাতে তপন উঠে পর্ব্বত পশ্চাতে,
সিন্দুরের টিপ্ মত মেনকার ভালে।

বালা যোগীর বর্ণনা বড় সুন্দর।

সুনীল আসনে বসি—স্থির সুখাসনে
বালা যোগী—অঙ্গে মাখা কোটি-সূর্য্য আভা—
চন্দ্র কোটি সুশীতল! কপালে চন্দ্রমা—
আঁখি তারা থির—বাঁধা তৃতীয় নয়নে—
মৌলিবদ্ধ জটাতলে। এখানে ওখানে,
মৌলিমুক্ত কেশ গুচ্ছ এসেচে নাবিয়া,
চন্দ্রাগ্নি উজ্জ্বল নীল কুন্তল ছাড়িয়া,
বিধুখণ্ড বিমণ্ডিত সুকোমল ভালে।
ভ্রমর তারকা—মধুপানে মত্ত হ'য়ে
ডুবিয়াছে আঁখি পদ্মে—উড়িতে না পারি।
চারুমুখে বিম্ব ওষ্ঠ—কহনে না যায়,
কি শোভে অলক্ত রাগ তুষার কমলে।

বর্ত্তমান সময়ের পল্লব-গ্রাহী তরল কবিতার যুগে এতাদৃশ উচ্চ অঙ্গের কবিতা বাস্তবিক বিরল। বসন্তের মধুমক্ষিকার ন্যায় লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে কবিকুল আবির্ভূত হইয়া বঙ্গের সারস্বত কুঞ্জ নিত্যই মুখরিত করিতেছে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই এখন কবি। স্বাধীনতার প্রস্রবিণী অন্য সকল দিকে বাধা প্রাপ্ত হইয়া কবিতা প্রসঙ্গে শতমুখে ছুটিতেছে। ভাষার খরস্রোত ভাবের শতশত সেতু শতধা বিভক্ত করিয়া বড়ই রঙ্গে ভঙ্গে প্রধাবিত হইতেছে। একালের কবিতায় ভাষার পারিপাট্য ও চাকচিক্য প্রচুর পরিমাণেই আছে, কিন্তু ভাষা ব্যতীত আর সমস্তই প্রায় ভাসা ভাসা। এই ভাব-বিরল উত্তম অঙ্গহীন কবিতা-কবন্ধের স্বর বড়ই মধুর। মুষ্টিমেয় বঙ্গ কবি এই সাংক্রামিক ব্যাধি হইতে অধিকাংশেই নির্ম্মুক্ত।

সাধারণতঃ খণ্ডকাব্য দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। বাহ্য-প্রকৃতির সুমধুর-ভাব কবি-হৃদয়ে যে ঝঙ্কার তুলিয়া দেয় কবির হৃদয় তন্ত্রী সেই মধুর

ভাবে বাজিয়া উঠে প্রকৃতি নিজেই কবির হস্তে লেখনী অর্পণ করেন। প্রতিভা সম্পন্ন কবি প্রকৃতির ভাবে আবিষ্ট প্রায় হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ প্রকৃতির ভাষা প্রকৃতির ভাব পত্রস্থ করেন। ভাব-ভাষার অপূর্ব্ব মিলনে অনায়াস-লব্ধ নিসর্গ-সুষমা-বহুল এই শ্রেণীর কবিতাবলী বসন্তের কোকিল-বধূর কূজনের ন্যায় বড়ই প্রাণস্পর্শী, বড়ই তৃপ্তিপ্রদ হয়। স্কটিস্ কবি বারন্সের কবিতাবলী এই শ্রেণীর উচ্চ অঙ্গের উদাহরণ। ইহা হইতেও উচ্চতর অঙ্গের এক প্রকার খণ্ডকাব্য আছে। অন্তর্দৃষ্টি-প্রবণ কবি যখন যোগ-রত তাপসের ন্যায় আপনার শক্তি গুলিকে বহির্জ্জগত হইতে গুটাইয়া আনিয়া আপনাতেই স্থির করেন, যখন হৃদয়ের স্তরে স্তরে আপনার বিশ্বমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে আপনিই মুগ্ধ হয়েন, যখন আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলেন, যখন ওয়ার্ডওয়ার্থের "Thonght was not" এর মতন হইয়া যান in enjoyment it expires এর মতন হইয়া যান, যখন সর্ব্বচিন্তা পরিশূন্য হৃদয়ে All blessedness and Love হইয়া যান—এক কথায় কবি যখন পরিপক্ক বা অপরিপক্ক সমাধি অথবা সমাধির পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হয়েন, তখন তিনি যে সান্দ্রানন্দ সুধাসমুদ্রে অবগাহন করেন, সমাধি ভঙ্গেও সেই আনন্দ-ঘন-ভাবাবেশ তাঁহার হৃদয়পটে জাগরূক থাকে। সেই রসে-বিগলিত হৃদয় লইয়া, কবি যখন বাহ্য প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখন সমগ্র জগৎ তাঁহার সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তখন কবি সমস্ত বিশ্বমণ্ডল স্বীয় হৃদয়রঙ্গে রঞ্জিত করেন। পূর্ব্বে দেখিয়াছি প্রকৃতির অধীন কবি, এখন দেখি কবির অধীন প্রকৃতি। প্রকৃতি শৈলূষীর ন্যায় কবির অভিপ্রেত বেশভূষায় সজ্জিত এবং তাঁহারই ভাবে ভাবিত হইয়া অতি সুন্দর রূপে কবির চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করিয়া, তাঁহারই ভাবগুলির অভিনয়ে আপনাকে চরিতার্থ মনে করেন। এই শ্রেণীর কবির সংখ্যা বড়ই বিরল। আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য কবিতাগুলি এই শ্রেণীরই অন্তর্ভূত। এই শ্রেণীর কবিগণ প্রায় সকলেই সাধক। ইংরাজ কবি ওয়ার্ডওয়ার্থকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে করা যাইতে পারে। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের স্তবাবলী ও বঙ্গকবি জয়দেবের গীত-গোবিন্দ এই শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ উদাহরণ।

আমাদের কবি গোলাপকে অবলম্বন করিয়া ৬টী কবিতা লিখিয়াছেন, কবিতা গুলি সকলই অতি সুন্দর। ইহারা সৌন্দর্য্য ও মধুরতার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের অভ্যন্তরে কবির সাধনার কথাই প্রকাশ করিতেছে। বাস্তবিক গোলাপ গোলাপই নহে। কবির সাধনা বিভিন্ন অবস্থাতে বিভিন্ন প্রকারে গোলাপ রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা এখানে কয়েকটী স্তবক মাত্র উদ্ধৃত করিব।

সাধে কি গোলাপ তোরে এত ভাল বাসি।
সাধে কি ও রাঙ্গা পায় পরাণ ছুটিয়া যায়
সাধেকি তোমার ভাবে ঝুরি দিবানিশি।
সাধে কি হৃদয় খানি ওপদে দিয়াছি আমি
সাধে কি হেরিতে চিত ইতি উতি ধায়।

কি জানি কি ভাব মাখা আধ খোলা আধ ঢাকা
জীবন তরঙ্গে মোর নাচিয়া বেড়ায়।
কি জানি ও কচি ফুলে কি জানি সৌন্দর্য্য বুলে
কি জানি কি হিজি বিজি আঁকা ও পাতায়।
কি জানি কি ছাই রাই বলিতেও ভাষা নাই
পাতায় পাতায় তোর হেলে দুলে যায়।

আবার দেখি—

কাঁটায় কাঁটায় তুমি ধর এত বল,
কণ্টক নহেত তব প্রেমের শিকল।
কি দিয়া বাসিব ভাল খুঁজিয়া না পাই।
যা দিব তোমারে সই! তুমি যে লো তাই।
কে আঁকিল তোরে সখি! বিরলেতে বসি,
সাধে কি গোলাপ তোরে এত ভাল বাসি।

নশ্বর জড়ের সনে হয় কি সাধন বিনে
দেবতার সম্মিলন কখন হেথায়।
অজ্ঞান অলপ মতি দেখিয়া পাইনু প্রীতি
তুলিয়া লইনু তোরে আদরে হিয়ায়।

অন্যত্র— দেখ সে কেমন করে নিদ্রিত বদন পরে
সহস্র সাধেতে সে যে তোর পানে চায়,
এত স্নেহে ফুল রাণি কেন হও বিষাদিনী
কেন বা শুখায় মুখ কি দুঃখ হিয়ায়।
কণ্টক এতই দেখে ব্যথা বুঝি পাও বুকে
এ কাঁটা রক্ষার তরে তাও কি জান না।
অনন্ত নয়ন যার গোপন কি থাকে তার
ছিছি কি লজ্জার কথা তবুও সন্তাপ।
কেন এ রোদন বল মুছে ফেল অশ্রুজল
কাঁদিলে কাঁদিবে সেযে কি দিবে উত্তর।
হায় সখি উষা সনে আবার প্রফুল্লাননে
হাসিবে হাসিলে তুমি সেও নিরন্তর।

গোলাপ কবির সাধনার বস্তু। বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতায় দেখি "অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরি ভেলি মাধাই। এই কবির বহুস্থানেই সাধনার বস্তুতে আত্মভ্রান্তি দেখিতে পাই। গোলাপ লিখিতে লিখিতে কবি আপনিও গোলাপ হইয়া যাইতেছেন, কখন বা কোন এক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া গোলাপকে সান্ত্বনা করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখন কখন উন্মত্ত হইয়া মুই সেই মুই সেই করিতেন। ভক্ত প্রহ্লাদ উপাসনা করিতে করিতে হরি হইয়া যাইতেন, তখন আপনি বলিয়া উঠিতেন আমিই সচ্চিদানন্দ পুরুষ,

আমিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। এই কবির সাধনায় বহু স্থানে আমরা এই সাধনার সর্ব্বোচ্চ ভাব লক্ষ করি।

অন্যদিকে আমরা ইহাও দেখি যে কবির অমৃতময়ী তুলিকা জ্ঞান ও ভক্তির তত্ত্বগুলি অতি মধুর ও প্রাঞ্জল ভাবে চিত্রিত করিয়াছে।

"মামেবৈষ্যসি—ভক্তি যোগ" মানস পূজার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত। "মামেবৈষ্যসি—জ্ঞানযোগ" ভক্তি-বিচারতত্ত্ব সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিতেছে। আমরা অন্যান্য কবিতা হইতেও ইহা দেখাইতেছি।

রূপবান হও রূপাতীত নও,
অথবা উভয় ভাবি বারে বার,
কত করে গড়া এই তব ধরা
আকাশের তলে কি সুন্দর মরি।
সকলে দেখাতে আলো লয়ে হাতে
দাঁড়ায়েছ আসি চন্দ্র সূর্য্য পরে।
গড়ি ফুল রাশি মিলায়েছ হাসি
ফুল বালা হাসে চেয়ে তোমা পানে।
তাই ফুল চয় সারা ধরা ময়
ঢালে সুধা বুঝি হাসি প্রাণে প্রাণে।

অন্যত্র— খেলার পুতুল আমি খেলিছেন বিশ্বস্বামী
হায়রে একথা মনে হয়নি তখন।
কখন বালিকা গড়ি কভু বা যুবতী নারী
কখনও বৃদ্ধ জরা শিরে শুভ্রকেশ।
কভু বা সাজায়ে রাণী কভু করে ভিখারিণী
কখনও গৈরিক বাসে আবরিছ কায়।
নিতুই ত এই খেলা খেলিছি শৈশব বেলা
আজ দেখি সেই খেলা সারা বসুধায়।

কবির বুদ্ধি শাস্ত্রোজ্জ্বলা। বেদান্তের তত্ত্বগুলি অতি সরস ও বিশদ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

অহো সংসার স্বপন!
স্বপ্নে হয় স্বপ্নে লয় স্বপ্নে মৃত্যু স্বপ্নে ভয়
স্বপ্নে কত বিভীষিকা স্বপ্নে আস্ফালন
স্বপ্নে শুয়ে হাহা হুহু গিরি আরোহন।
একি রহস্য তোমার
একা খেলা নাহি হয় একা বহু তাই হও
আপন কল্পিত সৃষ্টে আপন বিস্ময়
'অন্য কেহ' 'নহি নহি' আমিই নিশ্চয়।
চন্দ্রেতে চন্দ্রিকা সূর্য্যে দীধিতি যেমন
আমাতে আমার মায়া সহজে তেমন।

প্রায় সর্ব্বস্থানেই এই বৈষ্ণব কবি সুলভ ভক্তি রসে অভিষিক্ত হইয়া কবির মনোবৃত্তি গুলি বড়ই শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে।

আসিবে না যদি তুমি, কে আসিতে বলে,
ইহাতে পরাণ মম দ্বিগুণ যে জ্বলে।
নেচে নেচে এস কাছে ধরি শ্রীচরণ
হিয়ায় থুইয়া সদা করি নিরীক্ষণ।
ধীরে ধীরে তুমি যবে আসিছ হৃদয়ে,
প্রতি পদ ক্ষেপে পদ্ম উঠিছে ফুটিয়ে ;
মধুগন্ধ লোভে অন্ধ কত ভৃঙ্গ তায়
পাদ পদ্মে হৃদি পদ্মে গুঞ্জে গুঞ্জে ধায়,
শ্যাম নীল সরোরুহে সোনার ভ্রমরী
সব ভুলে লাগি রহ দিবস শর্ব্বরী।
আলোল কবরী ভার মুখ শশী তায়,
কাল মেঘ কোলে চাঁদ ভাসিয়া বেড়ায়।
তোমার মধুর রূপ কি বলিব আমি,
হিয়ায় থুইয়া পদ না দাঁড়ালে তুমি,
শিব চক্ষে আঁখি থুয়ে সেই আখি নিয়ে—
চাহিলে তোমার পানে কি আসে ভাসিয়ে।

কবি আবার বলিতেছেন—

না বুঝে বেসেছি ভাল গোলাপ তোমায়
মূলেই আমার ভুল তুমি যে স্বর্গের ফুল
অমৃত স্বরূপ তুমি এ মরু ধরায়।
নশ্বর জড়ের সনে হয় কি সাধন বিনে
দেবতার সম্মিলন কখন হেথায়।
আবার— শূন্যে শূন্যে সম্ভাষণ শূন্যে শূন্যে আলিঙ্গন
কেন প্রভু দাসী কিসে অপরাধী পায়।
শত গাঢ় আলিঙ্গনে চিত থির নাহি মানে
শূন্য পরশনে সখে বুক বাঁধা দায়।
বালিকা কলিকা কালে পুতুলেরে সব বলে
স্বামী পেলে আপনিই মাটী ভুলে যায়।
ইন্দ্রিয় পাগল হয়ে ছুটেচে যে তোমা লয়ে
শুধু ঘুম ঘোর দিয়া ফিরাবে তাহায় ?
এক বার কাছে এসে ডাক নাথ হেসে হেসে
তুমিই আমার প্রিয় সাধনার ফল।
সিদ্ধি ফল হাতে পেয়ে কাঁদি গো আপনা খেয়ে
অবলার অপরাধ নাহি ধর ছল।

অবলা অলপ মতি যদিও চঞ্চল অতি
থির কর প্রাণেশ্বর মরি যাতনায়।
শ্রীপদ মস্তকে রাখি সব যেন ভুলে থাকি
বড়ই শীতল প্রভু চরণ তোমার।
প্রাণের ঈশ্বর তুমি বড় অবিশ্বাসী আমি
আমি দাসী অপরাধী ভুলায়ো না আর।

আবার— (তুমি) গোপতে গোপতে ফের সাতে সাতে
গোপনে কেনবা সাধন কর,
নিদাঘ অনলে মুখানি ঘামিলে
কেন বায়ু তুলে ব্যজন কর।
নমঃ প্রাণাধার বলি শত বার
গোপনে পড়িব আমি যবে পায়,
(তুমি) গোপনে হাসিবে আমাকে দেখাবে
তোমারি এরূপ রূপ সমুদয়।

আবার— অধরে টিপিয়া হাসি দাঁড়াল শশাঙ্ক আসি
আঁটিয়া পরিল ধরা জোছনা বসন।
হাসিত বদনে নাথ ধরিয়া আমার হাত
কহিল বলত দেবি! কে বেশি সুন্দর,
কত স্নেহ দয়া তার কতবা বলিব আর
আমা হতে কোটিগুণে সে যে গো কাতর।
রাখিয়াছে মোরে দূরে একথা না মনে ধরে
অথবা কঠিন আজি আপনা উপর।

ইত্যাদি :—

"শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে" দুই চারিটি স্থানে না আছে তা নয় এবং বর্ণাশুদ্ধি আছে বহু। তবে "অল্পোহি দোষো গুণসন্নিপাতে। নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণে ষ্বিবাঙ্কঃ" মিলটন ও কালিদাসের ন্যায় মহাকবিও ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য সর্ব্বত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই। মিলটনের পারাডাইস লষ্টের প্রথম দুই সর্গের সহিত তুলনা করিলে শেষ সর্গত্রয় অনেক পরিমাণে নীরস বলিয়া মনে হইবে; কুমারের দার্শনিক তত্ত্ব সম্বলিত শ্লোকগুলিতে ভাব ও ভাষার বড় একটা মিলন দেখিতে পাওয়া যায় না। এতাবতাদর্শনের গূঢ় ভাব সমূহের সহিত ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চমৎকারিতা ও মধুরিমার সৃষ্টি করিতে বোধহয় কেবলমাত্র ভগবান শঙ্করাচার্য্যই অদ্য পর্য্যন্ত এদেশের ঐতিহাসিক জগতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

কবি হিন্দু ও সাধক। বাহিরে শত প্রকারের কঠোরতা সত্ত্বেও হিন্দুর সাধনা কবিতাময়ী। স্থূলভাবে ধরিলে হিন্দুর সাধনাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই ত্রিধারার অপূর্ব্ব সম্মিলনে সাধকের চিত্তশুদ্ধি নিষ্পন্ন হয়। গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমের ন্যায় বা সহস্রার ছত্রতলে ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার বিশ্রাম ভূমির ন্যায় এই ত্রিধারা বিধৌত সাধকের হৃদয় দর্পণ বড়ইনির্ম্মল, বড়ই পবিত্র। এই শ্রেণীর কবিতা উচ্ছৃঙ্খলতা বা চিত্তবিকার হইতে উৎপন্ন হয়না। সংযম ইহার মূল এবং সাত্ত্বিকতা ইহার প্রাণ। "অনোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" চিদানন্দঘন একমেবাদ্বিতীয়ংই আর্য্যসন্তানগণের উপাস্য। কিন্তু সেই "এক" কিরূপে অর্দ্ধনারীশ্বর সাজেন, কিরূপেই বা বিচিত্র লীলাময়ী বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করেন, ইহা উপলব্ধি করা হিন্দুর এক প্রকারের সাধনা। ইহার নাম সৃষ্টিক্রম। দ্বিতীয় প্রকারের সাধনা—কিরূপে বহুরূপ এক হইয়া যায়, একেই লীন হইয়া যায়; ইহার নাম সংহারক্রম। তৃতীয় প্রকারের সাধনা সান্তে অনন্ত প্রবণতা। হিন্দুর অনুরাগের বথরা হয়না। যেমন সান্তে অনুরাগ বাড়িতে লাগিল, সান্ত তেমনি অনন্ত হইতে লাগিল। সান্তে প্রাণ তন্ময় হইতেছে আর তাহার নিকট অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত সুষমা, অনন্ত বিলাস সামগ্রী বলি পড়িতেছে। কবি বলিতেছেন—"সান্তে বিশ্বরূপ মরি কেমন সুন্দর!" এই ভাবেই বিভোর হইয়া শঙ্করাচার্য্য ভবান্যষ্টকে "গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকাভবানি" ইত্যাদি স্তবের অমৃতলহরী তুলিয়াছিলেন। সাধকের হৃদয়পটে "মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গললিতম্" ভাব জাগিয়া উঠিল। কবি সত্যসত্যই শব্দব্রহ্মবিজড়িত পরব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিলেন!

প্রণব সম্পুট করি দাঁড়াও যখন
রূপের ছটায় ভাসে সকল ভুবন!
বৃক্ষপত্র অন্তরালে, সুনীল মেঘের কোলে,
সান্তে বিশ্বরূপ মরি সুন্দর কেমন।

আবার:— চাহিনা লো বনযূঁই মল্লিকা মালতী,
চাহিনা লো গন্ধরাজ কুসুম প্রভৃতি,
কি দিব তোমারে ফুল কি আছে আমার,
দিবার কিছুই নাই যা আছে তোমার,
কোথা পাব প্রাণভরা ভালবাসা রাশি
তোরই আছে তাই সখি তোরে ভালবাসি।

প্রথম ও দ্বিতীয়োক্ত সাধনার উপরেই বিশেষভাবে কাব্যখানি দণ্ডায়মান। উপহার হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের সাধনার স্ফুট বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। উপহারে কবি বলিতেছেন—"নয়নে তপন তব নেম সুধাকর" ইত্যাদি। উপসংহারে কবি বলিতেছেন;—

আমি ত তোমাতে আছি নতুবা কি হয়,
অবোধ বিহগ এত স্বর মধুময়"
যাহারে বলিছ আমি, সে আমিরে নহ তুমি,
তবুও বুঝিতে নার মায়ার বিকার,
অথবা তোমারই সব কর্ম্ম ফের ফার॥

পরিশেষে বক্তব্য এই যে যাহারা ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ও ভারতীয় সাধনা-তত্বের সহিত কিছু পরিমাণেও পরিচিত নহেন, তাহাদের চিত্ত বহুস্থলেই চিত্তস্পন্দনে স্পন্দিত হইবেনা বলিয়া আমার আশঙ্কা; অধিকন্তু স্থানে স্থানে হাস্যরসেরও উদ্রেক করিতে পারে। তবে সকলেরই তৃপ্তিপ্রদ হইতে পারে এমন কবিতাও অনেক আছে। এক শ্রেণীর লোকের নিকট কবিতাগুলি বড়ই আদরের হইবে, যাহারা কবির ন্যায় সাধনায় অভ্যস্থ বা তাহার পক্ষপাতী। যাঁহারা ভিতরের রসরাজকে বাহিরে সসাজ দেখিয়া এবং বাহিরের বিশ্বমূর্ত্তি ভিতরে টানিয়া লইয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহারা ইহাতে অনেক প্রাণের কথা, হৃদয়ের ভাব ও ভাষা এবং সাধনার উপযোগী বহু তত্বের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইবেন। এই কবিতায় কোথাও নিরাশা বা হা-হুতাশ নাই, অবসাদ বা নাস্তিকতার কর্কশতা নাই।

আর না ডারিহ মোরে
কুহক দুরিত পুরে
হাসিব কাঁদিব নাথ একা বসি হেথা
শুন আরাধ্য দেবতা।
শুন বা না শুন তুমি, তোমারে সাজায়ে আমি,
একে একে নিবেদিব মরমের ব্যাথা,
শুন আরাধ্য দেবতা।
থাক ব্যবধান শত, তবু জনমের মত,
স্থাবর জঙ্গম আদি নব পুষ্প লতা,
শুন আরাধ্য দেবতা।
কোথা লুকাইবে আর, আমি জেনেছি এবার,
এ হৃদয়ে আছ নাথ নিত্য তুমি গাঁথা,
শুন আরাধ্য দেবতা।
কিছু না করিতে পারি, তোমারে একান্তে স্মরি
ছাড়িব নশ্বর দেহ আমার বিধাতা,
শুন আরাধ্য দেবতা।

প্রবন্ধ বিস্তৃত হইয়া গেল। যাঁহারা এ কবিতা পুস্তকের পরিশুদ্ধ ভাব ভোগ করিতে চাহেন, তাঁহারা নিজে নিজে ইহা পাঠ করুন, অলমিতি বিস্তরেণ।

রেজেষ্টরী নং A 362.

দ্বিতীয় বর্ষ] ১৩১৪ সাল, ফাল্গুণ। [১১শ সংখ্যা

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ।

কাশীধাম;

মহালক্ষ্মী যন্ত্রালয়,

শ্রীঅক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

ওঁ শ্রী আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।

স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২য় বর্ষ] ১৩১৪ সাল, ফাল্গুন। [১১শ সংখ্যা

ওঁ

নমোভবতে বাসুদেবায়।

(১)

সাধনায় প্রলয়।

অজিন আসনে, করি পদ্মাসন
মুদিলাম দুটী আঁখি।
ভাবের সাগরে, ডুবিলাম ধীরে
গুরুপদে মতি রাখি॥
ভাবিতে ভাবিতে, কত দেশে যাই
কত কি নয়নে ভাসে।
বলিবারে চাই, বলিতে না পারি
ভাষায় নাহিক আসে॥
বিক্ষেপ রহিত, ক্রমে হয় চিত
প্রশান্ত হইল মন।

প্রলয়ের ছবি, মানস আকাশে
করিলাম নিরীক্ষণ—
চমকে চপলা, মেঘ জ্যোতি ভাঙ্গে
গরজে জলদ সঘনে।
খসিছে উলকা, কাঁপিছে মেদিনী
ছুটিছে অশনি পবনে॥
শুকাল তটিনী, শুকাল সাগর
ভূধর লুকাল পাতালে।
চন্দ্রসূর্য্য তারা, পড়িল খসিয়া
নভস্থল হ'তে ভূতলে॥
ক্ষিপ্ত প্রভঞ্জনে, ঘর বাড়ী পড়ে
বৃক্ষে বৃক্ষ পড়ে ভাঙ্গিয়া।
আকাশ পৃথিবী, ঘন অন্ধকারে
ক্রমে গেল সব ডুবিয়া॥
আবার কোথাও, ধূমরাশি সনে
উগারিছে গিরি অনলে।
সে অনল রাশি, জ্বালা মালা লয়ে
দগ্ধীভূত করে সকলে॥
ছোট থেকে বড়, সকলই গ্রাসিল
দেখিনু আপন নয়নে।
ভূচর খেচর, পুড়ে হ'ল ছাই
মহাপ্রলয়ের আগুনে॥
ছিল যাহা স্থূল, ক্রমে হ'ল সূক্ষ্ম
অণু পরমাণু হল।
মাত্রা অহঙ্কারে, অহং মহতে
মহৎ প্রধানে গেল॥
শেষেতে দেখিনু, অপরূপ দৃশ্য—
প্রকৃতি পুরুষে লয়।
বাকি কিছু নাই, কেবল প্রণব
দেও প্রণবের জয়॥

———

(২)

কূটস্থে জীব ব্রহ্ম।

ঝঞ্ঝা ফুরাইল, পরাবস্থা এল
বাতাস নিচল হ'ল।
দেখিনু নয়নে, সুনীল গগণে
চাঁদের বিমল আলো॥
আকাশের নীল, ঘনীভূত হল
বাড়ীল চাঁদের জ্যোতি।
স্পন্দন ফুরাল, আবেগ থামিল
নিরোধ হইল গতি॥
মনপ্রাণ ভরি, চাঁদ পানে হেরি
পলক পড়েনা চখে।
উদিল অন্তরে আনন্দ অপার
কেমনে প্রকাশি মুখে॥
দেখিতে দেখিতে, চাঁদ হ'য়ে গেনু
তন্দ্রার আবেশ এ'ল।
ভুলিনু আপনি, এ চাঁদ অমনি
ওচাঁদে মিশায়ে গেল॥

শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ,
মেদিনী পুর।

কর্ম্মযুগ।

এই কলিযুগে সকলেই 'কর্ম্ম কর' 'কর্ম্ম কর' এই উপদেশ প্রদান করেন। এ যুগে প্রায় মনুষ্যই কর্ম্মের উপরের অবস্থা ধারণা করিতে পারে না। কর্ম্ম শূন্য অবস্থা যাঁহাদের, যাঁহারা যথা প্রাপ্ত কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে স্পন্দিত হয়েন, আবার পরক্ষণেই শান্ত হইয়া যান—ইঁহাদিগকে লোকে বুঝিতে পারেনা—যোগী, ধ্যানী সমাধীস্থ ব্যক্তিকে এ কালে লোকে স্বার্থপর বলে—বলে পৃথিবী ডুবিয়া যাইতেছে আর উঁহারা সমাধি সুখে মগ্ন আছেন—এই বলিয়া ঘৃণা করে—

আজ কালকার এই দারুণ অবস্থার সমালোচনা আমরা করিতেছিনা---এ সমালোচনায় ফল নাই। আমরাও বলি এস যাহারা কর্ম্ম সঙ্গী তাহারা কর্ম্মই কর। কিন্তু যে গীতাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতেছ---এস গীতার উপদেশ মত যেরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা শিখিয়া কর্ম্ম করি।

গীতা বলিতেছেন "মা ফলেষু কদাচন"।

অর্থাৎ কর্ম্মকর কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কর্ম্ম কর; ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। এ কথাটা কি বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, না কর্ম্ম করিয়া একবার মুখে মাত্র বলা হইতেছে ইদং কর্ম্ম ফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণ মস্তু। ভগবান নিজে বলিতেছেন কি লৌকিক কি বৈদিক সকল কর্ম্মই আমাতে অর্পণ কর। "যৎ করোষি-যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় ! তৎকুরুষ মদর্পণম্॥ "করোষি" "অশ্নাসি" অর্থাৎ করা খাওয়া ইত্যাদি কর্ম্ম লৌকিক। আর "জুহোষি," "দদাসি," "তপস্যসি" অর্থাৎ যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি কর্ম্ম বৈদিক। এই সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে। মনে করা হউক আহার করিতেছ---এখন এই অন্নব্যঞ্জনাদি ভগবানকে অর্পণ করা হইল। আহারে বসিবার পূর্ব্বে অন্ন ব্রহ্মা, রস বিষ্ণু এবং ভোক্তা দেবমহেশ্বরঃ ইহা বলা হইল অথবা ভগবানকে ডাকিয়া বলা হইল শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু। এখন কথা হইতেছে যদি কোন ব্যঞ্জনে লবণ বেশী হয় বা আদৌ লবণ না দেওয়া থাকে তবে একবারে এত ক্রোধ হয় কেন ? কেন বলা হয় আঃ ইহারা আমাকে প্রাণে মারিতে বসিয়াছে—এমন করিয়া কি খাওয়া যায় ? অথবা ভাতের থাল ফেলিয়া দিয়া ভয়ানক তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ হয়। এ কিরূপ শ্রীকৃষ্ণার্পণ ? যদি তাঁহাকেই সমস্ত অর্পণ করা হইল তবে নুন ঝাল লাগিতে হয় ত শ্রীকৃষ্ণকেই লাগুক—আমার লাগিবার ত কোন কথা নাই—আর একটু না হয় লাগিল সেই সময় না হয় কাতর ভাবে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ হউক—বলা হউক প্রভু আমার সুখ দুঃখ অনুভব হয় কেন ? তোমাকে কর্ম্ম ফল অর্পণ করিলাম তথাপি আমার যখন সুখ দুঃখ বোধ হইতেছে তখন ত আমার অর্পণ হয় নাই। প্রহ্লাদ বিষ অর্পণ করিয়াছিলেন সে বিষও প্রাণ সংহার করিতে পারে নাই তোমাতে অর্পিত হইয়াছিল বলিয়া—আমার যে একটুতেই এত গরগরানি হইতেছে—হে প্রভু আমি ত অর্পণ করিতে পারিলাম না—তুমি শক্তি দাও যাহাতে আমি সমস্ত কর্ম্ম তোমাতে অর্পণ করিতে পারি—এই ভাবে না

হয়। প্রতি গ্রাসে ভগবানের নাম ঘন ঘন উচ্চারিত হউক। ইহা অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে প্রকৃত অর্পণ হইতে পারে। সকল কর্ম্মই ভগবানকে প্রতিক্ষণ স্মরণ করিতে করিতে করিতে হইবে—মন, ভগবানকে প্রতিক্ষণ ডাকিবে আর হাতে পায়ে মুখে কার্য্য হইবে; এইরূপে না কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত হইতে পারে? কিন্তু তোমার কর্ম্মার্পণ কিরূপ, যখন তুমি ভাব নিজের স্বার্থ জন্য ত কিছুই করিতেছি না দেশের জন্য দশের জন্য কর্ম্ম করিতেছি আমার কর্ম্ম ত নিষ্কাম। এই কি তোমার ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কর্ম্ম করা? যদি কর্ম্মটি তোমার সফল না হয় এবং তজ্জন্য তুমি নিতান্ত দুঃখিতও হও তথাপি কি বলিতে হইবে তুমি দেশের কর্ম্ম দশের কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া, ঈশ্বর প্রীতি জন্য অহং কর্ত্তা এই অভিমান ত্যাগ করিয়া করিতেছ? সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ—সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমান হইয়া তুমি কর্ম্ম করিতেছ?

সর্ব্বদা ভগবানের নাম, অবসর মত ধ্যান, জপ, পূজা এ সমস্ত অভ্যাস না করিলে কি শ্রীকৃষ্ণার্পণ অভ্যাস হইতে পারে? সর্ব্বদা ভগবৎ ভাব লইয়া না থাকিলে কি প্রবাহ পতিত মত কর্ম্ম হয়? না নিষ্কাম কর্ম্ম হয়? জ্ঞানী যথা প্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হয়েন—তিনি বৃক্ষের মত স্তব্ধই থাকেন—বায়ু সঞ্চালনে বৃক্ষের স্পন্দনের মত স্পন্দিত হয়েন আবার পরক্ষনেই আপন নিস্পন্দ অবস্থায় বৃক্ষমত স্তব্ধ থাকেন। হইল, ইহা না হয় জ্ঞানীর পক্ষে তুমি বলিতেছ তুমি কর্ম্মী—তুমি ঈশ্বরের আজ্ঞামত কর্ম্ম করিতেছ? ঈশ্বরের আজ্ঞামত কর্ম্ম করায় কি এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে জপ, ধ্যান, সন্ধ্যা, পূজা প্রভৃতি বর্ণাশ্রম মত কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হইবে—ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যা আহ্নিক বাদ দিয়া দেশের দশের কার্য্য ঈশ্বর আজ্ঞামত করিবে? ইহাতে কি এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ম্ম, যুদ্ধাদি কর্ম্ম, বাণিজ্যাদি কর্ম্ম, সেবাদি কর্ম্ম—ঈশ্বর স্মরণ বাদ দিয়া, গোলমাল করিয়া, অধিকারী বিচার না করিয়া করিতে হইবে? এ কিরূপ ঈশ্বর আজ্ঞা মত কর্ম্ম করা?

যদি বল সব একাকার হইয়া গিয়াছে সকলে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য; শূদ্র কেহ নাই—তাহা হইলেও কি বৈশ্য ক্ষত্রিয় সন্ধ্যা বন্দন বাদ দিবে? ভগবান ক্ষত্রিয় হইয়া অবতার গ্রহণ করিলে নিজে আচরণ করিয়া কি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন? রামকৃষ্ণও কি ত্রিসন্ধ্যা বাদ দিয়া দেশের দশের কর্ম্ম কখন করিয়াছেন? ব্যভিচারকেও কি ধর্ম্ম বলিতে হইবে? সদাচার,

সাত্বিক আহার ইত্যাদি কি ধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি নহে? তবে যথেচ্ছা আহার বিহার করিয়াও ভগবানের আজ্ঞা পালন হইল কিরূপে? ভগবান বলিতেছেন শরীর, মন ও বাক্যকে যথাশাস্ত্র স্পন্দিত করিতে হইবে তবে "যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি" হইবে। শরীর মন ও বাক্যকে যথেচ্ছাচারে স্পন্দিত করিয়াও কি বলিতে হইবে তুমি ঈশ্বর আজ্ঞা পালন করিতেছ? তুমি গীতার উপদেশ মত নিষ্কাম কর্ম্ম করিতেছ? একবার কি বিচার করা হইতেছে তুমি সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান কিনা? একবার কি আত্ম পরীক্ষা করা হইয়াছে তোমার অনুষ্ঠিত লৌকিক বা বৈদিক কর্ম্ম প্রচার দেখিয়া লোকে যদি অনাদর করে, তবে তোমার দুঃখ হয় কিনা? যদি লোকে ভাল বলে তবে তোমার হর্ষ হয় কিনা? যদি কর্ম্ম করিয়া তুমি সুখ বা দুঃখ পাও যদি কর্ম্মের ফল দেখিয়া তুমি হর্ষ বিষাদ প্রাপ্ত হও তবুও কি বলিতে হইবে তুমি গীতার উপদেশ মত নিষ্কাম কর্ম্ম করিতেছ? তুমি অহং জ্ঞান বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম করিতেছ? তোমার ঈশ্বর প্রীতিতেই লক্ষ্য কেহ ভাল বলিল বা মন্দ বলিল সে দিকে তোমার দৃষ্টি নাই? তোমার শিষ্য যদি কেহ ভাঙ্গাইয়া লয় আর তাহাতে যদি তোমার ক্রোধ বা দুঃখ হয় তবে তোমার কর্ম্ম নিষ্কাম কিরূপে? এস এস একবার অত্ম-পরীক্ষা কর; করিয়া গীতার ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। এস এস একবার কাতর প্রাণে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর ভগবান! তোমার দাস হইয়া তোমার আজ্ঞা মত নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে চাই—কিন্তু আমি মূর্খ আমি পারি না। আমি প্রাণ পণ করিতেছি তুমি শক্তি দিয়া আমার কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া দাও। আমি তোমারই দাস বা দাসী আমি যেন প্রতিক্ষণে তেমার নাম করিতে করিতে সকল কর্ম্ম করিতে পারি। সর্ব্বদাই যেন মনে তোমার নাম ধ্যান করি—আর হাত পা দিয়া কর্ম্ম করিতে পারি হে ভগবান আমার সর্ব্ব কর্ম্ম যেন তোমাতে অর্পিত হয়। এস ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়া অভ্যাস করি আমা-দের শুভ হইবে।

—o—

প্রবাহ।

"প্রবাহ" একখানি কবিতা পুস্তক। শ্রীমতী সরলা বালা প্রণীত। সমালোচনার জন্য ইহা অমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ভিতর বাহির উভয় দিকেই পুস্তক খানি সুন্দর। কবি ও সাহিত্য জগতে পরিচিত। স্ত্রী লোকের লেখা হইলেও ইহাতে অগ্রাহ্য করিবার অতি অল্পই আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রায় সকল কবিতাতেই একটা অন্তস্থ্যত প্রবাহ আছে।

তথাপি এই শ্রেণীর পুস্তক লেখা সহজ সমালোচনা করা কঠিন। মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা—ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যে যখন যাহার স্ফুরণ হইয়াছে কবি তাহাই কবিতা বদ্ধ করিয়াছেন। অন্তস্তলে একটি মূল প্রবাহ থাকিলেও নানা বিষয়িণী কবিতা গুলির ভাব মূল ভাবকে কিরূপে পরিপুষ্ট করিতেছে ইহা দেখাইতে সমালোচককে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। এ ক্ষেত্রে সমস্ত কবিতার সমালোচনা না করিয়া যে মন হইতে "প্রবাহ" ছুটিয়াছে তাহার গতি নিশ্চয় করিলে সমালোচকের কার্য্য কিছু সহজ হয়। আমরা প্রথমেই মনের বিভিন্ন গতি নির্দ্দেশ করিতেছি। পরে কবিতায় যাহা ফুটিয়াছে দেখাইব।

জীবন মরণের খেলা লইয়াই মনের বিলাস। কোন মনের গতি অনন্ত জীবনের দিকে; কোন মনের প্রবাহ অনন্ত মরণের পথে; কোন মন বা মরণ পথের আপাত মধুর সুখগন্ধি প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। যেখানে ইচ্ছা থাকে অথচ শক্তির অভাব সেখানে মনকে মরণের দুঃখ প্রবাহেই ভাসিয়া যাইতে হয়। এইরূপ মনও সময়ে সময়ে দুঃখের গুরুভার সহ্য করিতে না পারিয়া দুঃখ অতিক্রম জন্য প্রবল পুরুষার্থ প্রয়োগ করে। কিন্তু সৎগুরু ও সৎশাস্ত্র অবলম্বন ভিন্ন এরূপ মনে একটানা ভাব প্রায় থাকে না। বিচার, সম্যক পরিপুষ্ট নয় বলিয়া ইহাদিগকে বহু ক্লেশে প্রারব্ধ ভোগ করিতেও হয়। মনের এই তিনটি গতির নাম ঊর্দ্ধগতি, অধোগতি এবং মিশ্রগতি।

যাঁহাদের গতি নিরন্তর কল্যাণ পথে তাঁহারা ঋষি, সিদ্ধ পুরুষ, জ্ঞানী, ভক্ত বা যোগী। যাঁহাদের গতি নিরন্তর অকল্যাণ পথে বা বিষয় মুখে তাঁহারা ক্রম অনুসারে অল্পে অল্পে মনুষ্য হইতে পশুতে, পশু হইতে পক্ষীতে পক্ষী হইতে বৃক্ষ লতাদিতেও তথা হইতে স্থাবরাদি জড় ভাবে পরিণত হইতেছে—

অল্পে অল্পে ইহাদের চেতন অংশ জড় ভাবে আচ্ছন্ন হয় শেষে চৈতন্য একেবারে জড়ের ক্রোড়ীভূত হইয়া পড়ে।

যাঁহাদের গতি মিশ্র পথে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ ক্ষিপ্ত মূঢ় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় নিষ্পেষিত হইয়া সৎগুরু ও সৎশাস্ত্র অবলম্বনে নিজের দুঃখের অবস্থা অতিক্রম করিতে পারেন; নতুবা ইঁহাদিগকেও বহু যোনিতে গতাগতি করিতে হয়।

'প্রবাহে' কোন শ্রেণীর মনের গতি পরিলক্ষিত হইতেছে আমরা ক্রমে দেখাইতেছি।

'প্রবাহ' চারিটি স্রোতের সমষ্টি। প্রথমটি উৎসর্গ বা মূলপ্রবাহ দ্বিতীয়টি জীবন প্রভাত তৃতীয়টি যৌবন মধ্যাহ্ন শেষটি সন্ধ্যা। বয়স অনুসারে এ বিভাগ হয় নাই, বিভাগ হইয়াছে একটি অবস্থারই প্রভাত বা প্রথম অবস্থা মধ্যাহ্ন বা মধ্য অবস্থা সন্ধ্যা বা শেষ অবস্থা লইয়া। সকল কবিতাগুলি স্ব স্ব বিভাগে পড়ে নাই। কবি চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু খণ্ড খণ্ড মনের ভাবকে মূল প্রবাহে ফেলিয়া ঠিক ঠিক বিভাগ করা এ ক্ষেত্রে একরূপ অসম্ভব। এই জন্য বলিতেছিলাম বিভাগটি নির্দোষ হয় নাই।

ভাব ও ভাষা লইয়াই কবিতা। এই কবিতা গ্রন্থের বিশেষত্ব ভাব। ভাষার আড়ম্বর বড় একটা নাই। সরল ভাষায় হৃদয়ের ভাব প্রকাশে কবির বিলক্ষণ পারদর্শিতা দৃষ্ট হয়। সরলতাই কবির বিশেষ প্রশংসার সামগ্রী।

'কোথা' হ'তে', ভাল ক'রে বল, আর একবার ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি ইহার নিদর্শন।

কবি হৃদয়ে অন্তর্লীন একটি ব্যথা আছে। কবি সুখ দুঃখের বিলাপে বলিতেছেন—

দুঃখ বলে মুছি আঁখি বারি—
দুঃখ হ'য়ে জন্মিলাম যদি,
এক জন ব্যথার ব্যথিত
কেন মোরে নাহি দিল বিধি?
নীরবেতে একেলা একেলা
নিশিদিন কাঁদিয়া কাটাই
মুছাইতে নয়নের বারি
এ জগতে কেহ মোর নাই।

আজ ব্যবহারিক জগতের কত লোকই এই কথা বলিয়া বিলাপ করে। জাগতিক দৃষ্টিতে কথা গুলি বড়ই সত্য। এ জগতের সকল দুঃখই আনন্দে সহ্য করা যায় যদি কেহ চক্ষের জল মুছাইবার থাকে। লোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, পিতা মাতা ভাই বোন আত্মীয় কুটুম্ব কেহ কি এই ব্যথা জুড়াইয়া দিতে পারে না?

আমরা বলি—বুঝি পারে না। পারে এক জন—আর সে যারে অনুগ্রহ করে বুঝি সেও পারে। কিন্তু ভাল করিয়া বুঝিলে বুঝাযায়---এই দুঃখ ও সে আপনি। দুঃখ রূপে তিনিই দেখা দেন, আর নয়ন জল মুছাইতে ও তিনি। আর এই অন্তর্লীন গূঢ় ব্যথা যাহার তিনি মুছিয়া দিয়াছেন, তাহারই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হইয়াছে। সে তখন আর তাঁহার ঘোরা মূর্ত্তি দেখেনা----দেখে অঘোর মূর্ত্তি, যে মূর্ত্তি নিত্য, সদা আনন্দ ময়, সদা মধুময়।

কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে? কবি উৎসর্গে যাহা লিখিয়াছেন তাঁহাতে তাঁহার সাধনার কথাই প্রকাশিত হইয়াছে।

পুস্তক খানি "মা"কে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মাই কবির অবলম্বন যদিও মা কবির বিশ্রাম নহে। মার প্রতি বিশেষণটি ভালবাসা মাখা।

"মমতার প্রতিমা আমার
প্রীতিময়ি স্মৃতিময়ি উৎস করুণার
স্নেহময়ি জননি আমার"
দীপ্তিময়ি, জ্যোতির্ম্ময়ি জননি আমার
রবিচ্ছবি রূপিণি আমার।"

মাই কবির গুরু। জননীই ধ্রুব তারা রূপিণী। সমস্ত পুস্তকেই মার কথা আছে—মার আদর আছে----মার কাছে হা হুতাশ আছে----মার কাছে প্রার্থনা আছে। কবি এক দিন জননীর স্নেহভরা চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিয়াছিলেন—আজ স্মৃতিতে তাহাই করিতে হয়—ইহাই ধ্যান। সূর্য্য দীপ্তিচূর্ণ দেখিয়া মার আঁখি মনে পড়ে, বর্ষার ম্লান শশী দেখিয়া মার করুণ-নয়ন স্মৃতিতে ভাসে, কোজাগরে পৃথিবীর সহিত জ্যোৎস্নার মিলন দেখিয়া মার স্নেহ জাগে। আমার সহিত জগত জীবকে দুঃখ ভারে ব্যথিত দেখিয়া মাকে-ডাকিতে হয়—আমার শক্তি নাই---তুমি সর্ব্বশক্তিময়ী তাই বলি

ডুবে যায় বুঝি জগত সংসার
মা আমার রক্ষা কর রক্ষা কর তারে ॥

কি সুন্দর ভাব! সমস্ত বিশেষণের ব্যাখ্যা আমরা করিব না, একটি সম্বোধনের কথা বলিব। প্রীতিময়ি, স্নেহময়ি, মমতার প্রতিমা, বুঝিলাম কিন্তু স্মৃতিময়ি কি?

দেখিতে সাধ যায় কেন? অনেকবার দেখিয়াও দেখা হয় না কেন? অনেক কথা কহিয়াও কথা কওয়া হয় না কেন? স্মৃতিময়ি—ইহার একমাত্র উত্তর। প্রচুর অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। কিসের স্মৃতি তাঁহাতে প্রচুর? কিসের তাহাত জানি না—যেন কোথায় কবে কত সুখ ভোগ করিয়াছিলাম, কত আনন্দে ছিলাম—যাহাকে ভালবাসি তাহাতে যেন কত জানা অজানা আনন্দের প্রাচুর্য্য আছে---ইহা লোক, লোকান্তরের কত স্মৃতি জড়ান যেন সেই নাম। বড় মধুর এই সম্বোধন, বড় ভাব ব্যঞ্জক এই বিশেষণ।

"মনে রেখো" কবিতায় কবি লিখিতেছেন

মনে রেখো এ জীবনে গড়িয়া তুলিতে হবে
আর এক নবীন জীবন।
এ জন্ম গঠনে নাই বিধাতার অধিকার
সব ভার তোমার উপর।
কুৎসিৎ করিলে তারে কুৎসিৎ করিতে পার
পার তারে করিতে সুন্দর।

এই বিচার দ্বারা কল্যাণ পথ বাহিনী বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। মানুষ যতই হীন অবস্থায় আসুক না কেন পুরুষার্থ করিবার শক্তি সকলেরই আছে। প্রকৃত কথা---ভগবান কখন কোন জীবকে ত্যাগ করেন না—পুরুষার্থ রূপে তিনি সকল জীবের সঙ্গে সর্ব্বদা আছেন। দুর্ব্বল অবিশ্বাসী হৃদয়ই দৈবমুখাপেক্ষী। এ জীবন গঠন সকলেরই আয়ত্তাধীন।

কবি বলিতেছেন—

যতনে গঠন কর আপনারে আজি হ'তে
মিলনের সে দিন ভাবিয়া
সে দিন তাদের সনে যেন গো মিলিতে পার
ধরা হ'তে সুন্দর হইয়া।

শত দুঃখে পড়—শত বাধা পাও, মনে রাখিও এই দুঃখের সংসার হইতে সুন্দর হইয়া তোমায় যাইতে হইবে, নির্ম্মল হইয়া তোমায় যাইতে হইবে, পবিত্র হইয়া তোমায় যাইতে হইবে। পবিত্র হও, নির্ম্মল হও, যাহাকে পাইবার জন্য তুমি প্রাণান্ত করিতেছ, সেই তখন তোমার কাছে আসিবে, তোমাকে প্রাপ্ত হইবে তোমাতে উদয় হইবে। শ্রুতি বলেন "পতিরেব জায়াং" পতি যেমন স্ত্রীকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ, সৈনিক যেমন নিজ অশ্বকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ, গাভী যেমন বৎসকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ। এ শিক্ষা অপেক্ষা উচ্চ শিক্ষা আর নাই। এই পবিত্রতার জন্য জগতের ভ্রূকুটী সহ্য কর—রমণীয়দর্শনকে পাইবার জন্য, মিলনের সে দিন ভাবিয়া ননদিনীর গঞ্জনা সহ্য কর--যাহাতে তাহাতে পার রাগ দ্বেষ ত্যাগ কর—ইহাই নির্ম্মলতা—ইহা প্রাণপণে কর একজনকে পাইবে বলিয়া--আর অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা রাখিও না। একটু জপ, তপ করিয়া যদি ভাব এইত করিলাম, আর লোকের সঙ্গে হা হা হু হু তে মত্ত হও তবে তোমার প্রিয় মিলিবে না---স্বামী যারে গ্রহণ করে না তার হাসি বাহির হইবে কিরূপে? আগে সে গ্রহণ করুক, চরণ সেবার অধিকার প্রদান করুক, তবে ত আনন্দ ফুটিবে। আমরা অধিক বলিব না শুধু বলি এই উপদেশ জয়যুক্ত হউক।

পুস্তকে শুধু শুষ্ক উপদেশ দেওয়া হয় নাই, কবি যাহা আঁকিয়াছেন তাহাতে উপায়ও আছে।

শক্তি অবলম্বন ভিন্ন রমণীয়দর্শন ঈপ্সিততমের সহিত মিলন হইবে না। মাই শক্তিরূপিণী। মা ভিন্ন মনের মালিন্য দূর হয় না। বলা হইয়াছে কবির অবলম্বন মা, কিন্তু মা কবির বিশ্রাম নহে। "চোর ধরা" কবিতাতে কবি লিখিতেছেন—

খুঁজে পাই নাই নিজে এসে চোর
দিয়াছে আমারে ধরা
মুখ শতদল অমিয়া মধুর
হাসি পরিমল ভরা।
তুমি পূর্ণ নাথ বাঞ্ছিত ভুমিহে
চির আশা চাওয়া নিধি
আজ রতন কুড়ায়ে কে যে দিয়ে গেল
আঁচলে আমার বিধি।

যে মুহূর্ত্তে জীব সাধনা দ্বারা নির্ম্মল হয় সেই মুহূর্ত্তেই এই চির আশা চাওয়া নিধি আপনি আইসে। আমরাও প্রার্থনা করি—এই ক্ষণিকের ভাব স্থায়ী হউক।

ইহা পাইবার জন্যই সংসার—সংসার ভোগের জন্য নহে, ভোগনিবৃত্তি লাভ হইলেই সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি।

মাই অবলম্বন কেন? স্বামীই কি সব দিতে পারে না? স্বামী যখন তাই দেন তখন তিনি উভয়ই—নতুবা তিনি কোনটিই নন।

মা ও স্বামী দুটি ধরিলে বলিতে হইবে ইহাদের পার্থক্য আছে। মল-লুলিত শিশু যখন চীৎকার করে, মাই তখন ছুটিয়াআসিয়া কোলে তুলিয়া লন—পবিত্রতা অপবিত্রতা বিচার করেন না। বক্ষে ধরিয়া শিশুকে শুদ্ধ করিয়া লয়েন। আর স্বামী! স্বামী ব্যভিচার সহ্য করেন না। স্ত্রীর ব্যভিচার স্বামী আদৌ বরদাস্ত করেন না। হৃদয় নির্ম্মল না হওয়া পর্য্যন্ত হৃদয়নাথ হৃদয়ে পদার্পণ করেন না। তাই শক্তিময়ীর কাছে শক্তি লইয়া নির্ম্মল হইয়া ঈপ্সিততমের দর্শনে যাইতে হয়।

এই সংসারের যেখানে শেষ হইয়াছে, যেখান হইতে আবার নিত্য সংসার আরম্ভ হইয়াছে সেই খানে এক শক্তিময়ী রমণী মূর্ত্তি, এই নারী মূর্ত্তি সাধককে বলিতেছেন, পার আমায় পরাস্ত কর—পথ ছাড়িয়া দিতেছি। না পার মা বলিয়া আমার শরণাপন্ন হও; আমি আমার সন্তানকে কোলে করিয়া সে রাজ্যে দিয়া আসি অবোধ সাধক মা বলিতে চায় না—পরাস্ত করিয়া উপরে যাইতে চায়, শেষে অন্তঃসার শূন্য হইয়া ইতোভ্রষ্ট ততো নষ্ট হয়। সুবুদ্ধি সাধক তাই মা অবলম্বন করেন—আপনাকে শক্তি শূন্য মনে ভাবিয়া, প্রাণ পণে মা'র নিকট শক্তি ভিক্ষা করিতে করিতে সাধনা করেন—করিয়া যেমন মা তারে নির্ম্মল করেন অমনি সে দেখে হৃদয় বিহারী তাঁরে বক্ষে ধারণ করিয়া আদর করিতেছেন। উৎসর্গে—আমরা এই ভাব গুলি পাই—তাই বলিতেছিলাম ইহাই প্রবাহের মূল প্রবাহ।

কবি শুধু যে উদ্দেশ্য ও উপায়ের কথা গুলি উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নহে, উপায় লইয়া উদ্দেশ্যে যাইতে হইলে নিরন্তর যাহার প্রয়োজন তাহাও দেখাইতেছেন। এইটি আত্ম পরীক্ষা। যিনি সাধক অথচ আত্ম পরীক্ষা শূন্য তিনি একটা কৃত্রিম তৃপ্তি লইয়া আছেন। তিনি একটা উপদেশ মত কার্য্য করিয়াই ভাবিতেছেন ইহাতেই আমার সর্ব্বকর্ম্ম করা হইল। ইহা মূঢ়তা মাত্র।

যাঁহাকে অবলম্বন করিলাম—যাহা করিতেছি তদ্দ্বারা আমার কি হইল না হইল আমায় নিত্য পরীক্ষা করিতে হইবে। এই পুস্তকে আমরা কবির সরল আত্ম পরীক্ষা দেখিয়া মুগ্ধ হই।

কবি বলিতেছেন---

বিফল তপস্যা মোর নিশি জাগি বৃথা আরাধন
জীবন সঁপিনু তবু গড়িবারে নারিনু জীবন।

এখানে ভাব যদি ও কিছু অস্পষ্ট তথাপি কবির অভিপ্রায় সহজ বোধ্য। তোমায় জীবন সঁপিলাম অথবা সঁপিবার ইচ্ছা প্রবল, যেমন করিয়া সঁপিলে হয় তাহাও জানি, কিন্তু মনের মত করিয়া গড়িয়া সমর্পণ করিবার সামর্থ্য হইল না—ইচ্ছা আছে শক্তিতে কুলাইল না। কি জানি অনাদি সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কার আমায় আমার মত হইতে দিল না। তবুও আত্ম সমর্পণ করিলাম—আমার সাধ্য নাই তুমি শক্তি দিয়া করিয়া লও, আমিও প্রাণ পণ করিতেছি।

কেন আমার হয় না? কবি বলিতেছেন
ওহে নাথ বিশ্বাসীর হরি
অবিশ্বাসে শুধু পুড়ে মরি।

সত্যই; হয় না শুধু অবিশ্বাসে। কোন উপায়ে স্থায়ী বিশ্বাস হইলেই হয়। কবি অন্যস্থলে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।

আমার সর্ব্বস্ব বলি বৃথা ভান করি
তুমি কি হৃদয়ে আছ হৃদয় বিহারি!
লোকে জানে তব ধ্যানে সন্ন্যাসিনী আমি
তুমি জান এ অন্তর ওহে অন্তর্যামী।
জানেনা তো কেহ---ত্যাগে কিবা অভিমান,
জানেনা এ উদাসীন্য শুধু বৃথা ভান,
লোকে দেখে এ হৃদয় নির্ম্মল শীতল
জানেনা কি বিষ সেথা সংসার গরল।

প্রবন্ধ বাড়িয়া গেল। আমরা সকল কথা বলিতে পারিলাম না বলিয়া ত্রুটী স্বীকার করিলাম।

উপসংহারে আমাদের জননী ও সহোদরা তুল্যা স্ত্রীকবিদিগকে একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা হয়—প্রাচীন সমালোচকের ইহাও একটা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের মা ও সহোদরা যাঁহারা, তাঁহারা অন্তঃপুর চারিণী; এই আমাদের জাতির অসাধারণ ধর্ম্ম। অপর জাতি সাধারণ ধর্ম্ম মাত্র গ্রহণ করিয়াছে—চুরি করিওনা, মিথ্যা কহিওনা ইত্যাদি জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। কিন্তু সদাচার, সাত্ত্বিক আহার, অন্তঃপুরে অবস্থান, এক কথায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—জগত ইহার যতই কেন না নিন্দা করুক, সর্ব্বদ্রষ্টা ঋষিগণ আমাদের ভারতে এই অসাধারণ ধর্ম্ম দিয়া গিয়াছেন। আহারে যজ্ঞ, শয়নে যজ্ঞ, স্নানে যজ্ঞ, সাধনায় যজ্ঞেরত কথাই নাই, ইহা আর কোথাও নাই। আমরা আমাদিগের মা ও সহোদরাদিগকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে যাইতে দেখিলে ব্যথা পাই। স্থূল শরীর অন্তঃপুরে রাখিয়া, সূক্ষ্ম শরীর যদি সবার নিকটে প্রকাশ হয়, তবে কি বাহিরে আসা হয়না? বাহিরে যে বড় ধূলা কাদা, রৌদ্র ও পাপ। খণ্ড কবিতায় যতদূর অন্মপ্রকাশ হয় গণ্ডীর বাহিরে স্থূলশরীর আনিলেও তত হয় না।

পুস্তক লেখা শতবার কর্ত্তব্য। কবিরাজ কৃষ্ণদাস কি পুস্তক লেখেন নাই? নিজের মনকে নিজের ইষ্ট দেবতার রূপ গুণ লীলায় মগ্ন রাখা—চিত্ত বালককে কখন পুরস্কার, কখন তিরস্কার, কখন তাহার সহিত কথা, কখন ইষ্টের সহিত কথা—কখন তাঁহার পরিজন লইয়া সৎসঙ্গ—এই কার্য্যই, মনে হয়, সাধকের কর্ত্তব্য। যাঁহাদের হৃদয় আছে, ভাব আছে, সাধনা আছে—আর অবস্থাও অনুকূল তাঁহারা ঈপ্সিততমের কথা প্রসঙ্গ ক্রমে কহিবেন—কেন? তাঁহাদের শুধু ঐ কথা লইয়াই থাকা উচিত। "তৎকথনং তচ্চিন্তনং অন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্" ইহাই মহাপুরুষেরা আমাদিগকে উপদেশ করেন। রাম প্রসাদ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন নিজের উপকারের জন্য—তাই আজ জগৎ তাঁহার সঙ্গীতে এত উপকার পাইতেছে। শুধু কবিতা লেখা যাঁহারা জীবনের কার্য্য মনে করেন না তাঁহাদের নিকট আমরা ইহা প্রার্থনা করিতে পারি। ইহাতে নিজেরও উপকার দশেরও উপকার।

———:———

আকাশ।

এই সর্ব্বজন দৃশ্য আকাশ কি ?

যিনি স্বপ্রকাশমান চিৎস্বরূপ, তিনি যখন শূন্যরূপে অবস্থান করেন তখন সেই শূন্যাবস্থাকেই সর্ব্বজন দৃশ্য আকাশ বলে। ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব ইহাই বলেন।

শ্রুতি বলেন—"আকাশাহ্যণুক্রমেণ সর্ব্বেষাং বা এতদ্ভূতানামাকাশঃ পরায়ণম্। সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব জায়ন্তে। আকাশ এব লীয়ন্তে। তস্মাদেব জাতানি জীবন্তি। তস্মাদাকাশজং বীজং বিন্দ্যাৎ" ইত্যাদি। ব্রহ্মের সহিত এই আকাশের তুলনা হয়। শ্রুতি বলেন আকাশ মেকং সম্পূর্ণং কুত্রচিন্নৈব গচ্ছতি। আকাশ শব্দময়। শব্দ হইতেই জগৎ। শব্দও ব্রহ্ম। ইহাও শ্রুতিবাক্য।

আকাশের চিন্তা কয় জন করিয়াছেন ? সর্ব্বদা বিদ্যমান, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সর্ব্বব্যাপীর ধ্যান আর এমন করিয়া কে ধারণা করিয়া দিতে পারে ?

ধারণা কাহার নাম ? অপরিচ্ছিন্নকে পরিচ্ছিন্নে, অখণ্ডকে খণ্ডে ধারণা করিতে হয়। শ্রুতি বলেম "ওঁ শ্রীগুরুঃ সর্ব্বকারণ ভূতা শক্তিঃ" শ্রীমাতেশ্বরীই শক্তি। তিনি ত্রিভুবন ব্যাপিনী হইয়াও---কখন কুমারী, কখন যুবতী, কখন বৃদ্ধা। আমাদের ধীশক্তি এই অপরিচ্ছিন্না শ্রীমাতেশ্বরীকে ধারণা করে---ঘটাকাশের উপর মহাকাশ ধৃত হয়—শ্রুতি বলেন, "দেহ মধ্যগতে ব্যোম্নি বাহ্যাহকাশং তু ধারয়েৎ। প্রাণে বাহ্যাহনিলং তদ্বজ্জ্বলনে চাহগ্নিমৌদরে। তোয়ং তোয়াংশকে ভূমিং ভূমিভাগে মহামুনে" ইত্যাদি ।

তার পর জগতের প্রকৃত স্বরূপ আকাশ কেমন বুঝাইয়া দেয়। আকাশের এক সঙ্কীর্ণ স্থানে জীবজন্তু পরিপূর্ণ বৃক্ষ লতা চন্দ্র সূর্য্য সাগর পর্ব্বত সমন্বিত এই জগৎ। এক দেশে মাত্র এই সৃষ্টি তরঙ্গ, অন্য সমস্তই শান্ত। চিৎস্বরূপের এই শান্তাবস্থানই আকাশ। সৃষ্টি, আকাশে গন্ধর্ব্ব নগরীর ন্যায়। ইহা ইন্দ্রজাল মাত্র। এই হিসাবে তোমার রাজ্যলাভ বা পৃথিবী লাভ পিপীলিকার ভূম্যাধিকারী হওয়া মাত্র।

প্রবাসী।

আমি প্রবাসী,
সুদূর পথ প্রয়াসী,
সুদূর পানে চাই।
সুদূর হতে এসেছি—
হেথা, মেলেনা মোর ঠাঁই।
ও গো, আমারে কেউ চেনে না।
মরম কথা বোঝেনা,
সুধালে কেহ চাহেনা—ফিরে যাই।
আমি প্রবাসী—
হেথা, মেলেনা মোর ঠাঁই।
এই গহিন হৃদি অন্তরালে,
মোর লুকান রহে যত ব্যথা।
অমর গীতি বীণার সুরে
মৃদুল গাহি উঠে সেথা।
আমার পরাণ ভাবে
উলসি' উঠে তাই।
আমি প্রবাসী
হেথা, মেলেনা মোর ঠাঁই।
আমার যারা আপনার—
হেথায়ে কেহ নাই।
সবাই চাহে পরিচয়
যাদের পাণে চাই।
শষ্প বীথি শুকায়ে যায়,
ফুলের কুঁড়ি ঝরয়ে হায়!
নিত্য সেই দেশের যেন
হেথায়ে কিছু নাই।
আমি প্রবাসী—
হেথা, মেলেনা মোর ঠাঁই।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী

রেজেষ্টরী নং A 362.

[দ্বিতীয় বর্ষ] ১৩১৪ সাল, চৈত্র। [১২শ সংখ্যা

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ।

কাশীধাম;

মহালক্ষ্মী যন্ত্রালয়,

শ্রীঅক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

বিষয়।	বিষয়।
১। মানসপূজা।	৫। বিধবা না চিরসধবা। (ক্ষুদ্র গল্প।)
২। আমি একা।	৬। ভারত সমর।
৩। ১৩১৪ শিবরাত্রি।	৭। গীতা।
৪। এই সে চরিত্র।	৮। ব্রহ্মবিদ্যা।

ওঁ শ্রী আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২য় বর্ষ] ১৩১৪ সাল, চৈত্র। [১২শ সংখ্যা

ওঁ

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

মানস-পূজা।

অর্ঘ্য এই হৃদয় দিনু,
তুলিয়া তব হাতে।
পাদ্য দিনু নয়ন বারি
মুছিয়া কোনও মতে।
আচমনীয় প্রীতি দিনু
ছন্দ গীতি ভাষে।
গন্ধ দিনু স্বপ্ন মোর—
প্রভাত রবি হাসে।
আসন দিনু বক্ষঃ মোর
মরম সাথে পেতে।

বসন দিনু নীলাম্বরী
শূন্য-আশ চিতে।
জীবন দিনু পূজার ফুল—
আর কি মম আছে?
আশার ফল এ নিরাশা
রহিল শুধু কাছে।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

—(০)—

আমি একা।

'আমার কেহ নাই' 'আমি একা' এই বলিয়া কত লোক দুঃখ করেন। আমি দুঃখ করি আমি একা হইতে পারি না বলিয়া।

প্রকৃতি পুরুষ মিলিয়া আমি একা। মনই আমার প্রকৃতি। আর আমি পুরুষ, আমার প্রকৃতির স্বামী। আমি স্ত্রীর বশ হইয়া গিয়াছি। আমার অভাবও কিছু নাই, দুঃখও কিছু নাই—কেবল স্ত্রীর জন্য আমার সোয়াস্তি নাই। ইষ্ট চিন্তা সময়েও স্ত্রী যে আমায় নানা কথায় কোথায় আনিয়া ফেলে, আমি তাহাতেই দুঃখ পাই।

স্ত্রীবশ হইয়াছি সত্য কিন্তু মনে জানি আমি স্ত্রীর বশ নই। এই মনে জানা কথাটা সত্য করিব ইহাই আমার সঙ্কল্প।

মনের বশ আমি নহি—ইহা আমি জানি। সকলেই জানেন। আমি স্ত্রীর দ্রষ্টা। স্ত্রী যাই করুক না কেন আমি দ্রষ্টাই থাকিব। স্ত্রী আমার মায়াবিনী, বহু মায়ায় সহজানন্দ পুরুষকে ভুলাইয়া বশ করিয়া ফেলে—বশ হইয়া ভাবি, একি হইল? আশ্চর্য্য হইয়া যাই কারবার দেখিয়া।

প্রকৃত দ্রষ্টা থাকিতে হইলে স্ত্রীকে রাজী করিয়া দ্রষ্টা থাকিতে হইবে। স্ত্রী নিজের ইচ্ছামত চলিলে আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না। স্ত্রীকে রাজী করিয়া আমার চিহ্নিত কোন কার্য্য দিতে হইবে। স্ত্রী ঐ কার্য্য করিবে, আর আমি দেখিব ইহাতেই আমার জয় হইবে।

মনে করা হউক স্ত্রীকে হরি হরি করিতে রাজী করান গেলে—আর আমি তাহাই দেখিতে লাগিলাম। ইহাই আমার যথার্থ দ্রষ্টা স্বরূপে থাকা।

নতুবা স্ত্রীকে কোন চিহ্নিত শুভ কর্ম্মে নিযুক্ত না রাখিয়া—অর্থাৎ স্ত্রীকে পূর্ণ মাত্রায় ব্যভিচার করিতে দিয়া আমি কিছুতেই দ্রষ্টা থাকিতে পারি না। তাই বলা হইল জপকর দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থান জন্য। ইহাতেও চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা এবং নিরোধ চাই।

দ্রষ্টাই অন্তর্দেব। দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে সর্ব্বথা পৃথক্। দৃশ্যই প্রকৃতি—দৃশ্যই মন, আর দ্রষ্টা পুরুষ।

তদা "দ্রষ্টুঃস্বরূপেঽবস্থানম্" এই মুখ্য কথা। চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয়।

দ্রষ্টা হইয়া থাকা এক কথা, আর দ্রষ্টা হইয়া যাওয়া অন্য কথা। প্রকৃতি আছে, মন আছে আমি তাহার দ্রষ্টা ভাবে আছি যদি "দ্রষ্টুঃস্বরূপে, বস্থানম্" ইহার এই অর্থ কেহ করেন তবে সেটা নিরোধ নহে একাগ্রতা। কিন্তু দ্রষ্টা যিনি ছিলেন, একাগ্র অবস্থায় তাঁহার স্বরূপে আসিলে প্রকৃতিও থাকেন না। দেখিতে দেখিতে দেখা যায় না—তখনই স্বরূপে থাকা হয়।

কেহ বলেন যোগসূত্রে যে দ্রষ্টার কথা বলা হইয়াছে, বেদান্তে তাহার উপরের কথা বলা হইয়াছে—বেদান্তে দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, এই ত্রিপুটি ছাড়াইয়া এক পরম শান্ত ভাবে অবস্থান হয়, তাহাই দ্রষ্টা পুরুষের স্বরূপাবস্থান, তাহাই ব্রহ্ম ভাবে স্থিতি।

"প্রকৃতেভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ"। প্রকৃতি হইতে আমি ভিন্ন—দেখা হইলেই প্রকৃতির লয় হইয়া যায়। আমিই পূর্ণ থাকি। তখন "আমি একা"। তদ্ভিন্নসময়ে আকাশের মত নিয়ে যাহা হইতেছে সমস্তই দেখিতে হয়। ইহাও ভাল কিন্তু নৃত্য দেখিতে দেখিতে নৃত্য করিয়া ফেলিলে বড় লজ্জার কথা! শুধু লজ্জা নয় অশেষ দুঃখ। তাই "আমি একা"র আয়ত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মনকে জপে স্পন্দন করাইয়া তাহার দ্রষ্টা থাকা ভাল।

—(০)—

১৩১৪ শিবরাত্রি।

শুভ প্রভাত আসিল। শুভ প্রভাত বলিতেছি, কারণ সমস্ত জীবন ধরিয়া যাহা অভ্যাস করিতে হইবে সেই পাথেয়টি আজ প্রভাত আপনি আনিয়া দিল।

আনিয়া দিল সত্য, এতদিন ধরিয়া লইয়া আছি সত্য, কিন্তু অবিরামে তাঁহা

চলিয়াছে কৈ ? এ শুভ প্রভাত কি বলিয়াদিল, এবার হইতে চলিবে ? কিসে ভাল হইবে জানিনা—জানিবার প্রয়োজনও বুঝি রাখিনা—যদি অনুভব করাইয়া দাও—তুমিই সমস্ত করিতেছ—আর তুমি ভিন্ন আমি জড়পিণ্ড মাত্র।

কিন্তু অবিরামে চলা বুঝি একবারে হয়না। অথবা 'অবিরামে চলন' কথাটাই হয়না। এখনকার ধর্ম্ম ত্যাগ ও গ্রহণ। বায়ু, জল, শ্বাস, সকলি এখানে অগ্রসর হয় আবার পশ্চাৎ হটে। বাহিরে আসিয়া হয় অহং ভিতরে ঢুকিয়া হয় সঃ। অবিরামে কিছুই চলে না। "চলন বিরাম" ইহাই বুঝি ঠিক কথা।

যাহা করি—এতদিন চেষ্টা করিয়াও ঠিক হইতেছিল না কেন ? শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসের অভাবই ইহার মূল কারণ। আরও একটু কিছু আছে। কিসে শীঘ্র হয়—এই অন্যায় ব্যাকুলতায় নূতন নূতন শাস্ত্র আজ্ঞা পালনের যে চেষ্টা তাহাও না হইবার অন্যতম কারণ। এইরূপ ব্যাপারে এক ধরিয়া থাকা, যত শিথিল হয় এমন আর কিছুতেই হয় না।

মাটির নীচে জল আছে। একস্থান খুঁড়িতে আরম্ভ করিলাম—কতকদূর খুঁড়িলাম—আর একজন বলিল—এইস্থান না খুঁড়িয়া ঐ স্থানটি খুঁড়িতে থাক—অমনি তাহাই করিলাম। সেখানেও কার্য্য শেষ হইতে না হইতে আর এক জনের কথা শুনিয়া আর এক স্থানে যাইলাম—এরূপ করিলে কখন আর জল পাওয়া যাইবেনা কেননা এক জনকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই বলিয়া।

এক ধরিয়া সকলই করা যায়—তবে যে মানুষ পারেনা—তাহা মহামায়ার প্রকাশ্য রহস্য। তিনি বলিয়া দিতেছেন—ছাড়িওনা—বলিয়া কহিয়া এক ছাড়াইয়া অন্য ধরান—আবার অন্য ধরাইয়া সব শিথিল করেন। যাহাদের গোঁ আছে তাহারাই এই প্রকাশ্য রহস্যে জিতিয়া যায়। যাহারা গোঁ রাখিতে পারে না তাহারা হারিয়া যায়। হারিয়া গিয়া আলস্যে অনিচ্ছায় ক্লেশ পায় আর মা হাসিতে হাসিতে দেখেন অজ্ঞান কেমন।

তথাপি মা আমার যে করুণাময়ী—তাহাতে ভুল নাই খোঁটাকে মাটীর মধ্যে দৃঢ় ভাবে প্রোথিত রাখিতে হইলে অনেকবার হেলাইতে হয়, নাড়াচাড়া করিতে হয়। মাও আপন সন্তানকে তাই করেন—পাছে ছেলে শেষে ঠকিয়া যায়—আর কাহারও হাতে ঠকে।

তিনিই বলেন না পাওয়া পর্য্যন্ত "এক" শিথিল করিওনা। আপনি শিথিল করিয়া বলিয়া দেন এই দেখ ঠকিলে—আর ঠকিওনা 'এক' হইতেই সব পাইবে জানিয়া রাখ। এই "এক" টিতে সবার অধিকার আছে। এই 'এক'টি আমার নাম। নাম সীমাশূন্য নামার সাকার রূপ মাত্র।

জগৎ জননী তাঁহার অঘোরা মূর্ত্তিতে কি শিখাইয়া গিয়াছেন?

জগতে বহু দুঃখ পাইবে। সুখও পাইবে কিন্তু দুঃখ অনন্ত। আমার জীবন চাহিয়া দেখ। রাজ্যনাশ, বনবাস, হরণ আবার বিসর্জ্জন। তথাপি এই দুঃখ রাশিকে অতিক্রম করিবার জন্য অনন্ত কাল ধরিয়া আপনার বস্তুটি দৃঢ় ভাবে ধরিয়া থাক। দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, সময়ে অসময়ে, শুচি অশুচিতে, প্রতিক্ষণে প্রতিশ্বাসে এক মুহূর্ত্তও ছাড়িয়া থাকিওনা। কখন বৈখরী কখন মধ্যমা কখন পশ্যন্তিতে তাহাকেই লক্ষ্য কর। নিতান্ত মূঢ় অবস্থাতেই বৈখরীতে করিতে থাক—সেই সব আনিয়া দিবে। "নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্"। অধিক কি ভুলিওনা।

—(০)—

এই সে চরিত্র।

(১)

শুনিয়া দেখিয়া অকলঙ্ক শশী,
মনে হয় প্রক্ষালিয়া কলঙ্কের রাশি,
পুনঃ জন্মি ধরাতলে হইবারে দাসী,
এই সে চরিত্র সই কত ভালবাসি॥

(২)

কত ভালবাসি সই সুন্দর করম,
স্বার্থশূন্য ভালবাসা পবিত্র ধরম,
নাহি চায় ভালবাসা তবু বাসে ভাল,
ভাল বেসে হ'য়ে থাকে কতই কাঙ্গাল॥

(৩)

কাঙ্গাল সবার কাছে মান অপমান—
নাহি গণে, সবে দেয় সর্ব্বদা সম্মান।
নাহি গণে নিজ সুখ—অপরের তরে
সর্ব্ব-লোক সেবা করে এক সেবা ধ'রে॥

বিধবা না চিরসধবা।

(ক্ষুদ্র গল্প।)

(১)

যশোহর জেলার বেত্রবতী তীরে আঁধার কোটা গ্রাম। স্থানে স্থানে বেতসকুঞ্জপরিবৃত জীর্ণ দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ইহার প্রাচীনত্ব প্রমাণে সচেষ্ট।

এই গ্রামে বিশ্বেশ্বর কথক চূড়ামণির বাস। কথকতা বিষয়ে তাঁহার খ্যাতি যথেষ্ট। বৎসর বৎসর ষাণ্মাসিক পরিক্রমণের পর যখন চূড়ামণি মহাশয় তৈজসসম্ভারে নৌকা যোগে ভবনে প্রত্যাগত হইতেন, তাহা দেখিয়া অনেক ধনী লোকেরও তাক্ লাগিয়া যাইত। অনেক অজ্ঞ লোকে মনে করিত, চূড়ামণি মহাশয়ের পূর্ব্বদেশে কোথায় জমিদারী আছে।

কথক চূড়ামণির পরিবারে তাঁহার এক মাত্র কন্যা প্রসাদী, তাঁহার স্ত্রী করুণাময়ী, ইহা ব্যতীত একটী পুরাতন ভৃত্য ভোলা।

দুইটী আনন্দ শৈবলিনী ধীরে ধীরে তাঁহার জীবনের দুই পাশে বহিয়া যাইতেছিল। ইহাতে চূড়ামণি মহাশয় কতকটা ধূর্জটির মত, অথবা প্রয়াগ তীর্থের মত শোভা পাইতে ছিলেন। তাঁহার দুইদিকে গঙ্গা যমুনার ঢেউ খেলিতেছিল। করুণানির্ঝরিণী করুণাময়ীর সখিত্বে, স্নেহবৎসলা জনকানন্দ-বর্দ্ধিনী প্রসাদীর আনন্দ নৃত্যে, সে গৃহে আনন্দের অবধি ছিল না। দরিদ্রের জন্য তাহা আবার শত মুখে তাহার শত দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল।

(২)

অপত্যস্নেহই বোধ হয় সংসারের সম্মিলিত জীবনের সুখের অশরীরী বন্ধন। চূড়ামণি মহাশয়ের গৃহে তাহা বেশ উপভোগ্য। যে সময়ে প্রসাদী জন্মে নাই, তাঁহার স্ত্রী করুণাময়ী একটী সন্তানের জন্য ষষ্ঠী ঠাকরুণ্‌কে কত উৎকোচ মানস করিতেন, সেদিনও কথক চূড়ামণি মহাশয়ের গৃহে এক প্রকার সুখ ছিল—আনন্দ ছিল; কিন্তু তাহা যেন এই পৃথিবীকে কাহারও ধার ধারে না। দুইটী প্রাণ সেখানে অনবরত মিলনের চেষ্টা করিয়াও মিলিত না। একটী কোমল গ্রন্থির অভাব।

ষষ্ঠীঠাকরণ্ করুণাময়ীর বুসে তুষ্ট হইলেন। প্রসাদী জন্মিল। গৃহে তখন পূর্ণানন্দ। প্রসাদীরমার্জ্জার শিশুটী পর্য্যন্ত তখন স্নেহের দাবি পাইল। ক্ষুদ্র পরিবার সত্যই তখন একটী বৃহৎ পরিবারে পরিণত হইল। একটী সীমা সূচক ক্ষীণ আলোক রেখা দৃষ্টি বেলায় তখন একেবারে কোথায় মুছিয়া গেল। ইহাইত সংসারের বৈচিত্র্য!

(৩)

সময় চলিতেছে। সে কাহারও অপেক্ষা করে না। দেখিতে দেখিতে প্রসাদীর বিবাহের বয়স পিতা মাতার অজ্ঞাত সারে সাড়া দিল। আনন্দ ও বিস্ময়ে তখন উভয়ের মনে এক অদ্ভুত চাঞ্চল্যের ছায়া দোলাইয়া দিল! প্রসাদী এত বড় হইয়াছে? লজ্জাবনত আরক্ত মুখ চাহিতে, বলিতে হেট্। চোক দুটী ভীতা বিহঙ্গীনীর মত ব্যাকুল। শৈশব ও যৌবনের সম্মিলনে এ এক অপূর্ব্ব ভাব।

কথক চূড়ামণি কন্যার বিবাহের বড় দায়ে পড়িলেন। দিন কয়েকের জন্য তাঁর পুরাণ পাঠও বন্ধ করিতে হইল। অনবরত চার মাস পর্য্যটনের পর একটী জামাই ধরিয়া আনিলেন, জাত্যভিমানে কুলীন, বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান। গৃহিণী কন্যাদানে প্রথমতঃ একটু আপত্তি করিলেন, পরে যখন চূড়ামণি মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন যে, এই ছেলেটীর দ্বারা তিনি জামাই ও পুত্রের সাধ একত্রে মিটাইয়া লইতে পারেন, তখন আর তাঁহার এ বিবাহে আপত্তি থাকিল না। ছেলেটীর বাপ মা কেহই নাই, নিতান্ত নিরাশ্রয়।

শুভদিনে, শুভলগ্নে রুক্মিণীকান্ত ও প্রসাদীর বিবাহ যথাসম্ভব সমারোহে সম্পন্ন হইল।

(৪)

সুখের উপর দুঃখ চিরকালটাই সঙ্গিন্ চড়াইয়া আছে। হর্ষে বিষাদ, সাধে বাদ, ইহা যেন বিধাতার অভিসম্পাত। প্রসাদীর বিবাহের পাকস্পর্শের দিন, রাত্রে চূড়ামণি মহাশয়ের স্ত্রী করুণাময়ী বেশ একটু জ্বর অনুভব করিলেন। দারুণ পিপাসাও সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিল। কোনও ডাক্তার কবিরাজের ঔষধে আর সে পিপাসার নিবারণ হইল না। "কই মা—প্রসাদী জল,—কই মা—প্রসাদী—একটু জল" এই রূপে সপ্তাহ কালান্তে তাঁহার শেষ পিপাসার শান্তি হইল। বেত্রবতীর শৈবালস্নিগ্ধ নির্ম্মল জলরাশি তাঁহার চিতা ধুইয়া দিল।

প্রসাদী—মাটিতে পড়িয়া "মা আমার—মা গো", ইত্যাদি ছন্দে সুর করিয়া অনেক কাঁদিল। জীবনে এই তাহার প্রথম শোক, বুকে বড় বাজিল।

রুক্মিণীকান্ত নিজের উদাহরণ দেখাইয়া প্রসাদীকে অনেক বুঝাইলেন। প্রসাদী একটু শান্ত হইল। চূড়ামণি মহাশয়কে আর কাহারও বুঝাইতে হইল না, তিনি নিজেই বুঝিলেন। তাঁহার কোটরাবিষ্ট চক্ষু দুটি একটু একটু আর্দ্র হইয়া আসিতেছিল, একবিন্দুও জল মাটিতে গড়াইয়া পড়িল না। ভোলার বড়ই কষ্ট হইল। তাহার মা ঠাকুরণের মত আর কি কেহ তাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইবে? যথাবিধি করুণাময়ীর শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে, কথক চূড়ামণি কথকতার নাম করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। একবৎসর কাটিয়া গেল আর তিনি গৃহে ফিরিলেন না। পরম্পর শুনাগেল তিনি ৺কাশীধামে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

(৫)

রুক্মিণীকান্ত এখন গৃহস্বামী, প্রসাদী গৃহিণী। আর সেই ভোলা ভৃত্য। কপোত কপোতীর মত উচ্চবৃক্ষচূড়ে নীড় বাঁধিয়া প্রসাদীর জীবন বড় সুখে কাটিল না। এখন রুক্মিণীকান্তের আদর, যত্ন সোহাগ, ভাল বাসা আর সে বনবিহঙ্গীকে একটী সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আটকাইয়া রাখিতে পারিত না প্রসাদীর কি যেন অভাব, কি যেন নাই।" কেহ প্রসাদীর কাছে সীতা সাবিত্রীর কথা পাড়িলে প্রসাদী বলিত, এক দিনেই মানুষ ভগবানের ভক্ত হইয়া যায় না, এক দিনেই স্ত্রী পতিকে নারায়ণ বোধ করিতে পারেনা। নিজের সুখকামনা অল্পে অল্পে ত্যাগ করিয়া পতিসেবা জন্য দুঃখ অভ্যাস চাই। ইহাই স্ত্রীর সাধনা।

প্রসাদী তার বাবার জন্য বড় কাঁদিত। ঘুমের ঘোরে রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া বসিত। রুক্মিণীকান্ত জিজ্ঞাসা করিলে বলিত "বাবাকে স্বপ্নে দেখিলাম মাথায় জটা, ত্রিশূল হাতে, কপালে সিন্দুরের অর্দ্ধচন্দ্র, বাবা এসে আমাকে কোলে লইলেন।"

মাকে প্রসাদী এক দিনও স্বপ্নে দেখিতনা। প্রসাদীর মা যেখানে ছিলেন, সে পুরী বোধ হয় স্বপ্নেরও অতীত।

(৬)

একদিন শীতকালের শেষ রাত্রে রুক্মিণীকান্ত হঠাৎ কলেরাক্রান্ত হইল। গ্রামের আশে পাশে তখন কলেরা দেখা দিয়াছিল। অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ও হোমিওপ্যাথিক চিকিসা নিষ্ফল হইল। রুক্মিণীকান্ত আর কিছুতেই প্রাণ ফিরিয়া পাইল না

প্রসাদী আগেই বুঝিয়া ছিল যে স্বামীকে মানুষ বোধ থাকা পর্য্যন্ত তাহার নারী জীবন বৃথাই রহিল, তাই প্রসাদী সাধনের মত কিছুই করিত না। কত কি ভাবিত। প্রসাদী জানিত স্বামী দেবতা, তাই প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রত্যহ প্রণাম করিত আর কাঁদিত, কবে আমি দেবতাকে দেবতা বলিয়া দেখিব? কখন ভাবিত একি হইল? মা গেল কেন? লোকেও বলিত যেই এই দেবতার আবির্ভাব, অমনি তাহার স্নেহময়ী জননীর জন্মের শোধ বিদায়। সে কি পাইয়া, কি হারাইল? রুক্মিণীকান্তের পার্থিব স্নেহ ভালবাসা তাই তখন পর্য্যন্ত প্রসাদীকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তাহার অবসর থাকিতে না থাকিতে সে অভ্যাস অভ্যস্থ হইতে না হইতে আরোপ বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল।

প্রসাদী একটুও কাঁদিল না। সে স্বতঃ প্রবৃত্তা হইয়া শ্মশানে শববাহীগণের অগ্রগামিনী হইল। আজ তাহার হৃদয় শ্মশান, গৃহও শ্মশান। নদী, জল, আকাশ প্রসাদীর কাছে আজ সবই শ্মশান।

বেত্রবতী তীরে যেখানে করুণাময়ীর দেহ ভগ্নাবশেষ ধৌত হইয়াছিল, আজ আবার সেইখানে রুক্মিণীকান্তের চিতা সজ্জিত হইল।

প্রসাদী যথাবিহিত শাস্ত্রানুশাসিত স্নানক্রিয়া সমাপনান্তে সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া স্বামীর মুখাগ্নি করিল। মনে পড়িল তাহার বিবাহের সময়ে এইরূপ সাত বার সে স্বামীকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। ইহার কোন্‌টা ঠিক? এক বার বন্ধন গ্রহণ, আর এক বার তাহার উন্মোচন।

মুখে অগ্নি দিবার সময়ে প্রসাদী একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। সে চির পরিচিত মুখ খানি অগ্নির মধ্যে যেন অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল। প্রসাদীর নয়ন ঝলসিয়া আসিল। শিরায় শিরায় বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। আর স্থির হইয়া সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। দ্রুত পদে গৃহাভিমুখে ছুটিল। পথি মধ্যে, জটা মাথে, ত্রিশূল হাতে, কপালে সিন্দূরের অর্দ্ধ চন্দ্র এক সন্ন্যাসী প্রসাদীকে দৃঢ় বাহুমূলে জড়াইয়া ধরিল। প্রসাদী চিনিল, এ সেই স্বপ্নের সন্ন্যাসী—তাহার পিতা।

(৭)

পিতা বিধবা কন্যাকে ৺কাশীধামে আনিলেন। প্রসাদী প্রথম দিন আসিয়াই গঙ্গাতে স্নান করিল—করিয়া একবার একবার বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা

দেখিয়া আসিল। মনে মনে বলিয়া আসিল—তোমাদের আশ্রয়ে আসিলাম, প্রত্যহ যে যাত্রা করিব তেমন অবস্থা আমার নাই। আমি বিধবার ধর্ম্ম যে ব্রহ্মচর্য্য তাহাই আচরণ করিব। ঠাকুর; আমার কর্ম্ম নিষ্পত্তি তোমায় করিতে হইবে।

প্রসাদী কাহারও সহিত মিশিত না কিন্তু ক্রমে ক্রমে দুই একজন করিয়া পরিচিতের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। সধবা কালে প্রসাদীর যাহা রূপ ছিল বিধবা হইয়া প্রসাদীকে যেন আবার কেহ ভাঙ্গিয়া গড়িল। প্রত্যহ গঙ্গা স্নান, একবেলা সাত্ত্বিক ভোজন, আর প্রাণপণে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ—এই সকলে প্রসাদী মূর্ত্তিমতী দেবী হইয়া উঠিল।

(৮)

কথায় কথায় একদিন বিধবার বিবাহ হওয়ার কথা উঠিল। প্রসাদী অনেকক্ষণ কোন কথাই কহিল না। কেহ বলিল এই যে খালি প্রাণে বিধবার একটা অতৃপ্ত বাসনা থাকিয়া যায়—যার জন্য বিধবা একটা হা হুতাশ লইয়াই থাকে, আর ব্রহ্মচর্য্য পারে না তাই কোথাও একটু রূপ বা গুণ দেখিলেই ভ্রান্ত হইয়া ভালবাসিয়া নিশি দিন তাই চিন্তা করে—সুবিধা পাইলে কত স্থানে কত ব্যভিচার হইয়া যায়, কত স্থানে কত ভৈরবী কত যোগিনী কত সন্ন্যাসিনী সাজিয়া বসে—এ সমস্ত নিবারণের জন্য বিধবার বিবাহ মন্দ কি?

আর এক জন বলিল—বিবাহ দিলেই যদি দুঃখের প্রতীকার হইত তবে সধবার আর কোন দুঃখ থাকিত না। যখন সধবারও দুঃখ দেখা যায় তখন সধবাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহাদেরও আবার বিবাহ দিতে হয়।

আর একজন বলিল—কথা ত সত্য। বিধবার দুঃখ অপেক্ষা বহু সধবার জীবন আরও বিষাদময়।

বহু কল্পনা জল্পনা হইতে লাগিল। প্রসাদী কোনই উত্তর করিল না। মনে মনে প্রসাদী কি যেন প্রার্থনা করিতে ছিল।

সহসা সকলে দেখিল জটা মাথে ত্রিশূল হাতে কপালে সিন্দূরের পূর্ণচন্দ্র এক সন্ন্যাসী প্রসাদীর নিকটে। সন্ন্যাসী বলিলেন ধর্ম্ম রক্ষাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। ধর্ম্ম রক্ষা ভিন্ন শরীর, বাক্য ও মনের ছন্দ থাকে না। জীব স্বচ্ছন্দে না থাকিতে পারিলে বৃথা পাপ জীবন বহন করে। স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম সতীত্ব। বিধবার বিবাহে সতী ধর্ম্ম নাশ হয়। সধবা জীবনেও যদি ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা না হয় তবে সতী ধর্ম্ম নষ্ট হয়। বিধবা হও বা সধবাহও, মা তোমরা সতী ধর্ম্ম বুঝিয়া রক্ষা কর। কথা শেষ হইল। সকলে অবাক্ হইয়া দেখিল প্রসাদী নাই। সেই অবধি কাশীতে কেহ আর প্রসাদীকে দেখিল না।